শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

দশম খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

দশম ভাগ

শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ
প্রধান কার্য্যালয়—কনখল, হরিদ্বার—২৪৯৪০৮

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ ঝুলন পূর্ণিমা, অগাষ্ট, ২০০৮

মূল্য ঃ ৭৫ টাকা

ISBN : 81-89558-27-7

মুদ্রক ঃ
বর্দ্ধমান মুদ্রনালয়
১৯, জওহর নগর কলোনী
বারাণসী—২২১০১০

বিষয়-সূচী

*

"এ শরীরের আত্মা সকলের আত্মা—
কাউকে না হলে চলেনা—চলবেনা।"

—শ্রী শ্রী মা

প্রকাশকের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের অনবদ্য লীলাকথা "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ"-এর অন্তিম খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতেছি।

অক্টোবর, ১৯৫৮ হইতে ১৯৬১ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের অপূর্ব ঘটনাবলী এবং শ্রীশ্রীমার সহিত অপূর্ব কথোপকথন, রাঁচী আশ্রমে ঁদুর্গাপূজা, বারাণসী আশ্রমে শ্রীমতী রানী মজুমদার দ্বারা গোপালজীর বিশেষ পূজার আয়োজন, বিন্ধ্যাচলে সূক্ষ্মদেহী মহাত্মাদের দর্শন, বৃন্দাবন আশ্রম প্রাঙ্গনে প্রস্তররূপী মহাত্মার আবির্ভাব, বৃন্দাবন বর্দ্ধমান কুঞ্জে বৃক্ষরূপী মহাত্মা প্রসঙ্গ, বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমার পায়ে আঘাত প্রাপ্তি, রাঁচী আশ্রমে ঁকালী মাতার বিগ্রহ স্থাপনা, পূজ্য দিদিমা দ্বারা দীক্ষা প্রদান আরম্ভ, কলিকাতায় দুর্গোৎসব, শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথজী প্রসঙ্গ, ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানানন্দজীর দেহরক্ষা এবং শ্রীশ্রীমার দর্শন ও স্পর্শলাভ, শ্রীহরি বাবাজী মহারাজের কঠিন রোগ এবং নবজীবন লাভ, কাশীর প্রসিদ্ধ গুরুধাম মন্দিরে শ্রীশ্রীমা এবং বিস্তারিত বর্ণনা, বৃন্দাবন আশ্রমে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা, কাশী আশ্রমে ঁবাসন্তী পূজায় জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ, কাশীধামে শ্রীশ্রীমার হীরক জয়ন্তী মহোৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা, শ্রীশ্রীমার উপবিত গ্রহণ প্রসঙ্গ, কাশী আশ্রমে ঁগোপালজীর তুলাদান উৎসব, বিন্ধ্যাচল আশ্রম ভূমিতে অবস্থিত অতি প্রাচীন মন্দিরাদির সূক্ষ্ম দর্শন কথা, কিষণপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীমার বিশেষ অসুস্থতা এবং সূক্ষ্মে প্রাচীন মহাত্মাদের আগমন ও প্রার্থনা, দিল্লী

কালকাজী আশ্রমে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতে শ্রীশ্রীমার নানা সূক্ষ্ম দর্শন, আগরপাড়ায় নূতন আশ্রম স্থাপনা, রাঁচীর কালীমাতা ও গোপালজীর নানা লীলা কথা, মাতৃগতপ্রাণ শ্রী নীতীশ গুহর অপূর্ব দেহরক্ষা, শ্রীশ্রীমায়ের সন্নিকটে শ্রদ্ধেয় কালীপদ গুহরায়, শ্রীশ্রীমার সহিত প্রধান মন্ত্রী নেহরুর প্রথম সাক্ষাৎকার, ঋষিকেশ সংযম সপ্তাহে নানা অলৌকিক ঘটনা, মাতৃভক্ত ডা গোপাল দাস গুপ্তর মৃত্যুর বিবরণ, নীচ জাতীর কন্যাকে মুক্তার হার প্রদান, নৈমিষারণ্যে জলপ্লাবন এবং সংযম সপ্তাহ ও ভাগবৎ সপ্তাহের বিচিত্র কাহিনী ও পুরাণ মন্দির স্থাপনা প্রসঙ্গ, শ্রী উপেন মহারাজের রাজগীর আশ্রমে দেহত্যাগের বিবরণ আদি এই ভাগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পণ্ডিচেরী নিবাসী মাতৃভক্ত শ্রী ভবানী লাহোরীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী শ্রীমতী রোসার স্মৃতিতে বর্তমান গ্রন্থটিও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে নিবেদিত হইল।

গ্রন্থ প্রকাশনে সহযোগিতার জন্য শ্রীশ্রী মাতৃভক্ত সুসাহিত্যিক শ্রী সুজন চন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

শুভ ঝুলন পূর্ণিমা
১৬ই অগাষ্ট, ২০০৮

বিনীত—
প্রকাশক

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত শ্রীমতী রোসার পুণ্য স্মৃতিতে
এই গ্রন্থটি মাতৃ-চরণে অর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত শ্রীমতী রোসার পুণ্য স্মৃতিতে
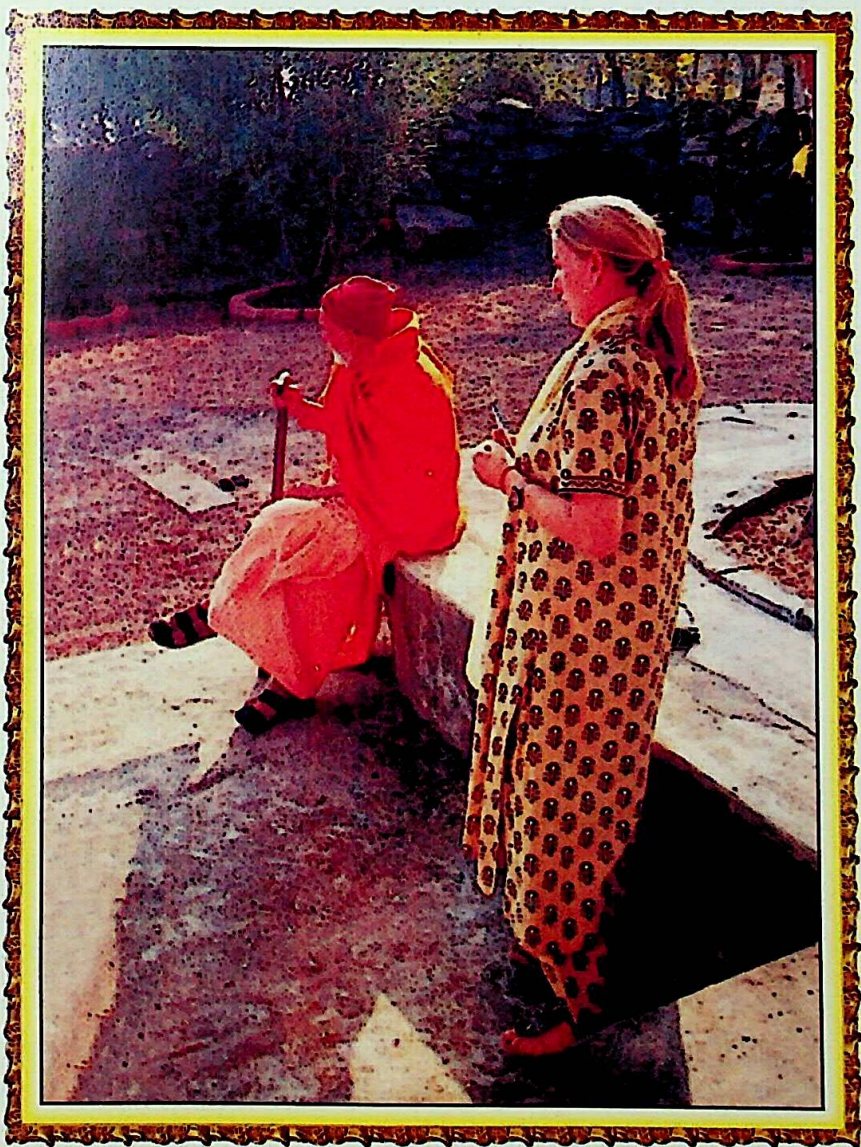
জন্ম - ২২শে এপ্রিল, ১৯৫৪ মৃত্যু - ১লা অক্টোবর, ২০০৩

শ্রীমতী রোসার অতিপ্রিয় বিন্ধ্যাচল আশ্রমে
স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজের সঙ্গে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

দশম খণ্ড

রাঁচিতে দুর্গোৎসব

২২ শে আশ্বিন, শনিবার ১৩৬১ সন (ইং ৯। ১০।৫৪)

আজ বেলা ৮টার সময় মা রাঁচি হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। এইবারের দুর্গোৎসব মায়ের রাঁচির নূতন আশ্রমে হইয়াছে। "শুনিতে পাইলাম কলিকাতা হইতে অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন। যোগীভাইও (সোলনের রাজা সাহেব) আসিয়াছিলেন। পূজা ভালভাবেই হইয়াছে। ওইখানকার স্থানীয় লোকেরা নাকি বলিয়াছিলেন যে পূজার সময় প্রতিবারই রাঁচিতে বৃষ্টি বাদল হইয়া থাকে। এবার যে বৃষ্টি বাদল হইবে তাহা অবধারিত, কারণ এবার আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে ওইখানে বৃষ্টিপাত খুব কমই হইয়াছে। তাঁহাদের ওই কথা শুনিয়া খুকুনী দিদি বলিয়াছিলেন, 'প্রতিবার বৃষ্টি হইলেই যে এবারও হইতে হইবে এমন কোনও কথা নয়। এবার হয়তো বৃষ্টি নাও হইতে পারে।' এই সকল কথা মা আমাদিগকে বলিয়া শেষে বলিলেন, 'দেখা গেল যে দিদির কথাই ঠিক হইল।'

স্বামী শঙ্করানন্দ। তুমি বলিলে একরূপ, আমরা কিন্তু বুঝিলাম অন্যরূপ। (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) তোমাদের নিকট এক অন্য আছে কিনা তাই এইরূপ হয়। মনে কর না কেন একমাত্র তিনিই তো সব করিতেছেন।

এইবারের দুর্গা পূজা সম্বন্ধে মা আরও বলিলেন, "রাঁচিতে যখন দুর্গাপূজা করা হইবে বলিয়া স্থির হইল তখন এখান হইতে উহাদিগকে লেখা হইয়াছিল যে যদি প্রতিমা তৈয়ার করিবার ভাল কারিগর না থাকে তবে কাশী হইতে

লোক পাঠান যাইতে পারে। উত্তরে উহারা জানাইল যে, কাশী হইতে লোক পাঠাইবার দরকার নাই, ওইখানেই কারিগর আছে। কিন্তু প্রতিমা তৈয়ার হইলে এখানকার, এমনকী কলিকাতা হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও কেহই প্রতিমা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা নানা ভাবে প্রতিমার সমালোচনা আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে ওইরূপ করিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, 'প্রতিমামাত্রই ভগবানের বিগ্রহ, এখন উহা দেখিতে যেমনই হউক না কেন। কাজেই উহা লইয়া সমালোচনা করিতে নাই।' মজাও এমন, ওই প্রতিমারই যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল তখন কিন্তু উহা দেখিতে অন্যরূপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যোগীভাই তখন বলিয়াছিলেন, 'প্রতিমা বদল গিয়া' এবং সকলেই ওই কথা একবাক্যে স্বীকার করিল। প্রতিমা দেখিয়া ইহাদের প্রাণে যে অসন্তোষের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, ভগবতী দয়া করিয়া উহা দূর করিয়া দিয়াছিলেন।''

গোপালের বিশেষ পূজা

২৩ শে আশ্বিন, রবিবার (ইং ১০।১০।৫৪)

মা আজ বিকালে ৫।। টার সময় বৃন্দাবনে রওনা হইয়া গেলেন। হরিবাবার আহ্বানেই এই সময়ে মায়ের বৃন্দাবনে যাওয়া।

আশ্রমে যে নূতন গোপাল আসিয়াছেন তাঁহার পূজাতে আজ সারা দিন কাটিয়া গেল। এই পূজা করিলেন শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদারের স্ত্রী শ্রীযুক্তা রানী মজুমদার। ইনি মহাত্মা রমণ মহর্ষির আশ্রিতা এবং ইঁহার সাধনাও জ্ঞানমার্গের। কিন্তু উহা সত্ত্বেও তিনি এই পূজা কেন করিলেন তাহার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। আজ দুপুরে শ্রীশ্রীমায়ের অনুরোধে তিনি উহা আমাদিগকে বলিলেন। এই সময় গোপীবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

রানীদিদি বলিলেন, একবার কলিকাতায় আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। ইহা ১৯৫১ সালের কথা। আমি দেখিয়াছিলাম আমি যেন কোনও এক অপরিচিত স্থানে গিয়াছি। সেইখানে গঙ্গা নদী আছে। গঙ্গার ঘাটগুলি সিঁড়ি দিয়া বাঁধান। সিঁড়িগুলিও বড় বড় কিন্তু খুব পুরাতন। ওইখানে কেহ কেহ ঘাটে বসিয়া জপ করিতেছেন। কেহ বা পূজা করিতেছেন। সাধারণত গঙ্গার ঘাটে যাহা হইয়া থাকে ওইখানেও তাহাই হইতেছিল। আমি ওই ঘাটের উপর

এক মন্দির চত্বরে বসিয়াছিলাম। ওই মন্দিরের অবস্থাও জীর্ণ শীর্ণ—কোনও কোনও দালান ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোনও কোনওটি এমন অবস্থায় আছে যাহা দেখিয়া মনে হইল যে ইহা যেন কত কালের পুরাতন। দালান কোঠা ছাড়া ওইখানে গাছ ইত্যাদিও ছিল এবং একদিকে কতকগুলি তুলসী গাছও ছিল।

আমি চত্বরের উপরে বসিয়া গঙ্গা এবং ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিলাম। এমন সময় দেখিতে পাইলাম কোথা হইতে একটি ছোট বালক আমার কোলে দাঁড়াইয়া আমার হাতের আঙুল ধরিয়া টানিতেছে। তাহার গায়ের রং কালো। মুখখানা এবং হাত- পা গুলি গোলগাল। তাহার দিকে আমি অবাক হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সে আমাকে বলিল, 'আমাকে বুঝি চিনিতে পারিতেছ না? ওই মন্দিরে যে আছে সে এবং আমি এক। আমাকে পূজা কর।' মন্দিরে কী বিগ্রহ ছিল তাহা আমার জানা ছিল না এবং ওই বালকের কথায়ও আমার বিশ্বাস হইতেছিল না। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি যাহা বলিতেছ উহার প্রমাণ কী?' সে বলিল, 'বেশ, তোমাকে প্রমাণও দিতেছি—এই যে তুলসীগাছগুলি দেখিতেছ উহার একটির নীচে একটু খুঁড়িলেই একটি মোহর পাইবে। যদি পাও তাহা হইলে তো আমার কথা তোমার বিশ্বাস হইবে?' সে এইসব কথা বলিতেছিল এবং আমার কোলে দাঁড়াইয়া আমার হাতের আঙুল ধরিয়া টানিতেছিল।

এমন সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে ওইখানে আরও কয়েকটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট বালকটি একটি সদ্যজাত শিশুর আকার ধরিয়া আমার কোলে শুইয়া পড়িল। যেই লোকগুলি ওইখানে আসিয়াছিল তাহারা শিশুটির দিকে তাকাইয়া নিজেরাই বলাবলি করিতে লাগিল, 'বালগোপাল বোধহয় আবির্ভূত হইয়াছেন।' দেখিতে দেখিতে লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। ইহা দেখিয়া আমি শিশুটিকে কোলে লইয়া মন্দিরের দিকে চলিলাম। লোকগুলিও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল এবং তাহাদের সংখ্যাও অনেক। দেখিতে পাইলাম তাহাদের সকলের হাতেই মালার থলি।'

এমন সময়ে মা বলিলেন, 'ইহারা হইল বৈষ্ণবের দল। গোপালের আবির্ভাব কিনা তাই ইহাদের আগমন।'

রানীদিদি আবার বলিতে লাগিলেন, "মন্দিরের দিকে যাইতে আমি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছোট ছোট কতকগুলি প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলাম। উহার প্রত্যেকটিতেই একটি করিয়া লোক বসিয়া সাধন ভজন করিতেছে। যখন আমি ওইখান দিয়া যাইতেছিলাম তখন প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ হইতেই লোক বাহির হইয়া আমার নিকট ওই শিশুটিকে চাহিতেছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, 'তোমরা তোমাদের নিজ কাজ লইয়াই ব্যস্ত, এই শিশুকে তোমরা রক্ষা করিবে কেমন করিয়া? এই মন্দিরের মালিক কোথায়? তোমরা তাহাকে ডাক।' ওই মন্দিরের মালিক যে কে তাহা কিন্তু আমিও জানিতাম না। তবে আমার মনে হইতেছিল যে কোনও এক বৃদ্ধা বিধবা বোধহয় ইহার মালিক। যাহা হউক আমার কথা শুনিয়া কেহ কেহ মালিকের খোঁজে গেল। এইদিকে আমি শিশুটিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার চারিদিকে প্রায় তিন চারি শত লোক।

"অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মনে হইল যেন বেলা ৩টা বাজিয়াছে। সকালবেলা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত আমি ওই বালক লইয়াই আছি। ইহার মধ্যে মন্দিরের মালিকের দেখা নাই। আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'এ কেমন? আমি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, মালিক এখানে আসিতেছে না কেন? তোমরা শীঘ্র তাহাকে ডাকিয়া আন।' আমার কথা শুনিয়া একটি লোক দৌড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে আসিয়া বলিল, 'এই মন্দিরের মালিক দিবা-রাত্রিতে একবার মাত্র আহার করেন। সন্ধ্যার পূর্বে যদি তাঁহার আহার না হয় তবে আজ তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হইবে। তিনি এইমাত্র আহার করিতে বসিয়াছেন। আহার শেষ হইলেই আসিবেন। আপনি দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করুন।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি ওইখানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

"এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি খুব আশ্চর্য বোধ করিতে লাগিলাম। কারণ এই স্বপ্নের সহিত আমার চিন্তাধারার কোনওই যোগাযোগ নাই এবং ইহার যে কী অর্থ তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। ২।। বৎসর পূর্বে মার সহিত ব্যাঙ্গালোরে যখন আমার দেখা হয় তখন মাকে আমি এই স্বপ্নের কথা বলি। ইহার পর এইবার পূজায় রাঁচিতে যখন শুনিতে পাইলাম যে কাশীর আশ্রমে এক

গোপালের বিগ্রহ আসিয়াছেন এবং উহার ফটো যখন আশ্রমের মেয়েরা আমাকে দেখাইল তখন ওই ফটো দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম যে এই গোপালকেই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। কারণ ওই গোপালের মুখাকৃতি এবং শরীরের গঠন স্বপ্নে দৃষ্ট ঠিক সেই শিশুর মতো। তাই রাঁচি হইতে মায়ের সঙ্গে কাশী আসিয়াছি। এখানে আসিয়া এবং গোপালকে দেখিয়া আমার এখন স্পষ্ট মনে হইতেছে যে আমি এই স্থানের দৃশ্যই যেন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আর গোপালটি হুবহু সেই শিশু।"

এমন সময় মা বলিলেন, "এখানে আশ্রম হইবার পূর্বে এই স্থানের যে চেহারা ছিল এ তাহাই স্বপ্নে দেখিয়াছে। এখানে কতকগুলি ভাঙা দালান ও ঘর ছিল। গতকাল গোপাল দেখিয়াই এ সারাদিন কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। কাল এ আমাকে বলিয়াছিল, 'মা, আমি ওই গোপালটি একবার কোলে করিতে পারি কি?' আমি বলিলাম, 'কখন তুমি ইহাকে কোলে করিতে চাও?' এ বলিল, 'নির্জনে হইলেই ভাল হয়।' তাই কাল রাত্রি ৯টার পর ইহাকে গোপালের কাছে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমি ইহাকে বলিয়াছিলাম, 'তুমি নিজেই গোপালকে কোলে তুলিয়া নিবে না অন্য কেহ উহা তোমার কোলে বসাইয়া দিবে?' এ বলিল, 'আমি নিজেই লইব।' তাহাই করিয়াছিল। তোমরা তো জান যে গোপালটি ওজনে ১৫।২০ সের। রানী নিজেও রুগ্ন এবং দুর্বল; কিন্তু দেখিলাম সে অনায়াসেই গোপালটি তুলিয়া কোলে লইল। যেভাবে সে উহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল তাহা দেখিয়া মনে হইল না যে সে উহাকে কোনও ভারী জিনিস বলিয়া মনে করিতেছে। আজ যে সারাদিন গোপালের পূজা এবং ভোগ হইল এ ব্যবস্থা রানীই করিয়াছে। গোপাল ইহার নিকট পূজা চাহিয়াছিল কিনা তাই উহা এইভাবে হইয়া গেল। আর ভোগও এ দিয়াছে কত কত জিনিস দিয়া! সমস্তই কিন্তু ইহার ইচ্ছা অনুযায়ী জোগাড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকী সকালবেলা হইতে পূজা পর্যন্ত সানাই বাদ্যের ব্যবস্থাও রানীই করিয়াছে এবং এজন্য অকাতরে অর্থ ব্যয়ও করিয়াছে।"

গোপীবাবু। ইঁহার সাধনা নিরাকারের, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইঁহার নিকট সাকারের প্রকাশ হইয়াছে! সাকার-নিরাকার দুই-ই এক কিনা তাই এইরূপ হয়।

এই কথাটি উচ্চারণ করিল। ওইখানে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা বলিল যে শিশুর বয়স ৫০ দিন মাত্র। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম 'দেখ, দেখ, ৫০ দিনের শিশু, সে আবার কেমন কথা বলে!' আরও দেখিতে পাইলাম যে শিশুটি কথা বলিতে বলিতেই যেন আয়তনে বাড়িতে লাগিল। শেষে ওই শিশু হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের এক বালক মূর্তি বাহির হইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার গায়ের রং শ্যামল শ্যামল। দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু সে একটু চঞ্চল। উহা দেখিয়া আমি শিশুটিকে বলিলাম, 'হাঁ, ইহাও তোমার এক রূপ।' কিছুক্ষণ পর ওই বালক আবার কোলের শিশুটির মধ্যে মিশিয়া গেল এবং শিশুটিও মিশিয়া গেল। মিশিয়া যাইবার সময় তাহার স্পর্শও অনুভব করা গেল।"

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

সান্যাল মহাশয়। মা, এই যুবতী এবং বালকটি কে?

মা। (হাসিয়া) বাবা, উহারা তুমিই।

ওই সম্বন্ধে মায়ের নিকট হইতে বিশেষ কিছু উদ্ধার করা যাইবে না দেখিয়া সান্যাল মহাশয় নিরস্ত হইলেন।

১৭ই মাঘ, সোমবার, (ইং ৩১।১।৫৫)

গতকাল শতচণ্ডী শেষ হইয়া গিয়াছে। পাঠান্তে হোম হইয়াছে এবং আমরা সকলেই আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছি। আজ হইতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ সহ মহারুদ্রাভিষেক আরম্ভ হইয়াছে। বাটু দাদা এই অনুষ্ঠানের আচার্য। সঙ্গে দশজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারাও মহারাষ্ট্রীয়। চণ্ডীমণ্ডপে এই অনুষ্ঠান হইতেছে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যখন নর্মদেশ্বর শিবের পূজা হইতেছিল তখন উহার গাম্ভীর্য উপস্থিত সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। এই অনুষ্ঠানও হরিবাবার ইচ্ছানুসারেই হইতেছে।

২০শে মাঘ, বৃহস্পতিবার (ইং ৩।২।৫৫)

আজ সকালবেলা কথায় কথায় মা বলিলেন 'সেদিন তোমাদিগকে একটি স্ত্রীলোক, শিশু এবং বালকের মূর্তি দর্শনের কথা বলিয়াছিলাম না? তোমরা আশ্রমে যে অনুষ্ঠান করিতেছ উহার সহিত ওই দর্শনের যেন একটু সম্পর্ক আছে। প্রথমে দর্শন হইয়াছিল স্ত্রীমূর্তি, পরে শিশু এবং বালক। তোমরা

চণ্ডীদেবীর পূজা এবং হোম করিয়াছ। এখন রুদ্রদেবের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। বাকি আছে শুধু ওই বালক। তাই কাল বাটুকে বলিতেছিলাম যে যখন চণ্ডীদেবী এবং শিবের উৎসব হইয়া গেল তখন গোপালই বা বাদ যায় কেন? একটা দিন দেখিয়া গোপালের পূজার ব্যবস্থা করা হউক।'

যদিও মা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না যে তিনি চণ্ডীদেবী, মহারুদ্র এবং গোপালকেই ওই দিন দর্শন করিয়াছিলেন তবে মায়ের কথার ভঙ্গিতে আমাদের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে যুবতী, শিশু এবং বালকের বেশে ওই ত্রিমূর্তিই মায়ের নিকট আসিয়াছিলেন। অন্য একদিন মাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, যে ওই ত্রিমূর্তিই মায়ের শরীর হইতে বাহির হইয়া আবার মায়ের শরীরেই মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন উহা পার্থিব কোনও ভাষা নয়।

খুকুনীদিদির রোগের কারণ

খুকুনীদিদির আরোগ্য কামনা করিয়া হরিবাবার ইচ্ছানুসারে শতচণ্ডী প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতেছে। এই সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কথা উঠিয়াছে যে ইহার ফলে যদি দিদির রোগের কোনও উপশম না হয় তবে লোকে কি এই জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে না? গতকল্য আমিও মাকে বলিয়াছিলাম, 'মা, শুনিয়াছি যে রোগ এবং দুর্দৈব শান্তির জন্য যদি শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে কাজ করা যায় তবে উহা হইতে সুফল হইয়া থাকে।'

মা। হাঁ, যদি ঠিক ঠিক ভাবে করা যায় তবে মন্ত্রশক্তির ফল তো দেখা যাইবেই।'

আমি। আচ্ছা, এখন ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতিতে যদি ওই সকল অনুষ্ঠান হয় যিনি উহাতে অশাস্ত্রীয় কিছু হইতে দেখিলে উহার অবগুণ কাটাইয়া দিতে পারেন তবে তো উহা সুফল দিতে বাধ্য। শতচণ্ডী পাঠ ইত্যাদি যাহা হইয়াছে উহা তো তোমার উপস্থিতিতেই হইয়াছে, কাজেই ইহা হইতে ভালভাবে এই সকল অনুষ্ঠান আর কী হইতে পারে? কাজেই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে এখানে আমরা সুফল পাইতে বাধ্য।

মা। তুমি এই শরীরকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিলে তাহা দেবালয়ে দেবতার

সম্মুখে কোনও অনুষ্ঠান করিয়া ওই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াও বলা যাইতে পারে। তবে কথা হইল কী যে, যিনি কর্মের অবগুণ কাটাইয়া দিতে পারেন তিনি যদি নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে উপস্থিত থাকেন তবে কী হইবে? তাহা ছাড়া তিনি অন্য ভাবেও তো মঙ্গল করিতে পারেন।

স্বামী শঙ্করানন্দ। ইহা যদি বল তবে আর আমাদের বলিবার কিছু নাই।

মা। আরও জানিও যে শুভ কর্ম করিলে কোনও না কোনও ভাবে সুফল হয়ই। দিদির রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারেরা একমত নয়—কেহ বলে ইহা Arthritis কেহ বলে ইহা Bone T. B.। বোম্বাইয়ের ডাক্তারেরা খুকুনীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, সে কখনও কোমরে চোট পাইয়াছে কিনা। উহা ৭। ৮ বৎসর পূর্বে হইলেও উহার ফল এখন প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু দিদি কোমরে কোনও আঘাত পাইয়াছে কিনা তাহা স্মরণ করিতে পারে নাই। সে যে কোমরে আঘাত পাইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার খেয়াল আমার হয় নাই। গতকাল কথায় কথায় উহা বলিয়া ফেলিয়াছি। খুকুনী এবং এখানকার মেয়েরাও অনেক সময় আমার কথামতো কাজ করে না। যেমন কাহাকেও কোনও জিনিস আনিতে বলিয়া আবার নিষেধ করিলাম, কিন্তু ওই নিষেধ সত্ত্বেও সে দৌড়াইয়া ওই জিনিস আনিয়া হাজির করিল। অবশ্য উহারা ভালবাসা হইতেই ওইরূপ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও আমি যাহা করিতে বলি তাহা করা হয় না।

প্রায় ২। ২।। বৎসর পূর্বে কন্যাপীঠের এক ঘরে গিয়া দেখি যে সেখানে একটি ইলেকট্রিকের তার ঝুলিতেছে। দিদিকে উহা সরাইতে যাইতে দেখিয়া আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু দিদি আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া যেই মাত্র ওই তারে হাত দিল অমনি সে ছিটকাইয়া খাড়া অবস্থা হইতে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। এইভাবে পড়িয়া গেলে কোমরে চোট পাওয়া স্বাভাবিক। খুকুনী যখন পড়িয়া গেল তখন তাহার হুঁশ ছিল না। পরে সে যখন উঠিয়া বসিল তখন আর তাহার ছিটকাইয়া পড়িয়া যাওয়ার কথা স্মরণে ছিল না। হুঁশ থাকিলে তো স্মরণে থাকিবে? কাল যে ডাক্তার খুকুনীকে injection দিতে আসিয়াছিল তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ওইভাবে পড়িয়া গেলে মেরুদন্ডের

কোনও অংশ কি জখম হইতে পারে, যাহার ফল অনেকদিন পর প্রকাশ হয়? ডাক্তার বলিয়াছিল, 'হাঁ, তাহাও হইতে পারে। পড়িয়া যাওয়ার ফলে মেরুদন্ডের কোনও অংশ হয়তো তখন সামান্য ফাটিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য ওই সময় উহা বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই। পরে উহা লইয়া হাঁটাচলা করিতে করিতে ওই ফাটল ক্রমেই বড় হইয়া বর্তমানে এই বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে এবং যাহার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। যাহা হউক, দিদিকে যে এতদিন বিশ্রামে রাখা হইয়াছে উহার ফলে হাড়ের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে। কাল যে X-Ray করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে কোনও গর্ত মাটি দিয়া ভরিলে যে অবস্থা হয় ওই হাড়েরও সেই অবস্থা হইয়াছে এবং খুকুনী নিজেও একটু ভাল বোধ করিতেছে। কাজেই বলিতে হইবে যে ইহা একটি সুসংবাদ।

মায়ের কথায় মনে হইল যে খুকুনীদিদি এখন আরোগ্যের পথে। এইখানকার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বেই যে খুকুনীদিদি ভাল হইয়া উঠিতেছেন—ইহা সকল দিক হইতেই আনন্দের বিষয়।

বিন্ধ্যাচলে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মহাপুরুষের সূক্ষ্মে আগমন

৩রা ফাল্গুন, মঙ্গলবার (ইং ১৫।২।৫৫)

গত ২৮শে মাঘ, শুক্রবার মহারুদ্রাভিষেক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে আশ্রমের গোপালেরও এক বিশেষ পূজা এবং ভোগ হয়। ইহার পর শনিবার দিনই ভোরবেলা সোলনের রাজা সাহেব এবং গোপীবাবুকে লইয়া মা বিন্ধ্যাচলে রওনা হইয়া যান। বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাইয়াই এক চিঠিতে মা আমাকে ওইখানে যাইবার জন্য আদেশ করেন। ওই আদেশের সংবাদ আমি রবিবার দিন ভোরবেলা পাই। সেইদিনই বেলা ১টার গাড়িতে রওনা হইয়া গিয়া বিকাল ৫টায় বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাই। ওইখানে রবিবাবু, কল্যাণবাবু, মুনীন্দ্রবাবু, বিজনবাবু প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। ছুটির দিন বলিয়া ইঁহারা সকলেই কাশী হইতে মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ডা. গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ও কন্যাসহ আসিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মা ডা. দাশগুপ্ত এবং আমাকে লইয়া গোপীবাবুর কাছে গেলেন। গোপীবাবুর জন্য বিন্ধ্যাচলে একটি 'ভজনালয়' করা হইয়াছে। ইহা

একটি ছোট প্রকোষ্ঠ, বেলুদিদির বাসগৃহের উপর এবার নূতন করা হইয়াছে। ঘরটির সম্মুখে এবং পিছনে নাতি পরিসর বারান্দা, দক্ষিণ দিকে খানিকটা উন্মুক্ত ছাদ আছে। বাথরুম এবং পায়খানার বন্দোবস্ত উপরেই করা হইয়াছে। উপরে উঠিবার সিঁড়ি বাহির দিয়া করা হইয়াছে বলিয়া বেলুদিদির ঘর বা উঠানের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। ভজন-ঘরটি যেমন নির্জন তেমনি মনোরম। ইহার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে একদিকে যেমন বিন্ধ্যপর্বতের প্রস্তরাকীর্ণ ধূসর মালভূমি দৃষ্টিগোচর হয়; আবার অপরদিকে গঙ্গা এবং শ্যামল শস্যক্ষেত্র সমন্বিত সমতল ভূমির দৃশ্যও ছবির মতো চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম যে গোপীবাবু ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। মা আমাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বাহির হইতেই গোপীবাবুকে আমাদের আগমন সংবাদ দিতে বলিলেন। আমি বাহির হইতে কপাটে একটু ধাক্কা দিতেই উহা খুলিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম যে গোপীবাবু ধ্যানস্থ আছেন। কপাট খোলার শব্দ পাইয়া তিনি তাকাইয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমি অমনি তাঁহাকে মায়ের আগমন সংবাদ জানাইলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন আমরা সকলে গিয়া দক্ষিণ দিকের খোলা ছাদের উপর বসিলাম।

এই সময় নানা কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় মা বলিলেন, 'আজ সকালবেলা ১১টার পূর্বে আর ঘর হইতে বাহির হই নাই। সেই সময় দেখিতে পাইলাম যে, যে সকল যোগী-মহাত্মা সূক্ষ্ম দেহে বিন্ধ্যাচলে আছে তাহাদের মধ্যে একজন এই শরীরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। সে সাধারণ লোকের বেশেই আসিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলাম, 'ও তুমি তো এই।' এরূপভাবে চেনা তো আর কষ্টকর নয়। কারণ সকলই তো তোমারই রূপ, কাজেই তুমি চিনিতে পারিবে না কেন?

'আবার দেখ, সাধক যখন সাধনা করিতে করিতে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে থাকে, সে উচ্চ অবস্থা লাভ করিলেও অনেক সময় কিন্তু তাহার কোনও

কোনও কামনা বাসনা থাকিয়া যাইতে পারে। জীব যখন, তখন এরূপ থাকা তো স্বাভাবিকই। (গোপীবাবুকে) তাই নয় কি, বাবা?

গোপীবাবু। হাঁ, তাহা তো থাকিতেই পারে।

মা। এক হয়, জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া কামনা বাসনাগুলিকে জ্বালাইয়া দেয়, তাহা না হইলে ওইগুলিকে ভোগ করিয়াই পূরণ করিতে হয়। এইভাবে পূরণ করা স্থূল জগতে যেমন, সূক্ষ্ম জগতেও তেমন। এ জগতে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে কাহারও কোনও জিনিস খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে এবং একজন তাহাকে উহা দিতেছে। কিন্তু যাহা দেওয়া হইতেছে তাহাতে সে যেন তৃপ্ত হইতেছে না। আবার দেনেওয়ালাও তাহাকে যথেষ্ট না দিয়া উহার কিছুটা রাখিয়া দিতেছে, পাছে সবগুলি ফুরাইয়া যায়। সেইরূপ ওই মহাপুরুষেরও কমলা খাওয়ার সাধ ছিল এবং তাহাকে যে কমলা দেওয়া হইয়াছিল তাহা যেন তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছিল না এবং যে তাহাকে উহা দিতেছিল সেও আর দিতে ইচ্ছুক ছিল না। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, 'আচ্ছা, দুই মাস আমাকে যে সকল কমলা দেওয়া হইবে উহা আমি গ্রহণ করিব না। ওইগুলি ইহাকে দাও।' দুই মাসে আমাকে কত কমলা দেওয়া হইবে তাহা কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। যাহা হউক আমার ওই কথার পর সে তৃপ্ত হইয়া গেল।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। পরে আবার বলিলেন, 'এই রূপ কতই তো দেখা হইতেছে। সব সময় তো বলা আসে না।'

আমি। মা, ওই মহাপুরুষ যে কমলা খাইতে তোমার কাছে আসিয়াছিলেন তাহা তো মনে হয় না। তিনি হয়তো কোনও শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন, কারণ কমলা খাওয়ার জন্য তপস্যা করা হাস্যকর ব্যাপার।

মা। তুমি আমার কথা বোঝ নাই। আমি কি বলিয়াছি যে তিনি কমলা খাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন? তিনি তপস্যা করিতেছিলেন পরম বস্তু পাইবার জন্যই।

আমি। কমলা খাওয়ার বাসনা বোধহয় তুমি উদাহরণস্বরূপ দিলে।

মা। না, উহা উদাহরণ নয়, উহা যথার্থ ঘটনা।

আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে কামনা বাসনার শেষ কোথায়?

সাধন রাজ্যে উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া, সূক্ষ্মে যে কোনও দেহ ধারণ করিবার সামর্থ লাভ করিয়াও যে কমলা খাওয়ার মতো তুচ্ছ বাসনা থাকিয়া গেল এবং ভোগ করিয়া উহা পূর্ণ করিতে হইল ইহা বড়ই বিচিত্র।*

গোপীবাবু। ওই মহাপুরুষ কি আপনাকে দেখিয়াছিলেন?

মা। হাঁ, সকলে যেমন দেখে। কারণ যতক্ষণ কোনও লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং যে পর্যন্ত পূর্ণত্বে পৌঁছানো না যায় সে পর্যন্ত কাহারও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গোপীবাবু আহ্নিক করিবেন বলিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের সাধনার খেলার বৈশিষ্ট্য

আমরা আজ পৌনে দশটার সময় বিন্ধ্যাচল হইতে কাশীতে রওনা হইলাম। মায়ের গাড়িতে মা, সোলনের রাজাসাহেব, গোপীবাবু, পানু এবং আমি ছিলাম। গাড়িতে মা খেয়াল বশে নিজ হইতেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। মা গোপীবাবুকে বলিলেন, 'বাবা, একজন ছিল যে অন্য একজন অসচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। যখন তাহার ওইরূপ দর্শন হয় তখন সে জানিত না যে ওই ব্যক্তির চরিত্র খারাপ। পরে সে উহা জানিতে পারিয়াছিল। অসচ্চরিত্র লোকের মধ্যে কি নারায়ণ দর্শন করা যায়?'

গোপীবাবু। তাহা যাইবে না কেন? নারায়ণ তো সর্বব্যাপী; তিনি সকল

---

* এই ঘটনা সম্বন্ধে গোপীবাবুর সহিত পরে আমার আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তীব্র ভোগ বাসনা এইভাবে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে মায়ের এই দর্শনের মধ্যে কোনও গূঢ় রহস্য আছে যাহা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। মাকে ওই কথা জানাইলে তিনি মন্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করিয়া আমাকে বলিলেন, 'ওই মহাপুরুষ কমলা খাইতে এই শরীরের কাছে আসেন নাই। তাঁহার মধ্যে ওইরূপ যে কোনও বাসনা আছে তাহাও তিনি জানিতেন না। আমি উহা দেখিয়া পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তোমরা অনেক সময় বল না যে, জীবন্মুক্তেরও প্রারব্ধ ভোগ থাকে। মনে কর না কেন যে এইস্থানে ওই প্রারব্ধই কাটাইয়া দেওয়া হইল।'

স্থানে এবং সকলের মধ্যেই আছেন। যে নারায়ণ শুধু সৎলোকের মধ্যেই নিজেকে প্রকট করেন আর অসৎ লোকের মধ্যে করেন না সে নারায়ণের মূল্যই বা কী?

মা। (হাসিয়া) সে তো সত্যকথা। তবে এই যে নারায়ণ দর্শন হয় ইহারও কিন্তু রকম আছে। এক হইল আবরণশূন্য ভাবে দর্শন অর্থাৎ যাহার আবরণ কাটিয়া গিয়াছে সে সর্বভূতেই নারায়ণ দর্শন করিতে পারে। আবার আবরণের মধ্যে থাকিয়াও কিন্তু দর্শন হইতে পারে, যেমন সর্বজীবের মধ্যে নারায়ণ আছেন। এইরূপ বিচার বা চিন্তা করিয়া কেহ কেহ সাধারণ জীবের মধ্যেও নারায়ণ দর্শন করিতে পারে। এগুলি হইল মনের ব্যাপার।

গোপীবাবু। আপনি যাহা বলিলেন উহা হইল দর্শকের দিক হইতে। আবার যিনি দর্শন দেন অর্থাৎ নারায়ণের দিক হইতেও বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু নারায়ণ সর্বব্যাপী তিনি যেকোনও ভাবে নিজকে প্রকট করিতে পারেন।

মা। হাঁ, তাহাও হইতে পারে। শুধু মানুষ কেন? গাছপালা, পাথর ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই তিনি নিজকে প্রকট করিতে পারেন; অর্থাৎ ঝাঁকি দর্শন দিতে পারেন।

কিছুক্ষণ পর মা আবার বলিতে লাগিলেন, 'তখন (অর্থাৎ সকালবেলা) কথা হইতেছিল না যে, যেখান হইতে (সাধনার) আরম্ভ আবার সেইখানেই শেষ। এই শরীর ছোটবেলা যখন 'হরিবোল হরিবোল' করিতে আরম্ভ করে তখন নাম করিতে করিতে এই শরীরের ভাব হইত। আবার শা'বাগে কীর্তনের মধ্যেও ভাব হইত। ইহা দেখিয়া তখন কেহ হয়তো মনে করিতে পারে যে মায়ের দেখি একই অবস্থা চলিতেছে—পূর্বেও যেরূপ নাম শুনিয়া ভাব হইয়াছে এখনও সেই রূপই হইতেছে। এই দুই ভাবের মধ্যে কিন্তু প্রভেদ আছে। সাধনার কোনও এক ধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এগুলি বুঝা বড় শক্ত। কারণ এই অবস্থায় যাহা অনুভব করা যায় তাহা ওই ধারার অধীন হইয়াই প্রকাশ হয়। মনে কর শরীরের কোনও আঙুলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে; ওইরূপ করিয়া আঙুলের যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহা তো সবই জানিতে পার অর্থাৎ আঙুলের যে হাড় আছে, মাংস আছে, চামড়া আছে, লোম আছে—ইহা সবই জানিতে পার। আবার ইহা হইতে এ জ্ঞানও লাভ করিতে

পার যে আঙুলে যাহা আছে তাহা সমস্ত শরীরেই আছে। এইভাবে এক আঙুল হইতেই সমস্ত শরীরের জ্ঞান লাভ করা যায়। আবার বলা হয় না যে, সব জিনিসের মধ্যে সব জিনিস আছে? সেই অর্থে আঙুলের মধ্যেই চোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি আছে। কাজেই এক আঙুল হইতেই শরীরের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সবই জানা যায়। এখানে সমস্ত শরীরের যে প্রকাশটা হয় উহা কিন্তু আঙুলের অধীন হইয়াই হয়। এখানে প্রধান হইল আঙুল, আর সব কিছু অপ্রধান। কোনও এক ধারায় নিবদ্ধ থাকিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় তাহা কতকটা এই ভাবের।

'আবার দেখ, বলা হয় না যে কান ধরিয়া টানিলে মাথা আসে। সেইরূপ বলা যায় যে এক আঙুল ধরিয়া টান দিলে হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদি সহ সমস্ত শরীরটাই চলিয়া আসিবে। এখানে হাত, পা, নাক, মুখ ইত্যাদির যে জ্ঞান উহা কিন্তু যার যার স্থানে প্রধান থাকিয়াই হয়। এখানে এগুলি আঙুলের অধীন হইয়া প্রকাশ হয় না। সেইরূপ সাধনার কোনও ধারা ধরিয়া চলিলে ওইখানে অন্যান্য ধারার যা' কিছু বৈশিষ্ট্য তাহা ওই ধারার অধীন হইয়া প্রকাশ না হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রধানভাবে প্রকাশ হইতে পারে। এই অবস্থায় কোনও এক ধারা যে অন্য ধারা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ কথা বলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ধারার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বগুলি সবই যে স্থান বিশেষে সত্য তাহা অনুভব করা যায়। ইহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা।

"এ শরীরের সাধনার খেলা 'হরিবোল হরিবোল' করিয়াই তো আরম্ভ হয়। কিন্তু উহা সত্ত্বেও তোমরা দেখিয়াছ যে এই শরীরের ভিতর দিয়া যৌগিক ক্রিয়া, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি পথের যে সকল সাধনা আছে উহার সব কিছুই প্রকাশ পাইয়াছে। এ শরীর তো কোনও একটা বিশেষ ধারায় আবদ্ধ থাকে নাই। তোমরা শ্রীরাধার দশম দশা ইত্যাদি কী সব কথা বল না? উহাও অষ্টগ্রামে থাকিতেই এই শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। বলিতে পার, যদি শ্রীরাধার মহাভাবই প্রকাশ হইয়া গেল তবে আবার সাধনার বাকি রহিল কি? কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ওই মহাভাব প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও বাজিতপুরে আসিয়া এই শরীরের দীক্ষা ইত্যাদি সাধনার নানা খেলা হইয়া গেল। অসচ্চরিত্র লোকের

মধ্যে নারায়ণ দর্শনের কথায় তুমি বলিতেছিলে না যে নারায়ণ তো সর্বব্যাপী, কাজেই যে কোনও লোকের মধ্যেই তিনি নিজকে প্রকট করিতে পারেন। অষ্টগ্রামে এ শরীরে যে মহাভাব প্রকাশ হইয়াছিল তাহাকে তোমরা ওইভাবেও নিতে পার। বলিতে পার যে উহা নারায়ণের ঝাঁকি দর্শনের মতো।

'হরিবোল, হরিবোল' বলিয়া এই শরীরের যে ভাব প্রকাশের সূচনা হইয়াছিল শা'বাগের কীর্তনের মধ্যে উহারই পূর্ণ পরিণতি দেখা গিয়াছিল। ওই দুই ভাবের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। ইহার মধ্যে কিন্তু সাধনার বিভিন্ন ধারার যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে তাহাও প্রকাশ হইয়াছিল।

গোপীবাবু। সাধনার খেলার সময় আপনার মধ্যে ছটফটানি, অস্থিরতা, ইত্যাদি কি প্রকাশ হয় নাই?

মা। হাঁ, তাহাও হইয়াছিল। রাধিকার বিরহের যে সকল বর্ণনা তোমরা পুঁথিপুস্তকে দেখিতে পাও উহা আর কতটুকু? বিরহের যে প্রাণান্তকর জ্বালা যন্ত্রণা উহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য পুস্তকে উহার বর্ণনা নাই। এগুলি শুধু অনুভবের বস্তু। যাহার সেই অনুভূতি আছে সে-ই বিরহের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারে এবং সে-ই মাত্র বলিতে পারে যে উহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তোমরা এখানে অল্প কয়েকজন আছ বলিয়া আরও একটা কথা প্রকাশ করিতেছি, উহা বহু লোকের মধ্যে প্রকাশ করা চলে না এবং এ পর্যন্ত ইহা প্রকাশও করা হয় নাই। সাধনার খেলার সময় এ শরীরটা স্ত্রীদেহ হইলেও ইহাতে পুরুষের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ হইয়াছিল। সেইরূপ কেহ যদি পুরুষ দেহ লইয়া সাধনা আরম্ভ করে তবে তাহার মধ্যেও স্ত্রীদেহের সমস্ত লক্ষণ এবং ভাবধারা প্রকাশ হইতে পারে। এখানে অবশ্য আমি ভোগের কথা বলিতেছি না। ভোগের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রীলোকের দেহের এবং ভাবের বৈশিষ্ট্য এবং গতি সমস্তই প্রকাশ হইবে। যদি বল যে ওই অবস্থায় তাহার গর্ভসঞ্চার এবং সন্তানাদি উৎপন্ন হইবে কিনা? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, না, তাহা হইবে না। কারণ ওইগুলি হইল তো ভোগের দিক। ভোগের দিকটা বাদ দিয়া স্ত্রীলোকের দেহের ও ভাবের যা' কিছু বিশেষত্ব তাহা সমস্তই প্রকাশ পাইবে। স্ত্রীসাধকের মধ্যেও ওইরূপ পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইবে। সেইজন্য যখন

কেহ বলে যে, স্ত্রীদেহে তো এই জাতীয় সাধনা হইতে পারে না তখন আমিও বলি যে উহা ঠিক কথা। স্ত্রীদেহে ওই জাতীয় সাধনা হয় না। তবে এ দেহ তো স্ত্রীদেহে ওই জাতীয় সাধনা করে নাই। সাধন পথে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষের সমস্ত ভাব এবং পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের সমস্ত ভাব প্রকাশ হওয়া তো চাই। তাহা না হইলে হইল কী?

গোপীবাবু। পরমপুরুষ এবং পরমাপ্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কী? অবশ্য পরম পুরুষ এবং পরমাপ্রকৃতি মূলে একই বস্তু। কিন্তু সেই কথা ছাড়িয়া দিয়া যখন দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন অবশ্য উহার মধ্যে কিছু যে পার্থক্য আছে তাহা মানিতেই হইবে। এখন প্রশ্ন হইল যে ওই পার্থক্যটা কী?

মা। প্রকৃতি বলিতে যত কিছু আকার, প্রকার এবং রূপ, যত কিছু শক্তি সবই বুঝায়। আমরা যাহা কিছু দেখি, যেমন গাছ, লতা, পাতা, শহর, গ্রাম, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি এসবগুলিরই তো আলাদা আলাদা রূপ আছে। এগুলি শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ। আর পুরুষের দিকটা হইল অব্যক্তের দিক, অরূপের দিক। শক্তির বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তোমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাক এবং বিভিন্ন রূপেও তোমরা শক্তির পূজা করিয়া থাক। কিন্তু শক্তির যে অনন্তরূপ আছে উহার বর্ণনা তো আর শাস্ত্রে নাই এবং উহার বর্ণনা হইতেও পারে না। উহা শুধু অনুভবযোগ্য। এই অনন্তরূপ, অনন্ত শক্তিই হইতেছে প্রকৃতি।

গোপীবাবু। আমার মনে হয় জগতে এই যে অনন্ত রূপ দেখা যায় ইহার পশ্চাতে আছে একরূপ। সেই একরূপ হইতেই অনন্তরূপ বাহির হইয়া আসিতেছে।

মা। হাঁ, তা-ই। তবে জানিও যে প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে পাইলে ওইখানে পুরুষকেও পাওয়া যায়। আবার পুরুষকে পূর্ণভাবে পাইলে ওইখানে প্রকৃতিকেও পাওয়া যায়। সেইজন্য বলা হয় শিব ছাড়া শক্তি নাই এবং শক্তি ছাড়া শিব নাই; তাই হরগৌরী, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি যুগলরূপ।

গোপীবাবু। মোটমাট চারিটি অবস্থা দেখা যায়—এক হইল শিব এবং শক্তি, আর হইল শক্ত্যনুপ্রবিষ্ট শিব এবং শিবানুপ্রবিষ্ট শক্তি। ইহা ছাড়া আর একটি অবস্থা আছে যেইখানে শিবশক্তি একই, যিনি পরমপুরুষ তিনিই পরমাপ্রকৃতি।

মা। (হাসিয়া) ইহাই আসল অবস্থা। যতক্ষণ এই স্থিতি লাভ না হয় ততক্ষণ একটা কিছু আঁশ থাকিয়া যায়। এই স্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া আমি যা' তা' বলিয়া থাকি। ইহা অতি দুর্লভ অবস্থা এবং ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয় 'কোটিতে গুটি।' এ অবস্থাতে কী আছে এবং কী নাই তাহা কোনও ধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বুঝা যায় না।

একবার জ্যোতিষ এই শরীরকে প্রশ্ন করিয়াছিল, 'কীর্তন শুনিয়া তোমার যদি ভাব হয় তবে তো তুমি ভাবে আবদ্ধ। ভাবাতীত তুমি তো নও।' কীর্তনে এই শরীরের নানা ভাব হইত ইহা পুস্তকে পড়িয়া হরিবাবা এ শরীরকে ভাবে ফেলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় কীর্তন করিয়াছে কিন্তু যখন দেখিয়াছে যে এ শরীরের কোনওই পরিবর্তন হইতেছে না তখন সে ভাবিয়াছে, 'তবে কি মায়ের অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, না আমরাই সেভাবে কীর্তন করিতে পারিতেছি না।' এ সব কথা আমি হরিবাবার মুখেই শুনিয়াছি। যে স্থিতিতে ভাব অভাবের কোনও প্রশ্নই নাই সে স্থিতিতে ভাব হওয়া বা না হওয়া যে একই কথা। কিন্তু ইহা ধরা বুঝা বড়ই শক্ত।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে আমরা কাশী আসিয়া পৌঁছাইলাম। প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যেই আমরা বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী আসিলাম।

৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার (ইং ১৮। ২। ৫৫)

আজ বেলা ১১টার সময় মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলে শঙ্করানন্দ স্বামীজী মাকে বলিলেন, 'আমাকে একজন বলিয়াছে যে তোমার এইখানে যে সকল গভীর তত্ত্বালোচনা হয় উহারা তাহা বুঝিতে পারে না। তাই তোমাকে একটি সহজ বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছি—কীভাবে প্রণাম করিতে হয় তাহা তুমি সকলকে সরল ভাষায় বুঝাইয়া বল।' প্রশ্ন শুনিয়া মা আশ্রমের নারায়ণ স্বামীজীকে বলিলেন, 'বাবা, তোমার বলিবার কিছু আছে নাকি?'

স্বামীজী। এই সভায় আমি আর কী বলিব? (সকলের হাস্য) তবে শুনিয়াছি যে কোনও বিগ্রহকে প্রণাম করিতে হইলে তাঁহার চরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত এবং মস্তক হইতে পুনরায় চরণ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া প্রণাম করিতে হয়।

মা। (শঙ্করানন্দ স্বামীজীকে) এখন শুনিলে তো বাবা, কীভাবে প্রণাম করিতে হয়?

শঙ্করানন্দ স্বামীজী। এই বিষয়ে লোকে তোমার কথা শুনিতে চায়। আমার বা অপরের উপদেশ শুনিতে চায় না।

মা। (হাসিয়া) প্রণাম, প্রণতি যাহা কিছু করা হয় উহা কিন্তু নিজেকেই নিজে করা হয়। কারণ এক ভিন্ন তো দ্বিতীয় কিছু নাই। লোকের ওই জ্ঞান নাই বলিয়া এবং তাহারা নিজকে ভগবান হইতে আলাদা মনে করে বলিয়া তাহারা যাঁহাকে চরম পরম বলিয়া মনে করে তাঁহার চরণে প্রণাম করে। তাঁহার চরণ তো সর্বত্রই আছে। কাজেই যেখানে প্রণাম করিবে মনে করিবে যে তাঁহার চরণেই প্রণাম করিতেছি।

নারায়ণ স্বামীজী। চরণে প্রণাম করিতে হয় কেন?

মা। বলা হয় না যে চরণ দিয়াই শক্তির ধারা নামিয়া আসে। এইজন্য চরণে প্রণাম করিবার বিধি। নমস্কার অর্থ হইল নিজকে ঢালিয়া দেওয়া। প্রণতি কী? না, যে শির অহংকারের জন্য সোজা হইয়া আছে তাহাকে নত করা। সমস্ত মন ঢালিয়া প্রণাম করিতে হয়। তাহা করিলে কী হয়? না, অ-মন হইয়া যায় অর্থাৎ উপাস্য বা ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়। যদি একটি নমস্কারও ঠিকমতো হয় তবে তখনই তাহার প্রকাশ হইতে বাধ্য। ঠিক ঠিক ভাবে প্রণাম করিতে চেষ্টা করা। সেইজন্য বলা হয় যে আর কিছু করিতে পার আর নাই পার অন্তত তাঁহার চরণে শরীর মন দিয়া বার বার প্রণাম করিতে চেষ্টা কর। যদি সকল সময় শরীর দিয়া সম্ভব না হয় তবে মন দিয়াই প্রণাম হয় না বলিয়াই বারবার প্রণাম করিতে পার। এইরূপ করিতে করিতেই একদিন তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। ভগবানের কৃপা তো সর্বদাই বর্ষণ হইতেছে, তোমরা পাত্রটি উপুড় করিয়া রাখিয়াছ বলিয়া উহা বহিয়া যাইতেছে। পাত্রটি চিৎ করিয়া বারবার ওই কৃপা ধরিতে চেষ্টা কর। ওইভাবে করিতে করিতে একদিন পাত্রটি পূর্ণ হইলেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে।

'প্রণাম করার একটা বিধি তো শুনিতে পাইলে অর্থাৎ যাঁহাকে প্রণাম করিবে তাঁহাকে চরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত এবং মস্তক হইতে চরণ পর্যন্ত নিরীক্ষণ

করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সর্বাঙ্গ ধ্যান করিয়া প্রণাম করিবে। যাঁহাকে প্রণাম করিবে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া নিবে। যখন বলা হইতেছে তখন প্রণাম করার আরও একটা বিধির কথা বলিতেছি। ইহা তোমরা অবসর মতো চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। সাধারণত লোকে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণামের কাজটি তাড়াতাড়ি সারিয়া লয়। এখন যে ভাবে প্রণাম করার কথা বলিতেছি উহা ধীরে ধীরে করিতে হইবে এবং নিঃশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। গুরু বা বিগ্রহ যাঁহাকে প্রণাম করিবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবে এবং সেই সময় চিন্তা করিবে যে গুরু বা বিগ্রহ হইতে সমস্ত শক্তি আমার মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। নিঃশ্বাস গ্রহণ করা হইলে মনে করিবে যে আমি এখন ভগবান বা গুরুর সমস্ত শক্তি লাভ করিয়া তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়াছি। ইহাই কুম্ভক বা ধ্যানের অবস্থা। কিন্তু এখানে নিজকে ভগবানের সহিত অভেদ চিন্তা করিলেও 'আমি' থাকিয়া যায়, কেন না এখানে বলা হইতেছে যে, 'আমি তাঁহার সমস্ত শক্তি লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়াছি।' ইহার পর নিঃশ্বাস ছাড়িবার সময় চিন্তা করিতে হয় যে, আমি ভগবান হইতে যে সকল শক্তি লাভ করিয়াছিলাম উহা এবং নিজকে ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিয়া তাঁহার সহিত এক হইতেছি। এই যে ঢালিয়া দিয়া এক হওয়া, অহংকারকে বিসর্জন দিয়া এক হওয়া, ইহাই যথার্থ এক হওয়া। সেইজন্য বলা হয়, সাধনার আরম্ভও যেখানে উহার শেষও সেইখানে—ভগবান হইতেই সমস্ত শক্তি লাভ এবং ভগবানের চরণেই উহার বিসর্জন দিয়া একাত্ম হওয়া। অবসর সময়ে তোমরা ধীরে ধীরে ইহা অভ্যাস করিয়া দেখিতে পার।

'এই শরীরের যখন সাধনার খেলা চলিতেছিল তখন দেখিয়াছি যে ভোগ নিবেদন করিবার সময় এবং প্রণাম করিবার সময় এ শরীরটা যখন উপুড় হইত তখন শরীরের একটা বিশেষ অনুভূতি হইয়া এ শরীরটা একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকিত এবং ওইভাবে ৩।৪ ঘন্টা কাটিয়া যাইত। এই সময় অসংখ্য পিঁপড়া আসিয়া কেবল যে ভোগের দ্রব্য খাইত তাহা নয়, এ শরীরকে উহারা ছাইয়া ফেলিত। তখন তো এ শরীর কোনও সেমিজ জামা পরিত না এবং উহা ছিলও না; কাজেই অনাবৃত শরীরের

উপরেই উহারা হাঁটিয়া বেড়াইত যেন উহা তাহাদেরই ঘর বাড়ি। অসংখ্য লাল পিঁপড়া শরীর ছাইয়া ফেলিলেও উহারা কখনও এ শরীরকে কামড়ায় নাই। যখন হুঁশ হইত তখন ওইগুলিকে দেখিতে পাইতাম। আবার কীভাবে যে ওইগুলি সারিবদ্ধভাবে শরীর হইতে নামিয়া যাইত তাহা যেন ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিতাম না। ভোগের সামগ্রী অনেক কিছু খাইয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া ওইগুলির উপর কোনও রাগও হইত না, বরং মনে হইত যে ভগবানই ওইভাবে ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

৩রা আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (ইং ২০।৯।৫৫)

আজ প্রায় ৭ মাস পরে মা কাশী ফিরিয়া আসিলেন। গত বৎসর শিবরাত্রির পর দোল উপলক্ষ করিয়া শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে চলিয়া যান। দোলের পর বৃন্দাবন হইতে সোলনে যান। খুকুনী দিদিকেও ওই সময় সোলনে লইয়া যাওয়া হয়। জন্মোৎসব এইবার সোলনেই হয়। জন্মোৎসবের পরও মা প্রায় একমাস কাল সোলনে ছিলেন। পরে দেরাদুনে চলিয়া যান। খুকুনীদিকে সেই সময় চিকিৎসার জন্য বোম্বাইতে লইয়া যাওয়া হয়। সেইখানকার বি. কে. শা'ই দিদির চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবার ভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ।

মা দেরাদুনে কিছুদিন থাকিয়া ঝুলনের সময় দিল্লি হইয়া আবার বৃন্দাবনে চলিয়া যান। বৃন্দাবনে মায়ের আশ্রমেই এবার ঝুলন এবং জন্মাষ্টমী উৎসব হয়। কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী এই উৎসবের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। এই উৎসব দুইটি এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

ভাদ্র মাসের শেষে বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া মৈনপুরী, এটোয়া, কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আজ সন্ধ্যা ৭টায় মা কাশী পৌঁছাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দীর্ঘদিন পর আগমন উপলক্ষে আশ্রমের গেট ফুলপাতা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। আশ্রমের গেট হইতে শ্রীশ্রীমায়ের ঘর পর্যন্ত রাস্তা পুষ্পাকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। মা আশ্রমে প্রবেশ করামাত্র কন্যাপীঠের কুমারীগণ দোতলা হইতে মায়ের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। মা ঘরে

গিয়া নিজ আসনে বসিলে তাহারা মাকে আরতি করিল। ইহার পর আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

রাত্রিতে আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে গোপীবাবু মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু মৌনের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের সহিত কোনও কথাবার্তা হইল না। মৌনের পর নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল।

কিছুদিন পূর্বে বাটুদার ছেলেকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে সেই কথা উঠিলে মা বলিলেন, 'শুনিলাম বাটুর ছেলেকে যে দা' দিয়া হত্যা করা হইয়াছে উহা নাকি বাটুরই দা', কৈলাস হইতে বাটু ওই দা আনিয়াছিল। আর হত্যা করিল কে? না, যাহাকে বাটু নিজ বাড়িতে রাখিয়া এতদিন লালন পালন করিয়াছে। একেই বলে নিয়তি!'

মায়ের ভক্তদের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা মারা গিয়াছেন তাঁহাদের কথাও উঠিল। গিরিশ দাশ, গোপাল ঠাকুর, শের সিং এবং ভাইজীর স্ত্রীর নাম উল্লিখিত হইল। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শুনিলাম যে অনেক দিন হইতেই ভাইজীর স্ত্রী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি জীবনে কী ভুলই না করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি যে তাঁহার কোনও বিদ্বেষ ভাব ছিল তাহা নয়। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের বিরুদ্ধে যে সকল অপকীর্তি করিয়াছেন তাহার মূলে ছিল স্বামীর প্রতি আক্রোশ এবং অভিমান। যাহা হউক ভাইজীর মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত ভুলই ভাঙিয়া যায় এবং তিনি কৃতকর্মের অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকেন। চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমা নিজ হইতেই তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া আনেন এবং তিনি মায়ের কাছে আসিয়া তাঁহার অনুশোচনা প্রকাশ করিবার একটা পথ পাইয়া যেন বাঁচিয়া যান। ওই সময় হইতেই তিনি মাকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে তাঁহার সমস্ত অভাবের কথা মাকে নিবেদন করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণধুলি ভক্তিভাবে মস্তকে গ্রহণ করেন। তাঁহাকে মায়ের কোনও একটি আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু পুত্রের প্রতি মমতাবশত তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। চট্টগ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হঠাৎ একদিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সূক্ষ্মদেহে গোপালদাদাকে দর্শন

গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের দেহত্যাগের পর এবার যে তাঁহাকে সোলনে দেখা গিয়াছিল সে গল্পও মা করিলেন। মা বলিলেন, 'তোমরা তো ইঞ্জিনিয়ার ধরণীবাবুকে জান? সে এবার তাহার নাতিকে লইয়া সোলনে গিয়াছিল। একদিন সকালের দিকে আমি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি, ধরণীবাবু তাহার নাতিকে লইয়া ওই ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছে। আরও অনেকে ওইখানে আছে। এমন সময় ধরণীবাবু স্পষ্ট দেখিতে পাইল যে গোপালবাবা খড়ম পায়ে দিয়া রাজবাড়ির দিক হইতে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গোপালবাবার সহিত ওই ধরণীবাবুর কিন্তু বিশেষ পরিচয় ছিল না। একবার মাত্র কাশীতে বাবাকে গীতাজয়ন্তী করিতে দেখিয়াছে এবং সেই সময় হয়তো তাহার সহিত দুই একটা কথাও হইতে পারে। উহার পর আর সে গোপালবাবাকে দেখে নাই বা তাহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও করে নাই। গোপালবাবার যে মৃত্যু হইয়াছে তাহাও ধরণীবাবু জানে না। সে মনে করিল সকলে যেমন উৎসব উপলক্ষে সোলনে আসিয়াছে, গোপালবাবাও বোধহয় সেইরূপ আসিয়াছে। এই ভাবিয়া সে গোপালবাবাকে দেখাইয়া তাহার নাতিকে বলিল যে ইনিই কাশীতে গীতাজয়ন্তী করিয়াছিলেন। নাতিও গোপালবাবাকে দেখিতে পাইল। কিন্তু আর কেহ বাবাকে দেখিতে পায় নাই। যাহা হউক, গোপালবাবাকে আমার ঘরে আসিতে দেখিয়া ধরণীবাবু উপস্থিত একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিল যে গোপালবাবা কত দিন হয় সোলনে আসিয়াছে। যখন জানিতে পারিল যে বাবা প্রায় দুইমাস পূর্বেই মারা গিয়াছে তখন আর তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।'

নারায়ণ স্বামী। গোপালদাদার সহিত তোমার কী কথা হইল?

মা। (আবদার করিয়া) জানই তো সকল সময় সকল কথা হয় না।

এই সকল কথার পর মা আমাদিগকে লাড্ডু প্রসাদ দিলেন। গোপীবাবু বিদায় হইলেন। মা নিজের মোটরে গোপীবাবুকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

বৃন্দাবন আশ্রমে প্রস্তররূপী মহাপুরুষ

গোপীবাবু চলিয়া গেলে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি তো মাঝে মাঝে গোপীবাবার কাছে গিয়া থাক, এবার তোমাদের মধ্যে কী বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে?

আমি। এবার তত্ত্বালোচনা বিশেষ কিছু হয় নাই। তুমি এইখানে আসিলে তোমাকে কয়েকটি ঘটনার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হইবে সেই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

মা। (হাসিয়া) কী কী ঘটনা?

আমি। প্রথমত তোমার পা ভাঙিয়া যাইবার কারণ?

মা। (হাসিয়া) তারপর?

আমি। তুমি দিদিমার রোগের যে মূর্তি দেখিয়াছিলে সেই বিষয়ে।

মা। সে বড় বিকট মূর্তি। আচ্ছা, তারপর?

আমি। বৃন্দাবন আশ্রমে একটি পাথর উঠিয়া নাকি তোমাকে প্রণাম করিয়াছিল?

মা। (হাসিয়া) হইয়াছিল কী জান? বৃন্দাবন আশ্রমের মধ্যে বাগানে একখানা বড় পাথর আছে। কেহ যে ইদানীং উহাকে আনিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়। আশ্রম হইবার পূর্বেও উহা ওইখানেই ছিল। একদিন আমি আশ্রমের মধ্যে একা বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম একটি লোক উঠিয়া এই শরীরকে প্রণাম করিল, তখন এই শরীরের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইয়া গেল, 'ও, তুমি বুঝি পাথররূপে এখানে আছ?' আমার এই কথার কিছুটা দীনবন্ধু (একটি গুজরাটি ভক্ত সন্তান) দূর হইতে শুনিতে পাইয়াছিল এবং সে দেখিতে পাইয়াছিল যে একটি লোক আমাকে প্রণাম করিল। কিন্তু কাছে আসিয়া সে পাথর বই আর কিছু দেখিতে পাইল না। তখন তাহার মনে হইল যে কোনও মহাপুরুষ বোধহয় পাথর রূপে ওইখানে পড়িয়া আছেন। কাজেই লোক যাহাতে ইহার উপরে পা না দেয় সেই উদ্দেশ্যে উহার চারিদিক বাঁধাইয়া রাখিবার জন্য সে কিছু টাকা দিয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের হস্ত হইতে কুকুরের প্রসাদ গ্রহণ

আমি। সোলনে নাকি একটি কুকুর তোমার কাছে আসিয়া মিষ্টি খাইয়া যাইত?

মা। (হাসিয়া) হাঁ, কুকুরটি রাজবাড়ির কুকুর, সে প্রত্যহ তিনটার সময় আসিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। ওই সময় সকলকে প্রসাদ দেওয়া হইত। ওই কুকুরকেও দেওয়া হইত। সে রসগোল্লা খাইতে ভালবাসিত। অন্য মিষ্টি বড় পছন্দ করিত না। এই শরীরের হাত হইতেই সে ওই মিষ্টি নিতে ভালবাসিত। ইহা দেখিয়া একজন উহার জন্য রোজ দুইটি করিয়া রসগোল্লা বরাদ্দ করিয়া দিল এবং ওই সময় কেহ বারবার এই শরীরের কাছে জানিতে চাহিয়াছিল যে ওই কুকুরটি কে? তখন এই শরীর বাজিতপুরে ভোলানাথের যে কুকুর ছিল তাহার গল্প তাহাদিগকে বলিয়া বলিয়াছিল যে কে জানে সেই কুকুরই আবার এখানে আসিয়া জন্ম নিয়াছে কিনা? কারণ পূর্বে গরিবের ঘরে সে তো ভাল খাইতে পায় নাই, তাই বোধহয় বড়লোকের বাড়িতে আসিয়া ভাল ভাল জিনিস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। যোগীভাইও বলিয়াছে যে সে পূজা করিয়া পূজার নৈবেদ্য ইত্যাদি এই কুকুরকেই দিয়া থাকে।

আমি। এই কুকুর পূর্ব জন্মে তোমার কাছে ছিল। সে তোমাকে দেখিয়াছে, তোমার প্রসাদও পাইয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার কুকুর জন্ম ঘুচিল না। তাহা হইলে আমাদেরই বা আশা কী? (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) এখানে আশা নিরাশার কথা হইতেছে না। ভগবানের কত রকম বিধানই তো আছে! এই শরীরের এক ভাই পুনর্জন্ম নিয়াছে বলিয়া এই শরীর তোমাদিগকে বলিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও তো তোমরা বলিতে পার যে তাহার পুনর্জন্ম হইল কেন? সে মুক্ত হইল না কেন? লোকের যে জন্মান্তর হয় উহার মধ্যে অনেক ব্যাপার থাকে। তোমরা তো শুনিয়াছ যে কত মহাপুরুষও বৃক্ষরূপে, সাপ ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ার রূপে থাকেন।

এইরূপ কথা হইতে হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। এইবার মা উঠিলেন। কোথায় ভাগবত জয়ন্তী করা যায় তাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। হলঘরে গিয়া ওইখানকার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে ওইখানে

ভাগবত জয়ন্তী করা সমীচীন হইবে না এবং কোথায় উহা করা যায় সেই সম্বন্ধে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিজ হইতে কোনও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন না।

কয়েকটি অলৌকিক দর্শন

৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (ইং ২৩।৯।৫৫)

গতকালও গোপীবাবু আসিয়াছিলেন। মৌনের পর গোপীবাবু জানিতে চাহিলেন যে এইবার সোলনে দিদিমার রোগের কী মূর্তি মা দেখিয়াছিলেন?

মা। সে বড় বিকট মূর্তি। ওই মূর্তি দেখিয়াই আমি উহাকে একদিক দেখাইয়া সেই দিকেই চলিয়া যাইতে বলিলাম এবং তখনই তোমাদের দিদিমার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে তাঁহার অবস্থা বড় খারাপ। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে একটা কমোডে বসাইয়া দিলাম। তখন তাঁহার কিছু পায়খানা হইয়া গেল এবং উহাতেই সে সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তোমাদের দিদিমার ভিতর ওই রোগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল না; কিন্তু সে বাহিরে থাকিয়াই সামান্য যে একটু দৃষ্টি দিয়াছিল উহাতেই তোমাদের দিদিমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে ওইভাবে পায়খানা করাইতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই রোগের প্রভাবটা অধোগতি হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই তোমাদের দিদিমা রক্ষা পাইয়া গেল।'

মা আবার নিজ হইতেই বলিলেন, 'বাটুর ছেলের যাহা হইয়া গেল উহা ঘটিবার পূর্বে একদিন রাত্রিতে দেখিলাম যে একটি কালো বেঁটে লোক দা লইয়া এই শরীরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গিও কী বিকট! রোগের যেরূপ নানা মূর্তি আছে সেইরূপ খারাপ কর্মেরও মূর্তি আছে। যে মূর্তি আসিয়া এই শরীরের কাছে দাঁড়াইয়াছিল উহা ওই জাতীয় কর্মের এক মূর্তি। ওই মূর্তি দেখিয়া আমি ইহাদের নিকট ওই দর্শনের কথা বলিয়াছিলাম। কবে ওই মূর্তি দেখা হইয়াছিল তাহা হয়তো বুনী লিখিয়া রাখিতে পারে। দুই একদিন পরেই এই হত্যার সংবাদ আসিল। এইরূপ কতই যে দেখা হয়। কিন্তু উহা সব সময় তো বলা হয় না। আর ওই মূর্তি দেখিয়াও উহাকে চলিয়া যাইতে বলিবার খেয়াল হইল না। যদি হইত তবে আর ওই ঘটনা ঘটিত না; কিন্তু ওইদিন সেইরূপ খেয়াল হইল না।

গোপীবাবু। ওইরূপ নিয়তি ছিল বলিয়াই বোধহয় খেয়াল হইল না।

একজন ভক্ত। আপনি তো হত্যাকারীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাহাকে হত্যা করা হইল, তাহাকে কি দেখিতে পান নাই?

মা। হাঁ, তাহাকে তো দেখিয়াছিলামই।

গোপীবাবু। ওই দৃশ্য রাত্রি কয়টার সময় দেখিয়াছিলেন?

মা। রাত্রি ১টা কী ১।। টা হইবে।

গোপীবাবু। তাহা হইলে হত্যার সময়েই দেখা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্যের এক শিশু পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। উহার বয়স ১ বৎসরের কম ছিল বলিয়া মৃত্যুর পর উহাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। মৃত্যুর পূর্বে ওই শিশুকে মা দেখিয়াছিলেন কিনা নারায়ণ স্বামী উহা মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, 'হাঁ, তাহাকেও গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম।

হরিবাবার উপরে প্রেতের উপদ্রব

মা আবার বলিলেন, 'হরিবাবা এবার শিবপুরীতে গিয়াছিল। ওইখানে তাহার এক সাধুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এবার গিয়া দেখে যে সে সাধু মারা গিয়াছে। হরিবাবা সাধুদের সমাধিস্থানও দেখিতে যায়। একদিন রাত্রিতে হরিবাবা বোধ করিল যে কে যেন তাহার কোমর স্পর্শ করিতেছে। সে চাহিয়া দেখে যে এক মূর্তি যাহার পরনে একটি গামছা। কিন্তু মূর্তি খুবই অস্পষ্ট। হরিবাবা তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিবামাত্র সে যেন শূন্যে মিলিয়া গেল। এই প্রেত মূর্তি দেখিয়া হরিবাবা তাহার কল্যাণের জন্য পরদিন ওইখানে সাধুদের ভাণ্ডারা দিল এবং রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা করিল।

'শিবপুরী হইতে হরিবাবা যখন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিল তখনও কিন্তু তাহার প্রেত দর্শন হইতে লাগিল। সে হয়তো ঘুমাইয়া আছে, ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ তাহার মনে হইত কেহ যেন ঘরের মধ্যে আসিয়াছে। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই সে অস্পষ্ট এক মূর্তি দেখিতে পাইত অর্থাৎ সে ঘুমাইয়া থাকিলেও প্রেত তাহার আগমন সংবাদ হরিবাবাকে জানাইয়া দিত। কিন্তু ভাল করিয়া চাহিতে গেলেই ওই মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যাইত। কখনও হয়তো উহা শূন্যে

মিলিয়া যাইত আবার কখনও কখনও দেখা যাইত যে মূর্তিটি যেন দোতলা হইতে এক তলায় দৌড়াইয়া নামিয়া যাইতেছে। একদিন রাত্রিতে বাবা দেখে কী যে তাহার ঘরে যে হ্যারিকেনটি জ্বলিতেছিল কে যেন উহা কমাইয়া অন্য স্থানে রাখিয়া দিয়াছে এবং ঘরের ভিতর হইতে দরজা বন্ধ ছিল তাহাও কে যেন খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। হরিবাবার ঘরে একজন ব্রহ্মচারী থাকে। তাহাকে ওই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল যে সে ওই সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ওই ব্রহ্মচারী খুব সৎ লোক এবং হরিবাবার একান্ত ভক্ত। হরিবাবা আমাকে বলিয়াছে, 'মা, এসব কী যে হইতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এই সকল দর্শনাদির জন্য আমার রোজ রাত্রিতে এক ঘন্টা সময় নষ্ট হইতেছে।'

আজ সকাল বেলায়ও হরিবাবার প্রেত দেখার কথা উঠিল। মা বলিলেন, 'সাধন বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছে। তাহার নিকট শুনিলাম যে প্রেতের উপদ্রব নাকি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নাকি একদিন রাত্রিতে হরিবাবা যখন ঘুমাইতে ছিল তখন কে যেন তাহাকে চৌকির উপর হইতে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দেয়। যদিও ওই চৌকি বেশি উঁচু ছিল না তথাপি হরিবাবা পায়ে চোট পাইয়াছে।

এই সকল কথার মধ্যে অবধূতজী মাকে বলিলেন, 'উড়িয়া বাবার আশ্রমে এই ভূতের ব্যাপার লইয়া বৃন্দাবনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে বলিতেছে যে, যে আশ্রমে সর্বদাই নাম হয়, সৎসঙ্গ হয়, বড় বড় মহাত্মারা যেইখানে ছিলেন এবং এখনও আসিয়া থাকেন, সেইখানে হরিবাবার মতো একজন বড় মহাত্মার উপর ভূতের অত্যাচার, এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার! ভগবানের নাম করিলে ভূত প্রেতাদি আসিতে পারে না বলিয়া যে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ওইগুলি কি তবে মিথ্যা কথা? তাহা না হইলে ইহা সম্ভব হয় কীরূপে? বাস্তবিক পক্ষে লোকের এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বলিবার কিছু নাই। সেইজন্য মাকে বলিতেছি যে মাকে ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে লোকের ভগবানের উপর ভক্তি বিশ্বাস যাহা কিছু এখনও আছে তাহা সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্মের গ্লানি হইলেই অবতারাদির আগমন হইয়া থাকে। মা যখন আসিয়াছেন তখন তাঁহার দেখা দরকার যে লোকের ভক্তি বিশ্বাস এবং ধর্মভাব যেন নষ্ট না হয়।' অবধূতজীর কথা শুনিয়া মা

বলিলেন, 'হরিবাবা যখন আমাকে প্রেতের ওইসব উপদ্রবের কথা বলিয়াছিল তখন আমি কথায় কথায় বলিয়াছিলাম যে এরূপ যখন হইতেছে তখন ইহারা (অর্থাৎ হরিবাবার ভক্তরা) এক কাজ করিয়া দেখিতে পারে,—বাবা যখন ঘুমাইয়া থাকিবে তখন দুই একজন যেন ওই ঘরে বসিয়া নাম, জপ করে। কিন্তু উহারা তখন আমার কথামতো কাজ করে নাই। সাধনের নিকট শুনা গেল যে, যেদিন হরিবাবাকে চৌকি হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয় উহার পর হইতেই উহারা রাত্রিতে বাবার নিকট বসিয়া জপ আরম্ভ করিয়াছে। যে দুই তিনদিন জপ করা হইয়াছে সেই ক'দিন আর ভূতের উপদ্রব হয় নাই।'

সাধন ব্রহ্মচারীর নিকট আরও শুনা গেল যে কোনও জ্যোতিষী নাকি গণনা করিয়া বলিয়াছে যে, যে প্রেতটি এই সকল কর্ম করিতেছে সে হইল ঠাকুর দাসের প্রেত। সে অবশ ভাবেই এই কাজ করিতেছে। এই ঠাকুর দাসই উড়িয়াবাবাকে কুড়াল দিয়া হত্যা করিয়াছিল। ঠাকুর দাসের প্রেত নাকি বলিতেছে যে সে উড়িয়া বাবার আশ্রমকে ভূতের বাড়িতে পরিণত করিবে। যাহাতে হরিবাবা এখানে না থাকেন সেইজন্য তাঁহার উপর উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।

আকাশ পথে দিব্য সঙ্গীত

৬ই আশ্বিন, শুক্রবার (ইং ২৩। ৯। ৫৫)

আজও গোপীবাবু শ্রীশ্রীমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। মৌনের পর মা চত্বরে বসিয়াই নানা কথা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'একবার হরিবাবার নিকট শুনিয়াছিলাম যে বুদ্ধদেবের সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি নাকি বৃন্দাবনে পাখি হইয়া একসময় সাধন ভজন করিতেছিল এবং সে যে মন্ত্র জপ করিত তাহা নাকি এই—

'হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।'

ওই নাম করিতে করিতে তাহার নিত্যলীলাদি দর্শন হয় এবং পরে সে ভগবৎধামে গমন করে। হরিবাবার ওই কথা শুনিয়া আমার মথুরার এক ঘটনার কথা মনে পড়িয়াছিল। সে অনেকদিনের কথা। একবার আমরা মথুরায়

গিয়াছিলাম। একদিন রাত্রিতে শুনিতে পাইলাম কে যেন শূন্যে অতি মধুর স্বরে একটি গান গাহিয়া চলিয়াছে। কেহ আঁকা বাঁকা পথে গান গাহিয়া গেলে উহা যেমন কখনও স্পষ্ট এবং কখনও অস্পষ্ট শুনা যায়, ওই গানের শব্দও আমরা ওইরূপ শুনিয়াছিলাম। ওই কণ্ঠস্বর এত মধুর ছিল যে উহাকে দিব্য বলিলেও ভুল হইবে না। অভয় প্রভৃতি কয়েকজন আমার সঙ্গে ছিল। তাহারাও ওই গান শুনিয়াছিল, কিন্তু কেহই গানের পদগুলি বুঝিতে পারে নাই। পূর্বে যে মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে ওই গানের পদগুলি তাহাই।'

বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের সময় বৃন্দাবনের যোগেন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'বৃন্দাবনে মহাত্মারা যে গাছ, পাখি হইয়া থাকেন—এই প্রবাদ প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। আমাদের বর্ধমান কুঞ্জের উঠানের মাঝখানে একটি কাঁটাগাছ ছিল। উহা বেশ পুরাতন গাছ। আমি যেইবার বর্ধমান কুঞ্জে প্রথম গেলাম তখন ওই গাছটি দেখিয়া আমি উহা কাটিয়া ফেলিতে বলিলাম। কিন্তু ওইখানকার লোকেরা আমাকে ওইরূপ কর্ম করিতে নিষেধ করিল। তাহারা বলিল যে পূর্বেও এই গাছটিকে একবার কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যে লোকটি গাছটিকে কুড়াল দিয়া আঘাত করে তাহার হাত হইতে তৎক্ষণাৎ কুড়ালটি পড়িয়া যায় এবং সে নিজেও বাত ব্যাধিতে বহুদিন কষ্ট পায়। সেই সময় গাছটি নাকি স্বপ্নে জানাইয়াছিল যে সে একজন ব্রাহ্মণ, বৃক্ষরূপে ওইখানে দাঁড়াইয়া সাধন করিতেছে। ইহার পর আর গাছটিকে কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বৎসরে একবার করিয়া অবশ্য উহার ডাল পালা কিছু কিছু ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ ওইরূপ না করিলে উঠান দিয়া লোকেদের চলাফেরা করার অসুবিধা হইত।

'বৃন্দাবনে রথযাত্রার সময় যখন রাধাগোবিন্দকে রথে উঠাইয়া রথ টানা হয় সেই সময় ওই রথ বর্ধমান কুঞ্জের কাছে আসিলে উহাকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করাইয়া কুঞ্জের পক্ষ হইতে বিগ্রহকে আরতি ইত্যাদি করা হয়। এই প্রথাই অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এবার রথের সময় গোবিন্দজীর রথ আসিয়া যখন কুঞ্জের দ্বারে থামিল তখন ওই কাঁটা গাছটি আপনা হইতেই

রথের সম্মুখে সটান পড়িয়া গেল। ঝড়, বাতাস এই সময় কিছুই ছিল না। গাছটিকে ওইভাবে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সকলে তো অবাক। ইহার পর হইতেই গাছটি মরিয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল, তখন উহাকে তুলিয়া যমুনায় বিসর্জন দেওয়া হইল।'

বিভু ব্রহ্মচারীর মধ্যে রাধার মহাভাবের সঞ্চার

মা বলিলেন, 'একবার যখন সিমলায় ছিলাম, তখন একদিন শুনিতে পাইলাম কে যেন খুব করুণ সুরে গান করিতেছে। শুনিয়াই মনে হইল রাধা যেন কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া ওই গান করিতেছে। বিরহের যে ভাবটা গানের করুণ সুরের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল উহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওই বিরহের কোনও সীমা নাই। বিভু গান করে বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া গানটি এবং উহার সুরটি বলিয়া দিলাম। সুর বলিয়া দিলেই যে সকলে ওই গান ওই সুর গাহিতে পারিবে তাহা নয়। তাহার ভিতর যখন ওই বিরহের ভাব জাগিয়া উঠিবে তখনই কেবল ওই সুরে গানটি আসিবে। বিভুকে আমি মাঝে মাঝে একা এই গান করিতে বলিয়াছি। এখন বিভু এই গান করিতে গেলেই কাঁদিয়া ফেলে।'

গোপীবাবু ওই গানটি শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা বিভুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। বিভু আসিলে মা তাহাকে বলিলেন, 'বিভু, তুই সিমলার গানটা গা'তো।' বিভু হারমোনিয়াম লইয়া বসিয়া উহাতে সুর দিতে দিতেই বার বার চোখ মুছিতে লাগিল এবং মাকে বলিল, 'গান গাহিতে পারিতেছি না, আমার বুক কাঁপিতেছে।'

মা। একটু চেষ্টা করিয়া দেখ না।

সে আবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইবার পূর্বেই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে দিয়া তখন যে আর গান চলিতে পারে না তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম।

মায়ের কাছে খুকুনীদিদির সূক্ষ্মে আগমন এবং আশীর্বাদ লাভ

এই সময় বোম্বাই হইতে ফোন আসিল যে খুকুনীদিদির অবস্থা ভাল নয়। তিনি কিছুই খাইতে পারেন না। যাহা খান তাহাই বমি হইয়া পড়িয়া যায়। খুব

দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। কথাবার্তাও খুব কম বলেন। মা বলিলেন যে উহাদিগকে ফোন করিয়া দাও যে দিদিকে সমুদ্রের ধারে পাঁচতলার উপর না রাখিয়া এক তলা কী দোতলায় কোথাও রাখা যায় কিনা সেই চেষ্টা যেন উহারা করে। অবশ্য ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই যেন সব কিছু করা হয়। আর দিদিকে এখানে আনিতে হইলে এখান হইতে কোনও লোক বোম্বাইতে পাঠানো দরকার কিনা তাহাও উহাদিগকে জানাইতে বলিলেন। মায়ের কথামতো ফোন করা হইল। উহারা জানাইলেন যে কাশী হইতে কোনও লোক পাঠাইবার দরকার নাই।

এই সকল কথার পর মা বলিলেন, 'এবার যখন মৈনপুরীতে ছিলাম তখন একদিন দেখিতেছি যে দিদি (খুকুনীদিদি) এই শরীরের কাছে আসিয়াছে। তাহার কাপড় ইত্যাদি সবই পরা আছে, কিন্তু উহা সত্ত্বেও আমি তাহার সর্বাঙ্গ দেখিতেছি। সে আমাকে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে বমির জন্য তাহার বুঝি খুব কষ্ট হইতেছে। সে উহা স্বীকার করিল। তখন আমি তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলাম। এলাহাবাদেও একদিন দিদিকে দেখিয়াছিলাম। সেদিনও তাহার কাপড় পরা ছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার সর্বাঙ্গ দেখিতে পাইয়াছিলাম। যদি জিজ্ঞাসা কর কাপড় পরা থাকিলে আমি সর্বাঙ্গ দেখি কীরূপে? তাহার উত্তরে বলিতে পারি যে আমি কাপড়ের ভিতরে গিয়া সর্বাঙ্গ দেখি, রক্ত মাংসের সহিত মিশিয়া সর্বাঙ্গ দেখি।' (সকলের হাস্য)

গোপীবাবু। ইহা একটা আশার কথা যে আপনি দিদির গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন।

ইহার পরই গোপীবাবু বিদায় লইলেন। মা-ও আসন হইতে উঠিয়া আগামীকল্য ভাগবত জয়ন্তীর জন্য যেই সকল বন্দোবস্ত করা হইতেছিল উহা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ওই সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সময় আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৭ই আশ্বিন, শনিরার (ইং ২৪।৯।৫৫)

আজ হইতে ভাগবত জয়ন্তী আরম্ভ হইয়াছে। ভাগবত পাঠ করিতেছেন

পণ্ডিত শুকাচার্য। ইনি বৃন্দাবনবাসী। ইনি সমস্ত দিন প্রায় উপবাসী থাকিয়া প্রত্যহ ১০।১১ ঘন্টা করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। খুব অল্প লোকই এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিতে পারেন।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমায়ের পা ভাঙিবার কারণ

১৫ই আশ্বিন ভাগবত জয়ন্তী শেষ হয় এবং ১৬ই আশ্বিন বিকালে মা বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যান। পরদিন অর্থাৎ ১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার সকালে গোপীবাবুকে সঙ্গে লইয়া আমাকে বিন্ধ্যাচল যাইতে আদেশ করেন। আমরা মঙ্গলবার দিন মায়ের মোটরে বেলা প্রায় ৯টার সময় রওনা হইয়া ১০।। টার সময় বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাই।

ওইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মা আমাকে লইয়া গোপীবাবুর সাধন কুটিরে যান। ওই সময় মাকে একান্তে পাইয়া তাঁহার পায়ের পাতা ভাঙিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, 'ওই সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। গোপীবাবাকে কিছু কিছু বলিয়াছি। সকল কথা বলিবার এখন সময় নাই, আর এই সব কথা সর্বসাধারণে প্রকাশ হওয়াও ঠিক নয়। কারণ ইহাতে কেহ কেহ মনে কষ্ট পাইতে পারে। তোমাকে ওই সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে বলিতেছি। যদি কখনও খেয়াল হয় তবে বিস্তার করিয়া বলিব।

'তোমরা জান যে এবার বৃন্দাবনে গৌর নিতাইয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার পূর্বে কথা হইয়াছিল যে এই বিগ্রহের পূজাদির যে বিশেষ পদ্ধতি আছে উহা এখানে অনুসরণ করা হইবে কিনা। সেই সময় হরিবাবা বলিয়াছিল যে, যেহেতু মায়ের নিজের কোনও বিশেষ সম্প্রদায় নাই এবং সকল সম্প্রদায়কেই মা নিজের সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন সেইজন্য এই বিগ্রহের পূজায় সম্প্রদায় বিশেষের পূজা পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে না। এখানে নিত্যকার যে পূজা হইবে উহা হইবে ভাবের পূজা।

'ভাবের পূজায় অবশ্য ক্রিয়া কর্ম ঠিক ঠিক ভাবে না করিলেও কোনও দোষ হয় না; কিন্তু ওই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় কিছু ক্রিয়া কর্ম করিতে হইল এবং উহা দোষযুক্ত হইল। কারণ যাহাকে দিয়া বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে পূজাদি করান হইয়াছিল সে ওই জাতীয় পূজার বিধি জানে না এবং যে ওই সম্বন্ধে

নির্দেশ দিল সেও পূজা এবং ভোগান্তে বিগ্রহকে যে শয়ন দিতে হয় তাহা বলিয়া দিতে ভুলিয়া গেল।

'সন্ধ্যার সময় হরিবাবা ওই বিগ্রহের সম্মুখে কীর্তন করিত। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি গৌরাঙ্গ মন্দিরে উপস্থিত আছি, এমন সময় হরিবাবা সন্ধ্যা কীর্তন করিতে ওইখানে আসিতেছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া আমি সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় এই শরীর খুব ভার বোধ হইতে লাগিল। দীর্ঘকাল কেহ দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার শরীর যেরূপ ভার বোধ হয় ইহাও যেন সেইরূপ। এই সময় ডান পায়ের পাতাটি হঠাৎ মোচড়াইয়া গিয়া শরীরের সমস্ত ভার ওই মোচড়ানো পাতাটির উপর পড়িল। যাহার ফলে আমি দারুণ চোট পাইয়া বসিয়া পড়িলাম। পায়ের পাতার হাড়টি দুই টুকরা না হইলেও উহা ফাটিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, ইতিমধ্যে হরিবাবা তাহার দলবল সহ মন্দিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। হরিবাবা আমাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমি চোট পাইয়াছি কিনা, আমি ওই কথার উত্তর না দিয়া তাহাকে কীর্তন আরম্ভ করিতে বলিয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলাম এবং ওইখানে যাহারা ছিল তাহাদিগকে একটা বড় থালায় জল লইয়া আসিতে বলিলাম। প্রথমে তাহারা একটা টোকস লইয়া আসিল; কিন্তু উহাতে পায়ের পাতা সমান ভাবে রাখা যায় না দেখিয়া পরে একটা কিনারা উঁচা থালা লইয়া আসিল। আমি উহাতে পা সমান ভাবে পাতিয়া জল দিয়া ডুবাইয়া রাখিলাম। পায়ের ব্যথা দারুণ ভাবে চলিতে লাগিল।

'পরমানন্দ আমাকে পড়িয়া যাইতে এবং একটু পরেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল। সে আসিয়া পায়ের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার আনিতে চাহিল কারণ তখন পা কতকটা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। যে ডাক্তার আনিতে চাহিল সেও কিন্তু পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট ছিল।

'এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে মথুরার সিভিল সার্জন এক বাঙালি ডাক্তার, একদিন এই শরীরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া নিজ হইতেই বলিয়াছিল যে প্রয়োজন হইলে সে এ শরীরের চিকিৎসা করিতে পারে। তখন তাহাকে

বলা হইয়াছিল যে যদি চিকিৎসা করিতে হয় তবে তাহাকে খবর দেওয়া হইবে। পরমানন্দ তাহাকে খবর দেওয়া মাত্র সে আসিয়া আমার পা পরীক্ষা করিয়া বলিল যে পায়ের পাতা এইভাবে সমান করিয়া পা পাতিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা খুব ভাল হইয়াছে। তাহা না হইলে ইহা যে কেবল অসম্ভব রূপে ফুলিয়া যাইত তাহা নহে, হয়তো চিরদিনের মতো পা খানা পঙ্গু হইয়াও যাইতে পারিত। ডাক্তার আসিবার পূর্বেই খেয়াল বশে এ শরীরের ব্যবস্থা এই শরীরই করিয়াছিল।

'যাহা হউক ডাক্তার আর আমাকে হাঁটিয়া ঘরে যাইতে দিল না। আমাকে একটা চেয়ারে বসাইয়া ঘরে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে বিশ্রামে রাখা হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ভাল হইয়া উঠিলাম।

আমি। আমরা শুনিয়াছি যে এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পূর্বেই নাকি তুমি বৃন্দাবন আশ্রমের সকলকে সাবধানে চলাফেরা করিতে বলিয়াছিলে?

মা। হাঁ, ওই ঘটনা যেদিন হয় তাহার আগের দিন আমি ওই কথা বলিয়াছিলাম কারণ আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে একজনকে কয়েকজন ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। অপরকে লইয়া যাওয়া আর এই শরীরকে লইয়া যাওয়া একই কথা। কারণ এই শরীরের কাছে অপর বলিয়া তো কিছু নাই। তোমরা জান যে শশাঙ্কবাবু (অখণ্ডানন্দজী) একবার পূজার সময় এই শরীরকে তাহার বাড়িতে লইয়া গিয়াছিল। ওই পূজায় যে পাঁঠা বলি দেওয়া হইয়াছিল উহার কান কাটা ছিল। ওইরূপ পাঁঠা বলি দেওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে পুরোহিত বলিয়াছিল যে এরূপ পাঁঠা বলি দিলে যে কোনও দোষ হয় তাহা সে জানে না। কাজেই দোষযুক্ত পাঁঠাই বলি দেওয়া হইল। কাজটি হইল অশাস্ত্রীয় এবং ইহার ফলও ভাল নয়। যাহাতে লোকের অমঙ্গল না হয় সেই জন্যই তো এই শরীরকে কোনও ব্যাপারে বাড়ি লইয়া যাওয়া হয়? সেইজন্য সেবারও এই শরীরের পা ভাঙিয়া পাঁচ সাত দিন পর ভাল হইয়াছিল।

আমি। পূজার সময় শশাঙ্কবাবুকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তুমি তোমার শরীরে তাঁহার ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলে। হরিবাবাও বৃন্দাবন আশ্রমে গৌর নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন এবং ওই বিগ্রহ স্থাপন করিতে গিয়া কিছু ত্রুটি হইয়া গিয়াছে। ওই কর্মের ফল হইতে হরিবাবাকে রক্ষা করিবার জন্যই কি তুমি তাঁহার ভোগ আবার নিজ দেহে গ্রহণ করিলে?

মা। বিগ্রহ স্থাপন হরিবাবা করে নাই। উহা পান্নালালবাবা করিয়াছে। তবে কাহার কর্মের জন্য এই ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা প্রকাশ না করাই ভাল। কারণ এসব কথা প্রচার হইলে তাহার প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে। তবে ইচ্ছা করিয়া তো কেহ অশাস্ত্রীয় কিছু করে নাই। এ জাতীয় পূজাদি করিতে কী কী করিতে হয় তাহা তো উহাদের সব জানা নাই। পাঞ্জাবি শরীর কিনা, তাহারা বাংলাদেশের পূজার বিষয় কী জানে? এখন সময় নাই বলিয়া তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। তবে ইহা যাহাতে বেশি লোক জানিতে না পারে তাহাই করা উচিত।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মা গোপীবাবুকে আহ্নিক করিতে অনুমতি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

আমরা বিন্ধ্যাচলে থাকিতেই স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী দিল্লি হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিলেন। দিল্লিতে হরিবাবার সহিত তাঁহার দেখা হয়। হরিবাবা মাকে দেওয়ার জন্য একটি মালা দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে মা যাহা ভাল মনে করেন তাহাই যেন করেন। স্বতন্ত্রানন্দজী ভাঙা ভাঙা বাংলায় ওই কথা মাকে বলিলে মা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বাবা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমি সচরাচর বলিয়া থাকি যে, 'পিতাজী যাহা ভাল মনে করে তাহাই যেন করে।' তাই বাবা আমার কথা আমাকেই ফিরাইয়া দিয়াছে। হরিবাবার ইচ্ছা ছিল যে আমাকে নিয়া হোসিয়ারপুর যায়। সেখানে তাহার গুরুদেবের আশ্রমে সৎসঙ্গের জন্য এবার তাহারা বড় করিয়া মণ্ডপ করিবে। এতদিন একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নীচে সৎসঙ্গ হইত। আমি কয়েকবার ওই সৎসঙ্গে গিয়াছি। যেবার উহারা অশ্বত্থ গাছটির গোড়া ইট দিয়া বাঁধাইয়া দিল সেইবারই গাছটি পড়িয়া গেল। সেইজন্য এবার পাকা ঘর করিতেছে। এই শরীরের বয়স যখন ৩।৪ বৎসর তখন তোমাদের দিদিমা এই শরীরকে লইয়া দেবালয়ে যাইত। দেবালয়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলেই নিজ নিজ প্রার্থনা দেবতাকে জানায়। কেহ হয়তো দেবতার কাছে বিদ্যা চায়, কেহ ধন, কেহ বা অন্য কিছু চায়; তোমাদের দিদিমাও এ শরীরকে বিগ্রহের নিকট প্রার্থনা জানাইতে বলিত। এ শরীর আর কী প্রার্থনা করিবে? এ শরীর বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া বলিত, 'তুমি যাহা ভাল মনে কর তাহাই কর।" এই কথা বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

১৯শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার

আজ বিকালে মা বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী ফিরিয়া আসেন। আমাদিগকে পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে কাশী ফিরিতে বলেন। বিন্ধ্যাচলে তিন রাত্রি বাস করা বোধহয় গোপীবাবুর প্রয়োজন ছিল। তাই মা ওই ব্যবস্থা করিলেন। মা আরও বলিয়া আসিলেন যে আমরা কাশী পৌঁছাইয়া যেন সোজা আশ্রমে চলিয়া যাই এবং ওইখানে প্রসাদ পাই কারণ ওইদিন অখণ্ডানন্দজীর তিরোভাব উৎসবের ভাণ্ডারা ছিল।

শুক্রবার দিন অতি প্রত্যুষেই মায়ের গাড়ি বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপীবাবু, কুসুম ব্রহ্মচারী এবং আমি ওই মোটরে কাশী আসিলাম। আমরা আশ্রমে আসিয়া দেখি যে মা সৎসঙ্গে বসিয়াছেন। অবধূতজী এবং স্বতন্ত্রানন্দজীও ওইখানে আছেন। সান্যাল মহাশয়ের একটা প্রশ্ন লইয়া দুই মহাত্মার মধ্যে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়ই গোপীবাবুকে মধ্যস্থ মানিতে লাগিলেন। কিন্তু গোপীবাবু বিনীত ভাবে ওই তর্কে কোনও অংশগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ব্যাপার বেশিদূর গড়াইবার পূর্বেই মা সৎসঙ্গ হইতে উঠিয়া অন্যত্র গেলেন এবং একটু পরেই উপস্থিত সাধুদিগকে আহারের জন্য আহ্বান করা হইল। সাধু ভোজনান্তে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

সন্ধ্যার পর ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী মহাশয় গান করিলেন। ইঁহাদের গান বিশেষত ছবির গান সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

মৌনান্তে মা গোপীবাবু এবং আমাকে ডাকিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। সেইখানে নানা কথার মধ্যে আজ দুপুরে অবধূতজী এবং স্বতন্ত্রানন্দজীর মধ্যে যে বিষয় লইয়া তর্ক হইয়াছিল সেই কথা মা উঠাইলেন। গোপীবাবু বলিলেন যেই ইঁহারা দুইজনেই যাহা বলিতেছিলেন তাহা তাঁহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে যথার্থ। কিন্তু মুশকিল এই যে দুইজনেই তাঁহাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্তে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে একে অন্যের চিন্তাধারার যৌক্তিকতা লক্ষ্য করিতে পারেন না। এই কারণে পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইলে অনেক অবাঞ্ছনীয়

ব্যাপার হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদান্তে কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা নাই। এইজন্য বেদান্তবাদীদিগকে মায়া ইত্যাদি ছয়টি বস্তুকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। তন্ত্র ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য শক্তি স্বীকার করিয়া ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বেদান্ত সাধনা শুধু শুষ্ক বিচারে পরিণত হইয়াছে। ইদানীং বেদান্তবাদীরা যাঁহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন সেই বিদ্যারণ্য মহারাজই বলিয়াছেন যে বেদান্ত সাধনার দুই পথ আছে—এক হইল উপাসনা প্রধান এবং দ্বিতীয় হইল বিচার প্রধান। এই দুই উপায়েই জ্ঞানলাভ করা যায়। তবে উপাসনা প্রধান বেদান্ত সাধনায় চিত্তের মল কাটিয়া যায় বলিয়া জীবন্মুক্তি সম্ভব হয়। শুধু বিচার পথে উহা সম্ভব নয়। বিচারের ফলেও জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু উহা সাধারণত বিদেহ অবস্থায়ই হইয়া থাকে। চিত্তের আবিলতা থাকে বলিয়া জীবদ্দশায় ওই জ্ঞানের প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের নিজের সাধনাও উপাসনা প্রধান ছিল। শঙ্করাচার্যের শিষ্যদের মধ্যেই বিচারের প্রাধান্য দেখা যায় এবং এইখানেই যত মতভেদ।

মা। আচ্ছা, বাবা, এই যে মতভেদ ইহা কীরূপ? অবশ্য এখানে কথা বলিবার জন্যই কথা বলা হইতেছে। একরূপ মতভেদ আছে যেখানে অপরে যাহা বলে তাহা মানিয়া লইয়াও নূতন কিছু বলা যায়। আবার অপরের মতকে সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডন করিয়া নিজের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

গোপীবাবু। শঙ্করাচার্যের শিষ্যদের মধ্যে দেখা যায় যে তাহারা একে অন্যের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াই নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মা। সকল মতই যে সত্য, যাহা কিছু বলা হইতেছে তাহা ওই একের সম্বন্ধেই বলা হইতেছে এ জাতীয় কথা কি শাস্ত্রে নাই? যেমন এই শরীর বলে যে সকল পথই তোমার পথ এবং তোমার পথই সকলের পথ। যতক্ষণ তোমার পথ এবং অন্যের পথ আলাদা আলাদা থাকিবে ততক্ষণ কিছুই হইল না। যেমন হাত, পা, মুখ, নাক ইত্যাদি সমস্ত লইয়াই আমি। ইহার কোনও একটি বাদ দিয়া বা অস্বীকার করিয়া যেমন আমার আমিত্ব পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ

ভগবানকে লাভ করিবার অনন্ত পথ থাকিলেও উহার সবগুলিই যে ঠিক তাঁহার এবং তিনিই—এই জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় ততক্ষণ অখণ্ড জ্ঞান কোথায়? এ জাতীয় কথা কি তোমাদের শাস্ত্রে নাই?

গোপীবাবু। হাঁ, সিদ্ধান্ত হিসাবে ইহা শাস্ত্রে আছে সত্য, কিন্তু কোনও মহাপুরুষের মুখে এইরূপ কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা তত্ত্বালোচনা করিতে সাধারণত কোনও একটা বিশিষ্ট পথ ধরিয়াই করিয়া থাকেন। সকল পথই যে সমানভাবে সত্য এবং উহার কোনওটাই যে বাদ দেওয়া যায় না এইরূপ কথা শাস্ত্রেও স্পষ্ট ভাবে নাই এবং আজ পর্যন্ত কোনও মহাপুরুষের নিকটও এইরূপ কথা শুনি নাই। তন্ত্রশাস্ত্রেও সাধনার বিভিন্ন স্তরের কথা আছে, কিন্তু এই সকল স্তরের মধ্যেও উচ্চ নীচ বলিয়া ভাগ করা হয়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। গোপীবাবু বিদায় হইলেন।

২১শে আশ্বিন, শনিবার (ইং ৮।১০।৫৫)

আজ সকালে মা বোম্বাই রওনা হইয়া গেলেন। বেলা ৭।। টার সময় মা ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। এই সময় সকলেই মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মা রামতারণ বাবুর ভ্রাতার খোঁজ করিলেন। রামতারণবাবুর ভ্রাতার বাতব্যাধির জন্য অর্ধাঙ্গ অবশ। তিনি উহা লইয়াই কষ্টে চলাফেরা করিয়া থাকেন। মা আমাকে বলিলেন, গতকাল সন্ধ্যার সময় রামতারণ বাবার ভাই আমার ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।' এই সময় রামতারণবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'না, মা, আপনার ধাক্কা লাগিয়া ভাই পড়িয়া যায় নাই। আপনাকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।'

একটু পরেই রামসাধনবাবু আসিলেন। মা অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলিয়া শেষে হাসিতে হাসিতে রামসাধনবাবুকে দুইহাত দিয়া স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'এই শরীরকে উপলক্ষ করিয়াই কাল তুমি পড়িয়া গিয়াছিলে। শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলকর স্পর্শে রামসাধনবাবু অভিভূত হইয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে মায়ের শ্রীচরণে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। উপস্থিত শঙ্করানন্দ স্বামীজী প্রভৃতি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মাও

তাঁহাকে ধৈর্য ধারণ করিতে বলিলেন। ইহার পরই মা গিয়া মোটরে উঠিলেন। আমরাও স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

রাঁচিতে ঁকালীমূর্তি স্থাপনা

২৮ শে কার্তিক, মঙ্গলবার ১৩৬২ (ইং ১৫।১১।৫৫)

আজ বেলা ৬।। টার সময় মা কাশী আসিয়াছেন। গত পূজার সময় মা বম্বে হইতে কলিকাতা গিয়াছিলেন, সঙ্গে খুকুনীদি প্রভৃতিও ছিলেন। পূজার পর মা একদিনের জন্য দেওঘরে যান। পরে রাজগীরে ৩।৪ দিন থাকিয়া রাঁচি চলিয়া যান। দীপান্বিতার সময় রাঁচির আশ্রমে ঁকালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৩৩৩ সনে ঢাকা শা'বাগে যে কালীমূর্তির পূজা হইয়াছিল এবং যাহা দীর্ঘদিন ঢাকা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরে ভাঙিয়া যায়, রাঁচির আশ্রমে স্থাপিত কালী ঢাকার ওই কালীমূর্তিরই প্রতীক। তবে ইহা মৃন্ময় না হইয়া অষ্টধাতুর দ্বারা তৈয়ার। ঢাকার কালী যত বড় ছিলেন এবং যে রং-এর ছিলেন, এই কালীও ঠিক তত বড় এবং সেই রং-এর। মা যখন আশ্রমে পৌঁছান তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। বাজার শেষ করিয়া মায়ের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিলাম। মা তাঁহার ঘরেই ছিলেন। মাকে প্রণাম করিতেই মা আমাকে বলিলেন, 'ঁকালী এবার সকলের ঘাড় ধরিয়াই যেন নিজের প্রতিষ্ঠা করাইয়া নিলেন; কারণ যে সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল উহা চিন্তা করিলে ব্যাপারটি অসাধারণ বলিয়া মনে হয়।'

দিদিমাকে দিয়া দীক্ষা প্রদান আরম্ভ

এমন সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মা, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন?

মা। দেখা তো আছেই, তবে নাম ধাম বলিবার খেয়াল এখন হইতেছে না।

ভদ্রলোক। আগামীকাল আপনার মায়ের নিকট হইতে দীক্ষা নিব।

মা। তা' তোমরা যাহা ভাল মনে কর, করিবে। এ সম্বন্ধে আমি আর কী বলিব? তুমি এই শরীরের মায়ের নিকট দীক্ষা চাহিয়াছিলে?

ভদ্রলোক। হাঁ।

মা। সেইজন্য বোধহয় দীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছে। (আমাদিগকে) তোমাদের

দিদিমার মাতৃবংশ এবং পিতৃবংশ—দুই-ই গুরুবংশ। দিদিমাকে দিয়া প্রথম কীভাবে দীক্ষা আরম্ভ হইল জান? কন্যাপীঠের মেয়েদিগকে ভোগরান্না করিতে হয়। অদীক্ষিত লোক দ্বারা এই রান্না করানো ঠিক নয় মনে করিয়া দিদি এবং পরমানন্দ পরামর্শ করিল যে দিদিমাকে দিয়া ইহাদিগকে দীক্ষিত করিতে হইবে। উহারা কিন্তু এ কথা আমাকে বলিতে সাহস পাইল না; কারণ আমি যদি মত না দেই তবে তো বড় মুশকিল হইবে। আবার আমি মত দিলেও নানা কথার সৃষ্টি হইতে পারে। যদি মত দেওয়া হয় তবে হয়তো লোকে বলিবে, 'ইনি নিজে দীক্ষা দেন না, কিন্তু নিজের মাকে দিয়া ওই কাজটি করাইয়া নেন।' আবার অমত করিলেও কথা হইতে পারে—'ইনি নিজেও দীক্ষা দিবেন না, আবার নিজের মাকেও দীক্ষা দিতে দিবেন না।' এই সব সমালোচনার সম্ভাবনা দেখিয়া পরমানন্দ বলিল, 'এই দীক্ষা ব্যাপারে মায়ের মতামতের দরকার নাই। আমরা যাহা ভাল মনে করিব তাহাই করিব।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা যাবতীয় আয়োজন করিয়া আমাকে আসিয়া বলিল, 'মা, তুমি উপরে চল।' আমি উপরে গেলে তাহারা কয়েকটি মেয়ে দেখাইয়া আমাকে বলিল, 'আজ দিদিমার নিকট হইতে ইহাদের দীক্ষা হইবে। দীক্ষার সময় তুমি এখানে উপস্থিত থাক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।' দীক্ষার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত দেখিয়াও আমি উহাদিগকে বলিলাম, 'তোমরা মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নাও যে উহারা দিদিমা হইতে দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক কিনা।' তাহাই করা হইয়াছিল। এইভাবেই তোমাদের দিদিমাকে দিয়া দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল।'

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া মা বলিলেন, 'এখন হাতমুখ ধোয়া যাক।' এইকথা শুনিয়া আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

কলিকাতায় দুর্গোৎসব

আজ অন্নকূট। সারাদিনই হৈ হট্টগোলের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে শ্রীশ্রীমা আমার খোঁজ করিয়াছেন। তখনই মায়ের ঘরে গেলাম। সেইখানে গোপীবাবু, শঙ্করানন্দ স্বামীজী, নারায়ণ স্বামীজী প্রভৃতি ছিলেন। মা গোপীবাবুর নিকট বোম্বাই এবং কলিকাতার গল্প করিতেছিলেন। মাকে বলিতে শুনিলাম, 'বোম্বাই গেলে ভাইয়া (অর্থাৎ বি. কে. শাহ) বলিল,

'মা, সাত দিন পরেই তো দিদিকে কলিকাতা নিতে হইবে, কিন্তু দিদির যে অবস্থা তাহাতে তাহাকে নিয়া যাই কেমন করিয়া? ইহার ব্যবস্থা তোমাকে করিতেই হইবে। দিদি যাহাতে একটু সুস্থ হইয়া এতদূর যাইতে পারে তাহা করিয়া দাও।' বাস্তবিক দিদি এত দুর্বল ছিল যে তাহাকে স্থানান্তরিত করা বিপদজনকই ছিল। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে দিদি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে দিদির এতটা উন্নতি হইতে পারে ইহা ডাক্তারেরাও আশা করে নাই। তাহারা এই উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

'তারপর দিদিকে লইয়া যখন কলিকাতা গেলাম তখন সেখানে দিদিকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ এরূপও বলিল, 'দিদির যে কোনও অসুখ হইয়াছিল তাহা তো দিদির চেহারা দেখিয়া মনেই হয় না। দিদি কলিকাতায় যে ক' দিন ছিল, ভালই ছিল। পরে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া আবার শরীর খারাপ হইয়াছে। দিদির দোষ হইল এই যে সে তাহার সাধ্যের অতীত পরিশ্রম করে। এইজন্য তাহার বায়ু উগ্র হইয়া বমি ইত্যাদি নানা উপসর্গ সৃষ্টি করে।

'তারপর কলিকাতার দুর্গাপূজার কথা—উহারা যখন পূজার স্থান ঠিক করিয়া এই শরীরকে জানাইয়াছিল তখন উহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে উহারা যেন জায়গাটা উঁচু করিয়া নেয়। আমার ওই কথা উহারা লক্ষ্য করে নাই। জমিটা ছিল নিচু জমি, বৃষ্টি হইলে জল জমিবার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য উহারা দুর্গামণ্ডপটি একটু উঁচু করিয়াছিল। কিন্তু প্যাণ্ডেলের স্থানটি যেমন তেমনই ছিল। শুধু কিছু আলগা মাটি উহার উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুর্গামণ্ডপের পাশে এই শরীরের জন্য ছোট একটি ঘর করিয়া রাখিয়াছিল এবং প্রস্রাব ইত্যাদির জন্য উহার সংলগ্ন কতকটা বাঁধানো জায়গাও ছিল।

'কলিকাতায় পৌঁছিলে এই শরীরকে যখন পূজার স্থান দেখাইতে নিয়া গেল তখন ওইখানকার ওইসব ব্যবস্থা দেখিয়া আমি কিছুটা অদলবদল করিয়া ফেলিলাম। এই শরীরের জন্য যে ঘরটি করিয়াছিল ওইখানে পূজার নৈবেদ্য ঘর তৈয়ার করিতে বলিলাম, আর বাঁধান জায়গাটা দেখাইয়া বলিলাম যে ভোগের চাল ডাল যাহা কিছু ধোয়া হইবে তাহা যেন ওইখানে করা হয়। যে

স্থানটি ভোগ রান্নার জন্য নির্দিষ্ট ছিল উহা ছিল আরও কদর্য। আমি উহারও পরিবর্তন করিয়া দিলাম। প্যাণ্ডেলটি বেশ বড় এবং সুন্দর করিয়া করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিল যে কলিকাতায় এতবড় এবং এরূপ সুন্দর আর একটি প্যাণ্ডেল আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু নীচের দিকে তাকাইয়া দেখি যে সমস্ত প্যাণ্ডেল ভরিয়া কেঁচোর মাটি। ওই মাটির নীচে বোধহয় লক্ষ লক্ষ কেঁচো ছিল। উহা দেখিয়া আমি পরমানন্দকে তৎক্ষণাৎ ইঁট আনিয়া মাটির উপর বিছাইয়া সেগুলিকে সিমেন্ট দিয়া Pointing করিয়া দিতে বলিলাম। তাহাই করা হইল।

'তারপর সপ্তমীর দিন কী বৃষ্টি! প্যাণ্ডেলের মধ্যে এক হাঁটু জল। সকলকে বালতি করিয়া এই জল সেচিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। অষ্টমীর দিন সকালের দিকে আমি শুইয়া আছি এমন সময় নির্মল কাঁদিতে কাঁদিতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। তাহার কী কান্না! সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাকে বলিতে লাগিল, 'মা, এই বৃষ্টি তোমাকে বন্ধ করিয়া দিতেই হইবে।' এই সময় শুইয়া শুইয়া আমারও খেয়াল হইতেছিল যে, যেন চিকচিক করিয়া রোদ উঠিয়াছে এবং এই শরীর ওই রোদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বাহিরে চাহিয়া দেখি সমস্ত আকাশ মেঘে অন্ধকার। যাহা হউক সকাল বেলা মুখ ধুইয়া যখন পূজার স্থানে গেলাম তখন দেখি যে সত্য সত্যই রোদ উঠিয়াছে এবং সেই যে রোদ উঠিল আর পূজার বাকি ক'দিন কোনও বৃষ্টিবাদল হয় নাই। আর মজাও এমন সপ্তমীর দিন ইহারা সারাদিন জলে ভিজিয়া যে পূজার কাজ করিল, এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া পূজা ও দেবী দর্শন করিল ইহাতে কাহারও কোনও অসুখ হইল না, এমনকী একটু সর্দিও না। তাই আমি উহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'দেখ, দেবী যে সাক্ষাৎভাবে তোমাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ হইল যে তোমরা জলে এত ভিজিয়াও অসুস্থ হইয়া পড় নাই বা এই জলের জন্য তোমাদের বা যাহারা প্রতিমা দেখিতে আসিয়াছিল তাহাদের কাহারও আনন্দের ব্যাঘাত হয় নাই। এই হইল কলিকাতার পূজার কথা।'

শ্যামনগরে দুর্গাপূজা

আমি। মা, শ্যামনগরের দুর্গাপূজার ব্যাপারটা কী?

মা। (হাসিয়া) ও, সেই কথা! তোমাদের বিনয়বাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) এক গুরু পুত্র আছে. সে শ্যামনগরে থাকে। সে নাকি একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে এ শরীর তাহাকে বলিতেছে, 'তুমি দুর্গাপূজা কর, আমি তোমার ওখানে যাইব।' অবশ্য ওই স্বপ্ন এবং পূজার সমস্ত ঘটনা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারিব না, কারণ আমি সকল কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। যতটুকু এই শরীরের কানে আসিয়াছে শুধু তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি। ওই স্বপ্ন দেখার পর সে প্রতিমা তৈয়ার করিতে ফরমাইস দিল। কারণ তাহাদের বংশে যে দুর্গাপ্রতিমা পূজা করা হইত তাঁহার নাকি একটু বিশেষত্ব ছিল—দেবীর দশহাত থাকিলেও তাঁহার দুইটি হাত পিছনের দিকে থাকিত। প্রতিমা তৈয়ার হইলে সে উহা আনিতে গিয়া যখন উহার দাম জিজ্ঞাসা করিল তখন তাহার নিকট দাম বাবদ ১২৫৲ দাবি করা হইল। ইহা শুনিয়া লোকটি তো হতভম্ব! সে দুঃখের সহিত বলিল 'আমার নিকট মাত্র ২৫৲ আছে এবং ইহার বেশি টাকা দিবার আমার সামর্থ্যও নাই।' যাহার প্রতিমা সে গুরুপুত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনি ২৫৲ দিয়াই এই প্রতিমা লইয়া যান। আগামী বৎসরও আমি আপনাকে প্রতিমা তৈয়ার করিয়া দিব।' সে উহা বিনামূল্যেই তৈয়ার করিয়া দিবে কিনা তাহা বলিতে পারিতেছি না। দোকান হইতে প্রতিমা বাড়ি লইয়া আসার পথেও নাকি কী কী ঘটনা ঘটিয়াছিল। সকল কথা, এ শরীর খেয়াল করিয়া শুনে নাই।

ষষ্ঠীর দিন আমাকে শ্যামনগরে লইয়া গিয়াছিল। বিনয়বাবু সঙ্গে ছিল। সেখানে গিয়া দেখি ছোট্ট একটি ঘরে প্রতিমা রাখা হইয়াছে। ঘরটিও আবার চট দিয়া ঘেরা। একটি ছেঁড়া সতরঞ্চি ভিন্ন বাড়িতে আসবাব বলিতে কিছুই ছিল না। তবুও দেবীর ঘর এবং উঠান ইত্যাদি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় যে প্রাণের দরদ দিয়া ইহারা যেন দেবীর কাজগুলি করিয়াছে। কোন কাজটি প্রাণের আবেগ হইতে করা হয় আর কোন কাজটি এমনি করা হয় তাহা কিন্তু কাজ দেখিয়াই বুঝা যায়।

'যাহা হউক, এই শরীর ওই বাড়িতে উপস্থিত হইলে ওই গুরুপুত্র আমাকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল। সে না পারে কথা বলিতে, না পারে কিছু

করিতে। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করিয়া এই শরীরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ওই সময়ের ভাবটারও একটু বিশেষত্ব ছিল। এই শরীরকে যে বসিতে দিবে এমন কিছুই তাহার নাই। বিনয়বাবা এই শরীরের বসিবার জন্য তাহার বাড়িতে একটি ছোট চৌকি ও আসন করিয়াছিল। এখানে আসিবার সময় সে উহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, কারণ সে তাহার গুরুপুত্রের আর্থিক অবস্থা জানিত। আমি ওই আসনে বসিলাম। ফিরিবার সময় দেখি যে বিনয়বাবা তাহার চৌকি এবং আসন লইয়া যাইতেছে। উহা দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, 'যখন একবার এগুলিকে বাড়ি হইতে আনিয়াছ তখন আবার ফিরাইয়া নিয়া যাইতেছ কেন? এ তো তোমারই গুরুপুত্র।' আমার কথা শুনিয়া সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'মা, চৌকিটি আমি রাখিয়া যাইতেছি, কিন্তু আসনটি সঙ্গে নিব।' তাহার মনের ভাবটা এই যে মায়ের দুইটি স্মৃতিচিহ্নই সে হাতছাড়া করিতে পারিবে না।

'ওইখান হইতে আসিবার সময় মোটরে বসিয়া খেয়াল হইল যে ইহার তো (অর্থাৎ গুরুপুত্রের) ছোট ছোট কতকগুলি ছেলেমেয়ে আছে, যদি এই সময় ইহাকে ৫০০্ দেওয়া যায় তবে সকলকে লইয়া সে একটু আনন্দ করিতে পারে। তখন আমি বেবীকে (রাহুল চ্যাটার্জীর স্ত্রীকে) বলিলাম, 'তোমরা তোমাদের পূজার ফান্ড হইতে ২০০্ আর এই শরীরকে উপলক্ষ করিয়া যে টাকা আসিবে তাহা হইতে ৩০০্ এই মোট ৫০০্ ইহাকে (অর্থাৎ গুরুপুত্রকে) দিয়া দিও।' আবার মজাও এমন ফিরিবার পথে তিনটি বাড়িতে অল্প সময়ের জন্য এই শরীরকে লইয়া গেল। সেখানে এক বাড়িতে ১০০্, অন্য এক বাড়িতে ১০১্ এবং আর এক বাড়িতে ৫০্ এই শরীরকে দিল। তখন তখনই ২৫১্ উঠিয়া গেল। এরূপটি কিন্তু বড় হয় না। কলিকাতা পৌঁছিতেই দিদি (খুকুনীদিদি) বলিল, কে যেন এই শরীরকে ৫০্ পাঠাইয়া দিয়াছে। কলিকাতা পৌঁছিতে পৌঁছিতেই ৩০০্ হইয়া গেল। আমি তখনই পরমানন্দকে ওই ৫০০্ গুরুপুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলাম। কিন্তু কাজের ভিড়ে পরমানন্দ আর উহা পাঠাইতে পারিল না।

'সপ্তমী কী অষ্টমীর দিন যখন এই শরীর জানিতে পারিল যে টাকা তখনও

পাঠানো হয় নাই তখন আমি উহাদিগকে বলিলাম, 'তোমরা এখনই ৫০০্ পাঠাইয়া দাও।' এই সময় বিনয়বাবা উপস্থিত ছিল। তাহার হাত দিয়াই টাকা পাঠানো হইল এবং তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে এই ৫০০্ হইতে আগামী বৎসরের পূজার জন্য ১০০্ রাখিয়া বাকি ৪০০্ যেন খরচ করা হয়। বিনয়বাবা যখন টাকা লইয়া গুরুপুত্রের বাড়িতে পৌঁছিল তখন সে জানিতে পারিল যে তখনই গুরুপুত্র লোক মারফৎ চিঠি দিয়া তাহাকে জানাইতে যাইতেছিল যে তাহার হাতে মাত্র ৩্ আছে; সে আর পূজা চালাইতে না পারিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাই হইল শ্যামনগরের পূজার গল্প।'

রাঁচিতে মা কালী প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ

মা আবার বলিতে লাগিলেন, 'কলিকাতা হইতে দেওঘর হইয়া যখন রাজগীরে গেলাম তখন প্রিয়রঞ্জন (ঘোষ) একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া রাঁচি হইতে রাজগীরে আসিল। তাহাকে কলিকাতা হইতে নিতাই পাল নাকি জানাইয়াছে যে যাহারা মূর্তি ঢালাইয়ের কাজ করে তাহারা নাকি বলিয়াছে যে তাহাদিগকে পূর্বে টাকা দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহারা ঢালাইয়ের জিনিসপত্র কিনিতে পারে নাই, কাজেই কালীমূর্তি তখন পর্যন্ত ঢালাই করা হয় নাই। এখন ঢালাই করিতেও তাহারা সম্মত নয়। দীপান্বিতার আর বেশি বাকি নাই কাজেই ওই সময়ের মধ্যে সে মূর্তি দিতে পারিবে না। প্রিয়রঞ্জনকে নাকি চিঠিতে এরূপও আভাস দেওয়া হইয়াছে যে কারিগরদিগকে যদি আরও কিছু টাকা স্বীকার করা যায় তবে হয়তো তাহারা কাজ করিতে রাজি হইবে।

'ওই কথা শুনিয়া তখনই কুসুমকে* কলিকাতা পাঠাইয়া দিলাম। উদ্দেশ্য, সে গিয়া জানিয়া আসুক যে মূর্তির কী অবস্থা। যদি মূর্তি তৈয়ার নাই হয় তবে আর রাঁচি যাইবার প্রয়োজন কী? মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আরও অনেকেরই তো রাঁচি যাইবার কথা আছে, তাহাদেরই বা সেখানে যাইবার প্রয়োজন কী? আরও একটা কথা যখন আসিতেছে তখন বলিয়াই ফেলি—কুসুম চলিয়া যাওয়ার পর এই শরীরের খেয়াল হইল যে উহারা তো (অর্থাৎ কারিগররা) আরও কিছু টাকা পাইলেই সময় মতো মূর্তি তৈয়ার করিয়া দিতে পারে,

---

* শ্রীকুসুম ব্রহ্মচারী—বর্তমানে স্বামী নির্বাণানন্দজী।

উহাদিগকে আরও ২০০্ দেওয়া হইবে। টাকা পাইয়া লোকের যেমন কার্যে উৎসাহ এবং আনন্দ হয়, টাকা না পাইয়াও যদি ওই উৎসাহ এবং আনন্দ উহাদের মধ্যে আসিয়া যায় তবে তো সময়মতো মূর্তি তৈয়ার হইতে পারে।

'যাক্ কলিকাতা হইতে কুসুম্ খবর নিয়া আসিল যে মূর্তি ঢালাই হইয়াছে। আবার মজাও এমন যে রাজগীরে থাকিতেই দেখিতে পাইলাম যে ওই কালীর এক উস্‌কখুস্‌ক মূর্তি রাজগীরে আসিয়া উপস্থিত, অর্থাৎ ঢালাই করিয়া পালিশ করিবার পূর্বে মূর্তি যেরূপ দেখায় রাজগীরের ওই কালীরও সেই মূর্তি ছিল। পরে যখন শিবের মূর্তি ঢালাই করা হইল তিনিও ওইভাবে রাজগীরে আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন। কালী এবং শিব আলাদা আলাদা ভাবে ঢালাই করিয়া পরে জোড়া দেওয়া হইয়াছিল। আবার পরে ওই মূর্তি যখন পালিশ করিয়া রং দেওয়া হইয়াছিল তখনও তাঁহারা ওইভাবে রাঁচিতে এই শরীরের কাছে প্রকাশ হইয়াছিলেন।

'কালীপূজার ২।৩ দিন পূর্বেই রাঁচি গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়াই এই শরীরের খেয়াল হইল যে আশ্রমের হলঘরে কালীবিগ্রহ স্থাপন করিলে তো চলিবে না কারণ ওই ঘরের ভিতর দিয়াই তো লোকজন যাতায়াত করিবে। তখন পরমানন্দকে বলিয়া ওই ঘরের মধ্যেই আর একটি ছোট ঘর করা হইল। পরমানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ওই ঘর তৈয়ার করিল। ঘরের দরজা জানলার কাজ শেষ হইবার পূর্বেই মা কালী আসিলেন। ওই দিন ছিল শনিবার। রবিবার দীপান্বিতা। এই শরীর উহাদিগকে বলিল যে অন্য এক ঘরে এখন কালীমূর্তি রাখা হউক, পূজার দিন উঁহাকে আসনে বসানো হইবে। এদিকে উহারা ভুল করিয়া শনিবারই সন্ধ্যাবেলায় মা কালীকে আসনে বসাইয়া বরণ ইত্যাদি করিয়া ফেলিল। তাই বাটু বলিয়াছিল, 'মা, রবিবার প্রতিষ্ঠার কথা থাকিলে কী হয়, উনি শনিবার-প্রদোষেই নিজ আসনে বসিয়া গিয়াছেন।

'ওই দিন রাত্রি ১২টার সময় হঠাৎ এই শরীরের খেয়াল হইল যে মা কালীকে একবার দেখিয়া আসি। গিয়া দেখি যে মা কালীকে উহারা যেভাবে রাখিয়াছে এবং কাঠের মিস্ত্রীরা বাহিরে বসিয়া যেভাবে কাজ করিতেছে তাহাতে

যদি দৈবাৎক্রমে কোনও কাঠ উহাদের হাত হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া মা কালীর উপরে পড়ে তবে মূর্তির বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। তাই আমি উহাদিগকে মা কালীর দরজার সম্মুখে একখানা কাপড় টাঙ্গাইয়া দিতে বলিলাম। তাহা ছাড়া মা কালীর মূর্তির উপরেও কিছু কিছু ধূলা পড়িয়াছিল। আমি উহা কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলাম।

হীরু। ওইভাবে মা কালীর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। মা এখন লকেটের কথাটা বল।

মা। (হাসিয়া) মা কালীমূর্তি দেখিয়া এ শরীরের খেয়াল হইয়াছিল যে মা কালীর হাতে তো রূপার বালা আছেই এখন গলায় যদি সোনার সরু হার হয় এবং উহাতে যদি একটি ছোট লকেট থাকে তবে বেশ হয়। উহারা মা কালীর জন্য যে হার করিয়াছিল উহা সরু নয়, চওড়া এবং উহাতে ফুল ইত্যাদি খোদাই করা ছিল এবং উহাতে একটা লকেটও ছিল। হারটি মা কালীর গায়ে সমানভাবে লাগিয়াছিল, কিন্তু লকেটটি গায়ে না লাগিয়া শূন্যে ঝুলিতেছিল। শুনিলাম ভাল সোনার গহনা রাঁচিতে নাকি তৈয়ারি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই শরীর যেরূপ হারের কথা উহাদিগকে বলিয়াছিল উহারা যখন উহার খোঁজে দোকানে গেল তখন দেখিতে পাইল যে মাত্র একটি দোকানে একটিমাত্র সরু হার আছে। উহাই তাহারা কিনিয়া আনিল। দেখিলাম আমার যেরূপ খেয়াল হইয়াছিল, হারটি ঠিক সেইরূপ।

'তারপর পূজার দিন কুসুম পূজা করিল, বাটু তন্ত্রধারের কাজ করিল। মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আমি কুসুমকে বলিয়াছিলাম, 'তুই যখন দেবীর বক্ষ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবি তখন মনে মনে এই ভাবটা রাখবি যে তোর মতো দেবীরও প্রাণের ক্রিয়া—শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে।' এই জাতীয় কী কী কথা কুসুমকে বলা হইয়াছিল। প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় কুসুম যখন দেবীকে স্পর্শ করিয়া চক্ষু বুজিয়া মন্ত্র পড়িতেছিল তখন ইহাদের কথায় এই শরীরকেও কুসুমকে স্পর্শ করিতে হইয়াছিল। তখন দেখিতে পাইলাম দেবীর রূপার হারের লকেটটি দুলিতেছে। ঘরে বাতাসের কোনও চিহ্নও ছিল না। কুসুমের আঙুলের ধাক্কা লাগিয়া যে লকেটটি দুলিবে সে সম্ভাবনাও নাই

কারণ কুসুমের আঙুল যেখানে ছিল সেখানে রূপার বা সোনার হার কিছুই ছিল না। আমি লকেটটি দুলিতে দেখিয়া বলিলাম, 'হারের লকেটটি দেখি দুলিতেছে।' কুসুম চাহিয়া যখন উহা দেখিল সেও যেন কেমন হইয়া গেল। বাটুও ওই লকেট দুলিতে দেখিয়াছিল। সে আমাকে পরে বলিয়াছিল, 'মা, আমার তো অবিশ্বাসী মন, আমি ভাবিয়াছিলাম যে দেবীর সোনার হারের সহিত বুঝি ওই রূপার হারের কোনও যোগ আছে। সেইজন্য অন্যের অসাক্ষাতে আমি গিয়া ওই সোনার হার স্পর্শ করিয়া দেখিলাম। দেখা গেল যে উহার সহিত রূপার লকেটের কোনওই সম্বন্ধ নাই এবং আমার স্পর্শের জন্য উহা দুলিলও না। তার উপর মা কালীর মূর্তির ওজন এত বেশি যে আঙুলের স্পর্শে উহা দুলিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

স্বামী শঙ্করানন্দ। এখন কথা হইল, মা কালীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় হারের লকেট যে দুলিয়া উঠিল উহা কি কুসুমের স্পর্শের জন্য, না তোমার স্পর্শের জন্য?

মা। ধর না কেন যে দুইজনের স্পর্শের জন্যই। (সকলের হাস্য)

মা কালী কীভাবে তাড়াহুড়া করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন তাহা তো তোমাদিগকে বলা হইল। নিতাই পালও বলিয়াছিল, 'মা, কীভাবে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে মূর্তিটি তৈয়ার হইল তাহা তো আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। মনে হয় শুধু ভগবানের কৃপাতেই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে।'

ইহার পর কারিগরদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইল এবং তাহারা উহা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে আমি আরও ২০০্ নিতাই পালকে দিতে বলিয়া বলিলাম এই টাকা সে যেন কারিগরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়।

আমি। মা কালী কি চলন্ত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে?

মা। হাঁ।

আমি। তাহা হইলে ইনি আবার ঢাকাতেও যাইতে পারেন?

মা। চলন্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য হইল এই যে ইহারা ইহাদের আশ্রমের পাশের জমিটা কিনিয়া ওইখানে মন্দির তৈয়ার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু জমির মালিক ইহাদের আগ্রহ দেখিয়া জমির দাম খুব চড়াইয়া

দিল। কাজেই ওই জমি আর কেনা হইল না। এখন মা ँকালী বসিয়া গেলেন। পরে যদি ওই জমি এবং মন্দির হয় তবে মা কালী গিয়া ওই মন্দিরেই বসিবেন।

'ভোলানাথের পূর্বপুরুষের আমল হইতেই ँকালীপূজা হইত। ঢাকাতে ওই ँকালীকেই দুইবার এই শরীরের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছিল। সে সময়ে মা কালীর সহিত মহাদেবের মূর্তি দেখা যায় নাই। কিন্তু ঢাকাতে যখন মূর্তি গড়িয়া ওই ँকালীর পূজা করা হইল তখন অবশ্য মা কালী শিব দুই-ই ছিলেন। রাঁচিতেও শিবের সহিতই মা কালী মূর্তি করা হইয়াছে। মা কালী নিজেই তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া নিয়াছেন। এই ভাবে নানা জায়গাতেই নানা বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু উহার কোনওটাই এই শরীর স্থাপন করে নাই। ঢাকার আশ্রমে ँঅন্নপূর্ণা মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল ভোলানাথ এবং সূক্ষ্মদেহধারী রমণার মহাপুরুষদের ইচ্ছায়। কলিকাতার আশ্রমে যে রাম-সীতা, মহাবীর প্রভৃতির বিগ্রহ আছেন উহার উপলক্ষ হইল মনোরঞ্জন (সরকার) বাবা। গোপাল গঙ্গাযাত্রা উপলক্ষ করিয়া কাশীর আশ্রমে আসিয়া নিজের সেবার ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইয়াছেন। যে সকল শালগ্রাম শিলা ওইখানে আছেন তাহাও এইভাবে আসিয়াছেন। বিভিন্ন আশ্রমে যে সকল বিগ্রহ আসিয়াছেন তাহা এই ভাবেই হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবস্থা নিজে নিজেই করিয়া নিয়াছেন। এই শরীর শুধু উপলক্ষ মাত্র।'

রাত্রি দশটা বাজিলে গোপীবাবু চলিয়া গেলেন। মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য আমরাও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

২৯শে কার্তিক, বুধবার (ইং ১৬।১১।৫৫)

আজ বেলা ১১ টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে ँপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসিয়াছেন। ওই সময় চিত্রা একটি গান গাহিয়া মাকে শুনাইতেছিল। তাহার গান শেষ হইলে শঙ্করানন্দ স্বামীজী হারমোনিয়ামটি গোবিন্দগোপাল বাবুর স্ত্রীর নিকট রাখিয়া তাঁহাকে একটি গান করিতে বলিলে তিনি ইঙ্গিতে স্বামীর অনুমতি লইয়া গাহিতে লাগিলেন—

'হর রমা আর কবে দেখা দিবি মা' ইত্যাদি। এই গান শেষ হইলে মা বলিলেন, 'এ শরীর যখন ঘোমটা দিয়া শা'বাগে থাকিত তখন হইতেই

প্রাণগোপালবাবা এই শরীরের কাছে আসিত। প্রথম আসে ননীবাবা, পরে সে-ই প্রাণগোপালবাবাকে নিয়া আসে। বাবা (অর্থাৎ প্রাণগোপালবাবু) প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যাবেলায় এই শরীরের কাছে আসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকিত। তখন কিন্তু সে এই শরীরের মুখ দেখিতে পায় নাই, কারণ এই শরীর লম্বা ঘোমটা দিয়া থাকিত। কথাবার্তা যখন হইত তখন কুণ্ডলী দিয়া কথা বলিত।

'একদিন রাত্রিতে প্রাণগোপালবাবা, ননীবাবা প্রভৃতিকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি গেলাম। এ শরীর মন্দিরে মা কালীর মূর্তির সম্মুখে বসিল আর প্রাণগোপালবাবা গিয়া একটি নিমগাছের নীচে বসিল। মন্দিরের নিকটেই ওই নিমগাছটি ছিল এবং উহার নীচটা বাঁধানো ছিল। তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের কিরণ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া বাবার উপর পড়িয়াছে। এই সময় বাবা তন্ময় হইয়া একা একাই এই গানটা গাহিতেছিল—'আর কবে দেখা দিবি মা।'

'প্রাণগোপালবাবাই এই শরীরের প্রথম ফটো তুলিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, 'মা, আমার গুরুদেবকে তোমার ফটো দেখাইব। তাই তোমার ফটো তুলিতে চাই।' তখন এ শরীর তাহাকে বলিয়াছিল; 'এখন তো ফটো তোলা হইবে না।' তখন সে বলিল, 'তবে কখন হইবে?' এই শরীর তাহাকে একটা দিন বলিল যাহা ওই সময় হইতে একমাস পরে। বাবার তখন চাকুরি শেষ হইয়াছে এবং ঢাকা ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া জিনিসপত্র সব বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই ফটোর জন্যই বাবা আরও একমাস ঢাকাতে থাকিয়া গেল। পরে এই শরীরের ফটো লইয়া সে চলিয়া গেল। ওই ফটোই এই শরীরের প্রথম ফটো। ইহার পূর্বেও বিদ্যাকূটে এ শরীরের ফটো তোলার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোনও ফটো উঠে নাই। বাবা যখন ফটো তুলিল তখন উহা দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'এ দেখি বুদ্ধদেবের ছবির মতো।' বুদ্ধদেবের নাম এই শরীর ওই প্রথম শুনিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় এ শরীরের সাধনার খেলাটা চলিতেছিল এবং যখন ফটো তোলা হয় সেই সময় এ শরীরের স্থিতিটা ছিল বুদ্ধদেবের স্থিতির মতো। সেইজন্য চেহারাটাও ওইরূপ দেখাইয়াছিল। কারণ সাধনের যে স্থিতিতে যাহা যাহা প্রকাশ হইবার তাহা তো হইবেই।

'একবার শা'বাগে এ শরীরের কাছে বাবা একটি গায়ক লইয়া আসিয়াছিল। ওই গায়ক যখন গান করিতেছিল সেই সময় এ শরীর হইতেও প্রণবধ্বনি উঠিতেছিল—ওই ধ্বনির উদয় ও লয় সবই তখন জোরে জোরে হইতেছিল। প্রাণগোপালবাবা উহা শুনিয়া ওইটা গ্রহণ করিয়া ফেলে। পরে যখন এ শরীর দেওঘরে গিয়াছিল তখন প্রাণগোপালবাবা এ শরীরকে নির্জনে লইয়া ওই প্রণব সাধন দেখাইয়াছে। ওই প্রণব উচ্চারণ কিন্তু মুখ না খুলিয়াও হইতে পারে।

'মা (অর্থাৎ গোবিন্দবাবুর স্ত্রী) যে গানটি করিল উহা উপলক্ষ করিয়াই প্রাণগোপালবাবা সম্বন্ধে এই কথাগুলি আসিয়া গেল।'

বেলা ১২টা বাজিলে আমরা সকলেই উঠিয়া পড়িলাম। আজ সন্ধ্যার পর মুক্তিবাবা রাজগীর হইতে কাশী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল শ্রীমান বিভু এবং কান্তিভাই। যেই সময়ে মুক্তিবাবা আশ্রমে পৌঁছাইলেন সেই সময়ে মায়ের ঘরে গোপীবাবু, শঙ্করানন্দ স্বামীজী, নারায়ণ স্বামীজী এবং আমি ছিলাম। মুক্তিবাবা রাজগীরে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না।

মুক্তিবাবা মায়ের ঘরে আসিয়া বসিলে মা কথায় কথায় বলিলেন, 'বাবা, তোমাকে রাজগীরে রাখিয়া যখন রাঁচিতে রওনা হই তখন মোটর গাড়িতে একটা কথা খেয়ালে আসিয়াছিল যে তোমাকে বলিব বলিয়া আর প্রকাশ করি নাই। কথাটা হইল এই যে রাজগীর ছাড়িবার সময় যদি দেখিতে পাইতাম যে তোমার শরীর ওইখানে শেষ হইবে তবে বলিয়া আসিতাম যে বাবা, তুমি যেখানেই দেহত্যাগ কর না কেন কাশীতে মরিলে যে গতি হয় সেই গতিই তুমি পাইয়া যাইবে। আরও একটা কথা—যাক এখন উহা নাই বলিলাম। ওইখানে তোমার দেহত্যাগ হইবে না বলিয়াই ওই কথা তখন তোমাকে বলা হয় নাই। তবে ওইখানে তোমার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে যে কোনও মুহূর্তেই শেষ হইয়া যাইতে পারিতে।

ব্রহ্মচারী বিভুকে জীবন দান

'বৃন্দাবনে বিভুরও এই দশা হইয়াছিল। তাহার অবস্থা যখন খুব খারাপ

তখন তাহাকে কুটিয়ার মধ্যে লইয়া যাইতে বলিলাম। তখন তাহার এমন অবস্থা নয় যে সে হাঁটিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে পারে। তাহাকে কুটিয়াতে লইয়া যাইবার জন্য একটা রিক্সা আনা হইল এবং কয়েকজন ধরাধরি করিয়া তাহাকে রিক্সায় বসাইয়া দিল। কিন্তু তখনই তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া নাড়ী ডুবিয়া গেল। এই শরীর তখন তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার মেরুদণ্ডটি স্পর্শ করিল এবং উহার উপর একটি আঙুল বুলাইয়া দিল। পরে বিভু বলিয়াছিল যে ওই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সে নিঃশ্বাস নিতে পারিয়াছিল। উহার পূর্বে তাহার মনে হইতেছিল যে সে দম বন্ধ হইয়া তখনই মারা যাইবে।'

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ৯।। টা বাজিলে গোপীবাবু চলিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মাও উঠিয়া পড়িলেন। মা বলিলেন, 'খাওয়ার ঘন্টা পড়িয়াছে। এ শরীর বসিয়া থাকিলে কেহই এ ঘর ছাড়িয়া যাইবে না, তাই উঠিয়া পড়িলাম।'

১লা অগ্রহায়ণ (ইং ১৭।১১।৫৫)

বেলা ৯টার সময় মা বিন্ধ্যাচলে গিয়া আবার পরদিন বিকালবেলা ফিরিয়া আসিলেন। ডা. দাশগুপ্ত বিন্ধ্যাচলে ছিলেন। মা তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম যে মা তাঁহাকে সঙ্কটমোচনের নিকট 'শিশু কল্যাণে' থাকিতে বলিয়াছেন।

শ্রীসীতারাম ওঁকারনাথজী প্রসঙ্গ

সন্ধ্যার পর মায়ের কাছে যাইবার জন্য আমার ডাক পড়িল। গোপীবাবু এবং নারায়ণ স্বামী ওইখানেই ছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গিয়া মায়ের ঘরে বসিলেন। গোপীবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুনিতে পাইলাম এবার দুর্গাপূজার সময় আপনার সহিত নাকি সীতারামদাস ওঁকারনাথবাবার দেখা হইয়াছিল?

মা। হাঁ, বাবা। দুইদিন তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। প্রথম দিন আসিয়া বাবা বলিল, 'তোর সহিত আমার গোপন কথা আছে।' তখন সকলকে সরাইয়া দিয়া তাহার কথা শুনিলাম। বাবা বলিল, 'আমি যখন ওঁকারনাথে ছিলাম

তখন তোর একখানা ফটোর জন্য খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ওইখানে কে আমাকে ওই ফটো দিবে? তবে একজনের কাছে 'মাতৃদর্শন' বইখানা পাইলাম। ওই পুস্তকে তোর নানা রকমের ছবি ছিল। আমি একদিন দুপুর বেলা শুইয়া শুইয়া ওই বই পড়িতেছি, তখন আমার তন্দ্রার মতো হইল এবং বইখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল। তন্দ্রার মধ্যে দেখিতে পাইলাম তুই এক ভীষণ মূর্তিতে খড়ম লইয়া আমাকে বলিতেছিস, 'তোকে আজ কাটিয়া ফেলিব।' আমি বলিলাম, 'আমাকে কাটবি কেন?' এই সময় আবার দেখিতে পাইলাম যে হঠাৎ তোর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। তুই স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে আমাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিস আর আমি তোর বামস্তন্য প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছি। ওই স্তন্য পান করিতে করিতে আমার মনে হইল যে তুই হলি রামকৃষ্ণ দেবের যোগেশ্বরী মা।* আমার ধারণা কি ঠিক নয়?' এই শরীর উত্তরে বলিল, 'বাবা, ভগবানের অনন্তরূপ। যা' কিছু দেখা যায় সবই তাঁহার রূপ; একমাত্র তিনিই বিভিন্ন রূপে খেলা করিতেছেন। যে যাহা মনে করে আমি তাহাই।' বাবার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে আমার কথা শুনিয়া বাবা সন্তুষ্ট হইল না। যদি বলিতাম, 'হাঁ, আমিই সেই যোগেশ্বরী মা' তবে বোধহয় বাবা সন্তুষ্ট হইত।

'তারপর আর একদিন রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বাবা এই শরীরের সহিত দেখা করিতে আসিল। সেই সময় তাঁহার সঙ্গে অনেক শিষ্য ছাড়াও নলিনী ব্রহ্ম এবং এক পণ্ডিত (মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদান্ততীর্থ) ছিল। এই পণ্ডিতকে নলিনী ব্রহ্ম খুব শ্রদ্ধা করে। সীতারামবাবা এবং পণ্ডিতের জন্য আলাদা আলাদা আসন পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সীতারামবাবা সে আসনে না বসিয়া বলিল, 'আমি তোর কাছে বসি?' আমি তাহাকে বসিতে বলিলে সে আমার কাছে বসিয়া বলিল, "আমি কথা বলিতে তোকে 'তুই' করিয়া বলি, তুই আমাকে 'তুই' করিয়া বলিস না কেন?" এই শরীর বলিল, "বাবা, তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে 'তুই' বলি? সীতারাম বাবা বলিল, 'হাঁ।' তখন এই শরীর বলিল, 'লোকে মাকে 'তুই' বলে আর বাবাকে 'তুমি' বলে। 'তুমি' বলাই তো ভাল।"

---

* ইঁহার অন্য নাম ভৈরবী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহার নিকট হইতে তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ করেন।

"তারপর বাবাকে বলিলাম, 'বাবা, তুমি এই শরীরকে গোপনে যাহা বলিয়াছিলে উহা এ শরীর কাহাকেও বলে নাই।" বাবার শিষ্যেরা অনেকেই বলিল যে তাহারা ওই কথা জানে। দেখিলাম ওই গোপন কথা শুধু এই শরীরের কাছেই গোপন। তখন আমি বাবাকে পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, 'বাবা, ভগবানের অনন্ত রূপ। নানারূপে একমাত্র তিনিই আছেন। এই শরীরকে তোমরা যে যাহা মনে কর, এ শরীর তাহাই।"

আমি। যোগেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় কি কোনও কথা বলিলেন না?

মা। না।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, রবিবার (ইং ২০।১১।৫৫)

সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে মা দিল্লি রওনা হইয়া গেলেন। সংযম সপ্তাহ শেষ হইলে মা বৃন্দাবন হইয়া ২৩শে অগ্রহায়ণ বেলা প্রায় ২টার সময় কাশী আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া অনেকক্ষণ বাহিরে বসিয়া সকলের সঙ্গে আলাপাদি করিলেন। কাহাকেও আশীর্বাদী মালা, কাহাকেও আশীর্বাদী ফুল এবং তুলসী পত্র দিলেন। মা এক ঘন্টা কাল বাহিরে থাকিয়া শেষে হাত মুখ ধুইতে ভিতরে গেলেন।

সন্ধ্যার পর মা নিজের ঘরে বসিয়া প্রায় ১।। ঘন্টা কাল গোপীবাবুর সহিত কথা বলিলেন। পরে মৌনের পূর্বে অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। মৌনের পর মা গোপীবাবু এবং আমাকে তাঁহার ঘরে যাইতে বলিলেন। আমরা মায়ের ঘরে গিয়া বসিলাম। শ্রীমান্ হীরুও সেখানে ছিল। পরে অবশ্য অনেকেই আসিয়া মায়ের ঘরে বসিল।

হীরু মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় এবং জ্বালা হয়। সেইজন্য আমরা আর দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করিয়া আগুনে হাত দেই না। পাপ করিলে আমাদের ওই রূপ জ্বালা হয় না কেন? জ্বালা হয় না বলিয়াই তো আমরা পুনঃ পুনঃ এক জাতীয় পাপ করিয়া যাইতে থাকি।

মা। তুই যে স্থিতিতে থাকিয়া ওই কথা বলিতেছিস ওই স্থিতিতে এই-ই কথা। সংসারে লোকে কর্ম করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। লোকে কামনা করিয়া কর্ম করে। কর্মের ফলে যখন কাম্য বস্তু লাভ হয় তখন সুখ হয়, যদি লাভ না

হয় তবে দুঃখ হয়। এইভাবে জাগতিক কামনা বাসনার পিছে ছুটিয়া, সুখ দুঃখ ভুগিয়া লোকে জন্ম-জন্মান্তরে ঘুরিয়া থাকে। ইহাই হইল জগতের দিক, আপেক্ষিক সুখের দিক, মৃত্যুর দিক। এই স্থিতিতে পাপ করিয়াও লোকের জ্বালাযন্ত্রণা হয় না। সেইজন্য লোকে বারবার পাপকার্য করিয়া থাকে। লোকে যখন জগতের দিকে না যাইয়া গুরুর উপদেশানুসারে ভগবানের দিকে চলিতে থাকে এবং ওই পথে চলিতে চলিতে যখন একবার তাঁহার পরশ পাইয়া যায় তখন জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মে। ইহাই হইল বৈরাগ্য। ভগবানে অনুরাগ আসিলেই বিষয়ে বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। তখন বিষয়ের সংস্পর্শে তাহার জ্বালা অনুভব হয়। এই অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষয়ের সঙ্গ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা হইয়া উহা ত্যাগ হইতেছে।

'আবার এমন অবস্থাও আছে যখন লোক ইচ্ছা করিয়াও আর বিষয়ের দিকে যাইতে পারে না। ওই সম্বন্ধে তাহারা যেন প্যারালিসিসের মতো হইয়া যায়। ইহাই প্রকৃত ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের অবস্থা।

'ইহার পরের অবস্থা হইল বিষয়ের উপর আধিপত্য লাভ অর্থাৎ বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও উহা আর সুখ দুঃখ দিতে পারে না অর্থাৎ বিষয় ছাড়িয়া ভগবানের দিকে চলিতে চলিতে একবার কাহারও যদি ভগবানে অনুরাগ আসিয়া যায় তবে তাহার ওই পথে চলার আগ্রহ বাড়িতে থাকে এবং সে নিত্য নূতন অনুভূতি লাভ করিয়া বদলাইতে থাকে। তখন তাহার ভিতর শান্তি এবং আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে, কারণ সে নিজেকে পাইয়া অগ্রসর হইতেছে কিনা? এই সময় বিষয় তাহার কাছে বিষ বলিয়া মনে হয় এবং উহা আপনা আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়। পরে জ্ঞানের প্রকাশ হইলে বিষয়টা যে প্রকৃতপক্ষে কী তাহাও বুঝা যায়। তখন বুঝা যায় যে যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এবং যাহা ধরা হইয়াছে উহা এক বস্তুই অর্থাৎ বিষয়রূপে একমাত্র ভগবানই। এই জ্ঞানের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বলিয়া কিছু থাকে না, কারণ সর্বরূপে যে একমাত্র তিনিই। ভগবানকে যে সাকার, সগুণ বলা হয় এই কথাগুলি কিন্তু খুব অর্থপূর্ণ। সাকার কী? কার হইল ক্রিয়া, স-কার অর্থাৎ ক্রিয়াহীন ক্রিয়ারূপে তিনিই। ইহা অজ্ঞান অবস্থার ক্রিয়া নয়। কারণ অজ্ঞান অবস্থার ক্রিয়ার মধ্যে দুই থাকে।

কিন্তু এখানে দুই নাই। সেইজন্য ইহাকে ক্রিয়াহীন ক্রিয়া বলা হইল অর্থাৎ ক্রিয়া রূপে তিনিই। সগুণ কী? না, স্বয়ংই গুণ অর্থাৎ গুণরূপে একমাত্র তিনিই।

'এই শরীর যখন বৌ সাজিয়া সংসার করিতেছিল, তখন তো ইহাকে ভোলানাথের ভাইকে পেঁয়াজ দিয়া তরকারি রাঁধিয়া দিতে হইত। তখন কিন্তু পেঁয়াজ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া এই শরীরের কিছুই হইত না, কিন্তু এই শরীরের উপর যখন সাধনার খেলা চলিতে লাগিল তখন প্রতিবেশী কোনও বাড়িতে পেঁয়াজ রান্না হইলে উহার গন্ধেই এই শরীরের বমি আরম্ভ হইয়া যাইত এবং এত বমির ভাব হইত যে উহার ফলে এ শরীর প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িত। ইহাই হইল ত্যাগের অবস্থা। ইহার পর আবার পেঁয়াজের গন্ধে বা স্পর্শে এ শরীরের কোনও বিকার হয় নাই। এই অবস্থায় ত্যাগ-অত্যাগের কোনও প্রশ্ন নাই।

রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে দেখিয়া গোপীবাবু উঠিলেন। আমি তাঁহাকে মোটর গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।

২৪শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার (ইং ১০।১২।৫৫)

আজ ১০।। টার সময় মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। প্রথমে কয়েকটি গান হইল। গান শেষ হইলে সান্যাল মহাশয় মাকে বলিলেন, 'মা, আমি একটা কথা বলিতে চাই।'

মা। তোমার কথা, তোমার প্রশ্ন, তোমার উত্তর, আবার তোমারই সন্তোষ।

সান্যাল মহাশয়। কথা হইল আমার দেহ তো জড়। জড়ের তো নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাকে চালাইতেছে চৈতন্যরূপী সত্তা। ওই চৈতন্য সত্তাই যে দেহে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি তাহাকে যেইভাবে দেখিতে চাই পাই না কেন?

মা। আমি দেখিতে চাই বলিয়া দেখিতে পাই না। বুঝিলে তো?

সান্যাল মহাশয়। না।

মা। তুমি বলিলে না যে 'আমি দেখিতে চাই?' যতদিন এই 'আমি' 'আমি' থাকে ততদিন তাঁহাকে দেখা যায় না। এই 'আমি' টা কী? না, অহঙ্কারের ক্রিয়া। যতক্ষণ এই অহঙ্কারের ক্রিয়ার মধ্যে থাকা যায় অর্থাৎ গণ্ডিবদ্ধভাবে

থাকা যায় ততক্ষণ নিজের স্বরূপ জানা যায় না। অহঙ্কারের ক্রিয়া হইতে যে সুখ দুঃখ পাওয়া যায় উহা আপেক্ষিক এবং অনিত্য। জাগতিক সুখ দুঃখগুলি এইরূপই। পুত্র জন্মিল সুখ হইল, আবার ওই পুত্র মরিয়া গেল দুঃখ হইল। এখানে সুখ দুঃখ পুত্রের অপেক্ষা রাখিয়াই হইতেছে। আবার এই সুখ দুঃখগুলি নিত্যও নয় জাগতিক কিনা, তাই এগুলি অনিত্যভাবে নিত্য। কাজেই এই স্থিতিতে থাকিয়া অর্থাৎ অহঙ্কারের ক্রিয়ার মধ্যে তুমি যে প্রশ্ন করিলে ওই জাতীয় প্রশ্ন আসাই এখানে স্বাভাবিক। কিন্তু যখন তুমি এই জাগতিক গতি অর্থাৎ মৃত্যুর দিকের গতি হইতে আধ্যাত্মিক দিকে অর্থাৎ অমৃতের দিকে চলিতে থাকিবে তখনও কিন্তু তোমার ওই প্রশ্ন থাকিবে সত্য, তবে তোমার ওই 'আমিটা' বদলাইতে থাকিবে। প্রশ্ন থাকিবে বলিতেছি কেন? প্রশ্ন না থাকিলে প্রকাশ হইবে কী? সেইজন্য পূর্ণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। তবে গুরুনির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে অহঙ্কারের ক্রিয়াটা বদলাইতে থাকে — 'আমিটা' বদলাইতে থাকে। এই চলার পথে, সাধনার পথে নিজকে নূতন নূতন ভাবে পাইতে পাইতে শেষে নিজ স্বরূপের প্রকাশ হয়। তখন বুঝা যায় আমি বা তিনি ছাড়া জগতে কিছুই নাই। তুমি প্রশ্ন উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই এই শরীর ইহার পুরা জবাব দিয়াছে। তুমি বলিয়াছিলে 'আমি একটা কথা বলিতে চাই।' তখন এ শরীর বলিয়াছিল, 'কথাও তোমার, জিজ্ঞাসাও তোমার, উত্তরও তোমার, সন্তোষও তোমার।' (সকলের হাস্য)

সূর্যগ্রহণের কথা

২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার (ইং ১১। ১২।৫৫)

বিকালে মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। আবার ২৭শে সন্ধ্যায় কাশী ফিরিয়া আসিলেন। '২৮ তারিখ সূর্য গ্রহণ ছিল। এইবার গ্রহণের স্থিতিকাল প্রায় ৩।। ঘন্টা। ওই সময় জপ, ধ্যান, কীর্তনাদি হইল। গায়ত্রী মন্ত্রে এক হাজার বার হোমও হইল। মায়ের সম্মুখে বসিয়া জপাদি করিতে করিতে কাহারও এই দীর্ঘ সময়ের জ্ঞান ছিল না। মা নিজেও বলিয়াছিলেন, 'এতটা সময় নাম করিতে কাহারও কষ্ট হয় নাই এবং আরও যদি কিছুক্ষণ এইভাবে চলিত তবে তাহাতেও কেহ আপত্তি করিত না।'

এইবার গ্রহণ লাগিয়াছিল বেলা ১১.৪৯মি: এ শেষ হইয়াছিল বিকাল ৩.২০ মিনিটে। কাজেই কথা হইয়াছিল যে গ্রহণের মধ্যে ঁঅন্নপূর্ণার ভোগ হইতে পারে কিনা এবং ঐ প্রসাদ সকলে গ্রহণ করিতে পারে কিনা। ওই সম্বন্ধে এইখানকার প্রসিদ্ধ স্মৃতির পণ্ডিত এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে দেবকার্যে গ্রহণের জন্য কোনও বিঘ্ন হয় না এবং ভোগও নষ্ট হয় না। তাই গ্রহণ লাগিবার পূর্বেই ঁঅন্নপূর্ণার ভোগ দিয়া ওই ভোগ মন্দিরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। গ্রহণ শেষ হইলে মা সকলকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিলেন এবং আমাদের সকলকে লইয়াই চত্বরে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। গ্রহণের এই দিনটা আমাদের বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল।

৩০শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার (ইং ১৬।১২।৫৫)

আজ বেলা প্রায় ৩টার সময় মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। গতকল্যই হরিবাবার নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল যে হরিবাবার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া তিন দিন যাবৎ বড় কষ্ট পাইতেছেন। আজ সকাল বেলায়ও যখন কীর্তনাদি হইতেছিল তখন মা বলিলেন, 'খেয়ালটা কেবল হরিবাবার দিকেই যাইতেছে।'

মৃত্যুর পূর্বে জ্ঞানানন্দ স্বামীজীকে দর্শনদান

বিন্ধ্যাচল রওনা হইবার পূর্বে আমরা যখন মাকে লইয়া তাঁহার ঘরে বসিয়াছিলাম তখনও মা বলিলেন, 'আজ কয়েকদিন যাবৎ হরিবাবা যেন কাছে কাছেই আছে।' এই সময়ে ডা. গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামীজীর কথা বলিলেন। তিনিও enlarged prostate রোগেই মারা যান। ডা. দাশগুপ্ত বলিলেন, 'স্বামীজীর যখন অসুখ তখন চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকা হইয়াছিল। আমি রোগ দেখিয়া বলিলাম যে অস্ত্রোপচার ভিন্ন ইহার আর কোনও চিকিৎসা নাই। আর আমি তো এইসব রোগী হাতে লই না। কিন্তু স্বামীজী আমাকে বলিলেন, 'বাবা, তুমি operation না করিলেও এই operation এর সময় আমার কাছে থাকিও।' আমি উহাতে সম্মত হইয়াছিলাম, operation এর দিন আমি উপস্থিত ছিলাম। উহার দুই দিন পর একদিন সন্ধ্যায় আমি স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। স্বামীজী আমার

মাথাটা তাঁহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে।' আমি বলিলাম, বলুন, আপনার কী দরকার।' স্বামীজী বলিলেন, 'আমাকে একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিতে হইবে।' আমি বলিলাম, 'এ আর বেশি কী? আমি মাকে আপনার কাছে লইয়া আসিব।' দেখিলাম ওইদিন রাত্রিতেই মাকে লইয়া আসিতে হইবে। তাহা না হইলে স্বামীজীর যে অবস্থা তাহাতে মায়ের সঙ্গে দেখা নাও হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি তখনই মায়ের আশ্রমে চলিয়া আসিলাম। আসিয়া শুনি মা কোথায় যেন বাহির হইয়া গিয়াছেন। মাকে না পাইয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম কিছুক্ষণ পর আবার আসিয়া মাকে লইয়া যাইব। এই ভাবিয়া বাসায় চলিয়া গেলাম। এমন সময় ফোন আসিল যে স্বামীজী আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তখনই আবার স্বামীজীর কাছে চলিয়া গেলাম। আমি যাওয়ামাত্রই তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার মাথাটা তাঁহার বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন, 'তোমার জন্যই মা আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে।' শুনিয়া তো আমি অবাক। পরে মাকে আসিয়া বলিলাম, 'তুমি যখন স্বামীজীকে দেখিতেই গেলে তখন ইহার জন্য আমাকে কৃতিত্ব লইতে দিলে না কেন?' (সকলের হাস্য)

আমি। মা, তুমি তো ডাক্তারবাবুর কাছে খবর না পাইয়াই দেখা করিতে গিয়াছিলে?

মা। হাঁ, তাহা ছাড়া এই শরীরের একটা খেয়ালও হইয়াছিল যে এ শরীর বাবাকে দেখিবার পূর্বে সে যেন দেহত্যাগ না করে।

পরে মার কাছে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে ডাক্তারবাবু যেইদিন মাকে খুঁজিতে গিয়াছিলেন সেইদিন মা বিন্ধ্যাচলে ছিলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিবার পথেই মা স্বামীজীর সহিত দেখা করিয়া আসেন।

বিন্ধ্যাচলে মাতৃসঙ্গ

২১শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬২ সন (ইং ৬।১।৫৬)

গতকাল এলাহাবাদ হইতে ফোন আসিল যে মা ওই দিনই বিন্ধ্যাচল যাইতেছেন, আমি যেন আগামীকল্য গোপীবাবুকে লইয়া বিন্ধ্যাচলে যাই। সেই

অনুসারে আজ বেলা প্রায় ১০।।টার সময় আমরা কাশী হইতে ময়ের মোটরে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১২ টার সময় বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পৌঁছাইলাম। মা তখন আহারে বসিয়াছিলেন। আহারান্তে মা বাহিরে আসিলে আমরা মাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। মা আমাকে একটি আশীর্বাদী মালা দিলেন এবং গোপীবাবুকে কয়েকটি ফুল দিলেন। ইহার পর আমরাও আহারের জন্য চলিয়া আসিলাম।

শ্রীহরিবাবার রোগ এবং চিকিৎসার বিবরণ

দুপুরে আহারের পর আমরা মার কাছে গিয়া বসিলাম। আজ দুপুরে মার আর বিশ্রাম হইল না। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় পাঁচটা বাজাইয়া দিলেন। প্রথমত হরিবাবার কথা উঠিল। মা বলিলেন, 'কাশী হইতে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়াই হরিবাবার ওইখান হইতে এক পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা ছিল বাবা নাকি প্রস্রাবের যন্ত্রণায় ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে এবং তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। চিঠি পাইয়াই মোটরে এলাহাবাদে আসিয়া দিল্লির গাড়ি ধরিলাম। দিল্লি পৌঁছিয়া খোঁজ লওয়া হইল যে হরিবাবা কোথায় আছেন; কিন্তু কেহই সঠিক খবর দিতে পারিল না। রাত্রি ৯টার গাড়িতে হোসিয়ারপুর যাওয়া ঠিক হইল। ইতিমধ্যে একজন আসিয়া বলিয়া গেল যে হরিবাবাকে অমৃতসর লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমরা রাত্রি ৯টার গাড়িতে রওনা হইয়া ভোরবেলা জলন্ধরে পৌঁছিলাম। সেখানে লছমনজী প্রভৃতি আমাদিগকে তাহাদের আশ্রমে লইয়া গেল। এই শরীরের সঙ্গে ছিল পরমানন্দ, নারায়ণ দাস, গোপালের মা এবং কৃপাল। গোপালের মা এবং কৃপালকে ওইখানে রাখিয়া আমরা মোটরে অমৃতসর রওনা হইলাম। গোপালের মাকে রান্না করিতে বলিয়া গেলাম। আমরা একটু দুধ সুজি খাইয়া রওনা হইলাম।

অমৃতসরে পৌঁছিয়া একেবারে হাসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কি বাবা বসিয়া আছে। ডাক্তারেরা বলিতেছে যে ওইদিনই বাবার operation করিবে; কিন্তু বাবা operation করিতে নারাজ। বাবা হোসিয়ারপুর ফিরিয়া যাইতেই মনস্থ করিয়াছে। এ শরীর পরমানন্দ এবং নারায়ণ দাসকে পথে শিখাইয়া নিয়া গিয়াছিল যে তাহারা যেন বাবাকে দিল্লি যাইবার জন্য

পীড়াপীড়ি করে। যাহা হউক, বাবার হোসিয়ারপুর ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প দেখিয়া এই শরীর তাহাকে বলিল, 'বাবা, আমি তোমাকে নিতে আসিয়াছি।' পরমানন্দ এবং নারায়ণ দাসও এই সময় বাবাকে দিল্লি যাওয়ার কথা বলিতে লাগিল। বাবা operation করিতে ভয় পায় দেখিয়া এ শরীর বলিল, 'বাবা, দিল্লিতে বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, বড় কবিরাজ ইত্যাদি সবই আছে। সেখানে বাবা যে জাতীয় চিকিৎসা করিতে চায় তাহাই চলিতে পারিবে।' দেখিলাম যে বাবা দিল্লি আসিতে রাজি হইয়া গেল। কীভাবে যাওয়া হইবে তাহা বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে বাবা উড়োজাহাজের কথা বলিল। তখনই এরোপ্লেন স্টেশনে ফোন করা হইল। উহারা জানাইল যে, যে প্লেন দিল্লি যাইবে উহাতে মাত্র একটি সিট্ খালি আছে। কিন্তু বাবার ইচ্ছা যে এ শরীরও তাহার সঙ্গে যায়। পরে দেখা গেল যে কাশ্মীর হইতে যে প্লেনখানা দিল্লির পথে অমৃতসরে নামিল উহার চারিটি যাত্রীই অমৃতসরে নামিয়া গেল। কাজেই ওই প্লেনে পাঁচটি সিট খালি পাওয়া গেল। আমরা যাত্রীও ছিলাম পাঁচজন। বিকালে প্লেনে চড়িয়া আমরা ১।। ঘন্টার মধ্যেই দিল্লি পৌঁছিলাম।

এদিকে দিল্লিতে ফোন করিয়া ডা. জে. কে. সেনের বাড়িতে এই শরীরের জন্য যে দুইখানা ঘর ছিল এবং যাহাতে তখন দিদি ছিল, সেই ঘর দুইটি হরিবাবার জন্য পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম। তাহাই করা হইয়াছিল। হরিবাবা দিল্লিতে পৌঁছিলে ওইদিন রাত্রিতেই ওইখানকার বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দেখান হইল। সে ঔষধ দিয়া বলিল যে পরদিন সকাল বেলার মধ্যে যদি স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাব না হইয়া যায় তবে operation করাই ভাল। উহা ভিন্ন এ রোগ একেবারে যাইবে না। এদিকে এ শরীর সন্তোষকে* খবর দিল। সে কাজে এত ব্যস্ত যে তাহার সঙ্গে দেখা করা এক বিষম ব্যাপার। যাহা হউক এই শরীরের ওই সংবাদ পাইয়া সে সন্ধ্যাবেলা দেখা করিতে আসিল। তাহাকে বাবার অবস্থার বিষয় বলিয়া তাহাকে বাবার কাছে লইয়া গেলাম। সে একটু পরীক্ষা করিয়া বলিল যে operation করিতে হইবে। বাবাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল, 'এ জাতীয় operation আমি প্রায় তিন হাজার রোগীর করিয়াছি,

---

* ডা. জে. কে. সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ সার্জন ডা. সন্তোষ সেন।

সকলেই ভাল হইয়াছে। ইহাতে ভয়ের কিছুই নাই। operation করিতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগিবে না এবং তিনদিনের মধ্যে আপনি ভাল হইয়া যাইবেন।' হাসপাতাল বলিয়া বাবা একটু আপত্তি করিলে সে বলিল, 'বাবা, মহাত্মারা যেখানে যান না কেন সেখানেই তাঁহারা স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারেন।' সন্তোষের কথা শুনিয়া বাবা বলিল, 'ভাই, আমার এত শক্তি নাই।' কথাগুলি বাবা এমন সরল ভাবে বলিল যে উহা শুনিয়া যোগীভাইয়েরও চোখে জল আসিল। যোগীভাই তখন আমাদের সঙ্গেই ছিল। বাবার আরও আপত্তি যে হাসপাতালে স্ত্রীলোকের সেবা গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে সন্তোষ বলিল, 'বাবা, Nurseরা স্ত্রীলোক কোথায়? তাহারা তো দেবী। তবে আমার ওখানে পুরুষ নার্সের ব্যবস্থা আছে।' সন্তোষের Nursing Home এ যাওয়াই স্থির হইল এবং ওই দিনই বাবাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। Operation করিবার পূর্বে তিনদিন বাবাকে এমনি রাখা হইল। ওই সময় রক্ত পরীক্ষা এবং শরীরে রক্ত দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে বাবার ভক্তদের ইচ্ছানুসারে কবিরাজি ঔষধও খাওয়ানো হইল। উহাতে সন্তোষ কোনও আপত্তি করিল না। তিনদিন পর operation করা হইল। যেদিন operation হয় সেদিন এই শরীর জপের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং operation এর পূর্বে বাবার সহিত দেখাও করিয়াছিল। এখানে আসার পূর্বে বাবাকে ভালই দেখিয়া আসিয়াছি। এখন চেয়ারে বসিয়া কথাবার্তা বলে।"

শ্রীহরিবাবার রোগের কারণ

মা আবার বলিতে লাগিলেন, "সংযম সপ্তাহের সময় হরিবাবাকে দিল্লিতে থাকিবার জন্য কত লোক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বাবা হোসিয়ারপুরে কীর্তন-হল তৈয়ার করিবে বলিয়া চলিয়া আসিল। অসুখের পর হইতেই বাবা বলিয়াছিল যে সংযম সপ্তাহে না থাকার ফলেই তাহার এই অসুখ হইয়াছে। এ শরীরের সহিত দেখা হইলেও সে বলিয়াছিল, 'মা, সংযম সপ্তাহের সময় তোমার কথা লঙ্ঘন করিয়া যে পাপ করিয়াছি উহার জন্যই আমাকে এই ফল ভোগ করিতে হইতেছে।' উহা শুনিয়া এই শরীর বাবাকে বলিয়াছিল, 'বাবা, এমন কথা বলিতে নাই।' বাবা এ শরীরের কথা শুনিয়াই বুঝিল যে ওই কথা বলা

উচিত নয়। কারণ উহাতে দোষারোপ করিবার ভাব আছে। কথা শুনা হয় নাই তাই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। তাই বাবা বলিল, 'হাঁ, হাঁ ওইরূপ কথা বলাও পাপ।' কিন্তু বলিলে কী হইবে? পরেও বাবাকে ওই জাতীয় কথা বলিতে শুনা গিয়াছে।"

এইসব কথা শুনিয়া গোপীবাবু বলিলেন, 'অবশ্য ভগবান সম্বন্ধে প্রতিশোধ, শাস্তি ইত্যাদি কথা বলা চলে না। তবে প্রকৃতির রাজ্যে ওইগুলি আছে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয়।' মা গোপীবাবুর কথা কতকটা মানিয়া লইয়া বলিলেন, 'হাঁ, তাহাও হয়। তবে খেয়ালটা যদি এরূপ থাকে যে কেহ কথা না শুনিলেও তাহার কোনও ফল ভোগ করিতে হইবে না, তবে অবশ্য কিছুই হয় না। তবে একজনকে ঘিরিয়া আরও দশজন তো আছে। তাহারা নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া তাহাদের ক্রিয়া করিতেই থাকে।'

গোপীবাবু বলিলেন, 'আমি তো সেই কথাই বলিতেছি। নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়াই যাইবে। তাহাদের ক্ষমা করিবার অধিকার নাই। ক্ষমা করিবার অধিকারী একমাত্র ভগবানই।' গোপীবাবুর কথা শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'বাবাকে দিল্লিতে রাখিবার জন্য সকলেই কত অনুনয় করিয়াছে। বাবা না থাকাতে ইহাদের মনে তো আঘাত লাগিয়াছেই। স্বতন্ত্রানন্দ স্বামী এমন কথাও বলিয়াছিল যে বাবা যেন সংযম সপ্তাহ আরম্ভ করাইয়া দিয়াই চলিয়া যান। বাবাকে রাখিবার জন্য সে আরও অনেক কথা বলিয়াছিল। ইহাতে অবধূতজী হরিবাবার পক্ষ লইয়া তাহার সহিত বাদানুবাদ করে। স্বতন্ত্রানন্দ যদি নিজ হইতে থামিয়া না যাইত তবে পরিণামে যে কী দাঁড়াইত তাহা কে জানে?'

খুকুনী দিদি 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' প্রথম ভাগে উল্লেখ করিয়াছেন যে একদিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে ফুল দেওয়াতে মায়ের অবস্থা হঠাৎ আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল,—মায়ের সমস্ত শরীর নীলবর্ণ এবং শ্বাসের গতি পবির্তন হইয়া এমন দেখাইতেছিল যে মা যেন তখনই দেহ ছাড়িয়া যাইতেছেন এবং তিনি মুখেও বলিয়াছিলেন, 'আমি যাই, আমাকে পূজা করিয়াছে।'

ওই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ডা. পান্নালালজী মাকে প্রশ্ন করিলেন, 'মা, আপনার

ওইরূপ হইয়াছিল কেন?' মা উত্তরে বলিলেন, "ওই সময় সাধনার খেলা চলিতেছিল তো? সাধনার সময় সাধকের এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে সাধনার কোনও অনুভূতিই প্রকাশ করিতে চায় না। সে তখন মনে করে যে ওইগুলি প্রকাশ হইয়া পড়ার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। কাহারও পায়ে ফুল দেওয়ার অর্থই হইল যে তাহার ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহাকে দেবী জ্ঞান করা। এই শরীর তখন সাধক সাজিয়াছিল কিনা তাই সাধকের যাহা যাহা হইয়া থাকে তাহা তো প্রকাশ হওয়া চাই, তাই তখন ভাবটা এই ছিল যে কোনওরূপ ঐশ্বর্য যেন প্রকাশ না হয়। এরূপ প্রকাশ হওয়া যেন কত গর্হিত কার্য। এর চেয়ে যেন মরণই ভাল। তাই এই শরীরের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, 'তবে আমি যাই।' বাস্তবিক তখন শরীরের যে অবস্থা হইয়াছিল তখন যদি চলিয়া যাইবার খেয়ালটা পাকা হইত তবে দেহপাতের সম্ভাবনা ছিল। আবার এই শরীরের এমনও হইয়াছে যে কেহ ফুল ইত্যাদি এই শরীরকে দিলে শরীর তৎক্ষণাৎ এলাইয়া পড়িয়াছে। আবার অনেক সময় ওইরূপ করিলে শরীরে ইলেকট্রিক শকের মতোও লাগে নাই বা এ শরীর এলাইয়া পড়ে নাই, কিন্তু ইহার জাগতিক ব্যবহার বন্ধ হইয়া ইহা কাঠ পাথরের মতো বসিয়া রহিয়াছে অথবা শুইয়া পড়িয়াছে। ওই অবস্থায় উহারা এই শরীরকে পূজা করিয়াছে, এমনকী অনেক সময় ফুল পাতা দিয়া এ শরীরকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং এই শরীর ঘন্টার পর ঘন্টা ওই ফুলপাতার নীচেই কাটাইয়া দিয়াছে। যদিও তিন রকম অবস্থার কথা বলা হইল—যেমন ইলেকট্রিক শক্ লাগা, এলাইয়া পড়া, জাগতিক ব্যবহার বন্ধ হইয়া কাঠ পাথরের মতো হইয়া যাওয়া—কিন্তু এই অবস্থাগুলিও অনেক রকমের হয়। সব কিছুই অনন্ত কিনা।"

মায়ের সাধনার খেলার সময়কার নানা কথা

পূর্ব কথার সূত্র ধরিয়া মা তাঁহার সাধনার খেলার সময়ের নানা অবস্থার কথা বলিলেন। মা বলিলেন, 'বাজিতপুরেই একদিন বিশ্বে যাহা কিছু আছে, হইতেছে, হইবে, ছিল, ছিল না—এ সব কিছুই প্রকাশ হইয়া গেল।'

গোপীবাবু। কীভাবে প্রকাশ হইল?—নিজ হইতে আলাদা ভাবে না অন্য কোনও ভাবে?

মা। (হাসিয়া) প্রথমে আলাদাভাবে পরে নিজেরই অন্তর্গত হইয়া। (অর্থাৎ মা নিজেই যে বিশ্বময় এবং বিশ্বাতীত ওইভাবে) বাজিতপুরে সাঁকোর উপর বসিয়া যে খেয়ালটা হইয়াছিল তাহাও হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ঘোমটা দেওয়া কুলবধূরূপেও প্রশ্নোত্তর এবং তত্ত্বকথার প্রকাশ।

আমি। ওই সাঁকোর উপর বসিয়া আরও একটি খেয়াল হইয়াছিল—তাহা হইল সাধক কীভাবে ভগবান লাভের চেষ্টা করে তাহা দেখিতে হইবে।

মা। না, ওই খেয়ালটা তখন হয় নাই। উহা অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। তবে তোমাকে ওইকথা বলার সময় পূর্বে যে প্রকাশটির কথা বলা হইল (অর্থাৎ নিজেই বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বাতীত) ওই কথাটি না বলিয়া সাধনার খেয়ালের কথা বলা হইয়াছিল। অনেক সময় এইরূপ হয় কিনা। কথা বলিতে গিয়া এক একটি কথা প্রকাশ হয় না। ওই সময় তাহাই হইয়াছিল। তবে তোমাকে যাহা বলা হইয়াছিল উহাও মিথ্যা নয় কারণ সাধনার খেয়ালের সূত্র ধরিয়াই তো ওই প্রকাশটা হইয়াছিল।

কখন মায়ের সাধনার খেলা আরম্ভ হইল এবং কখন শেষ হইল যদিও মা উহা বলিলেন না তথাপি মনে হয় যে যখন সাধনার খেয়ালটা আসিয়াছিল তখন হরিনাম করিয়াই সাধনা আরম্ভ হয়। কারণ হরি সম্বন্ধে মা দাদামহাশয়কে প্রশ্ন করিলে দাদা মহাশয় নানা কথার মধ্যে মাকে বলিয়াছিলেন, 'তুই হরিকে ডাকিয়া দেখ্ না।' তখন মা 'আচ্ছা' বলিয়া পরে যে সাধনা করিবেন তাহার সূত্রপাত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কীর্তন শুনিলে ছোট বেলায় যে সমাধির মতো অবস্থা হইত উহা সাধনার খেলার অন্তর্গত নয়। মা বলিলেন, 'এই যে হরিনাম বা কীর্তন শুনিয়া এলাইয়া পড়া এগুলি সাধনার খেলার অবস্থার কথা নয়। কেননা তখন খেয়াল অনুসারেই হরিনাম বা কীর্তন শুনিয়াছি এবং উহা ঠিকভাবে শুনিলে যাহা হয় তাহা শরীরে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।'

আমি। আমার মনে হয় যে তোমার সাধনার খেলাটাও এই জাতীয়। কারণ অজ্ঞান দূর করিবার জন্য তো তোমার সাধনা নয়। অজ্ঞান দ্বারা তো তুমি কোনও কালেই আচ্ছন্ন নয়।

মা। (হাসিয়া) তাহাও বলিতে পার। এমনও প্রকাশ আছে যখন বোধ হয়

যে 'আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমার অজ্ঞান কোনওকালে ছিল না বা নাই।' আবার অজ্ঞানটা যে কী তাহাও প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। কারণ অজ্ঞানও তিনি তো। তৎরূপে সমস্ত প্রকাশ তাঁহারই। তবে একটা কথা মনে রাখিও—যদি কোনও অবস্থা বা স্থিতি হইতে ওই জাতীয় কোনও ক্রিয়া হয় তবে কিন্তু উহা অন্য রূপ হইবে। ওইখানে বাসনার আঁশ থাকিয়া যাওয়ার কথা আসিয়া পড়িল। এ শরীরের সাধনার খেলাটা সম্পূর্ণ আলাদা।

'(গোপীবাবুকে) সেদিন কথা হইতেছিল না যে এক মহাপুরুষ সম্বন্ধেই নানা জনে নানা কথা বলে। কেহ যদি কোনও স্থিতি বা অবস্থায় থাকিয়া কিছু বলে তবে ওইরূপ হয়। যতক্ষণ সবটার সর্বাঙ্গীন প্রকাশ না হয় ততক্ষণ এইরূপই হইবে। সকল পথই যে আমার পথ এবং আমার পথই যে সকলের পথ—ইহা যতক্ষণ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ কিছুই হইল না। এই শরীরের বেলায়ও দেখা গিয়াছে যে কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি বিভিন্ন নাম এবং পথ থাকা সত্ত্বেও তৎরূপে সেই একেরই প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। ইহার কোনওটাই কোনওটার বাধক হয় নাই।'

রাত্রিবেলায়ও আবার ওই সাধনার খেলার কথা উঠিল। মা বলিলেন, 'কেহ যদি সাধন করিয়া একবার পূর্ণতা লাভ করে তবে তাহারও ওইরূপ খেলা হইতে পারে; কারণ তখন তাহার খেলা তো নিজেকে লইয়া নিজেই।'

আমি। তোমার জীবনের একটা অংশকে যে সাধনার খেলার সময় বলিয়া ভাগ করা হয় উহার কোনও অর্থই নাই। কারণ তোমার ওই খেলার আরম্ভও নাই শেষও নাই। তোমার জীবনধারণটাই একটা খেলা বলিয়া মনে হয়।

মা। (হাসিয়া) তুমি ওই ভাবেও নিতে পার। তোমরা এই শরীর লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলিতেছ কিনা তাই সব কথা আসিতেছে না। তবে যদি খেয়াল হয় তবে সকলই বলা হইয়া যাইতে পারে। সাধনার খেলা বলিয়া যাহা বলা হয় উহা হইল জীবজগতের ব্যাপার। জীব কীভাবে নিজকে লাভ করিতে পারে উহাই ওই খেলার সময় ধারাবাহিকভাবে হইয়া গিয়াছিল।

গোপীবাবু। জীবের ভগবান লাভের ধারাও ভিন্ন ভিন্ন। জীব যেমন অনন্ত সেইরূপ তাহাদের সাধনার ধারাও অনন্ত।

মা। হাঁ। তাই অনেকে বলে যে অনন্ত সাধনার প্রকাশ ব্যক্তি বিশেষের নিকট হয় কীরূপে? তবে একটা কথা—যুগযুগান্তের ব্যাপারও কিন্তু একটা মুহূর্তে হইয়া যাইতে পারে। কারণ সময়ের তো কোনও নির্দিষ্ট পরিমাপ নাই।

গোপীবাবু। ইহা তো সাধারণ কথা এবং খুবই সত্য।

মা। আবার দেখ, সমুদ্র বা নদীতে যে তরঙ্গ উঠে ওইগুলি আকারে প্রকারে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা হয়। জীব যেমন অনন্ত এবং পৃথক পৃথক ওই তরঙ্গগুলিকেও সেইভাবে ধরিতে পার। কিন্তু যদি জলের দিকে লক্ষ্য করা হয় তবে ওই তরঙ্গগুলি জলেরই। জল ছাড়া তো তরঙ্গ হয় না। তরঙ্গগুলি একে অন্যকে না জানিতে পারিলেও জল তো জানে যে ওইগুলি তাহারই তরঙ্গ। কারণ তরঙ্গের যত আকার প্রকার যাহা কিছু আছে উহা তো জল ভিন্ন কিছুই নয়। কাজেই জলের নিকট উহা আলাদা নয়। সেইরূপ জগতে যত বৈচিত্র্য আছে, সাধনার যত কিছু ধারা আছে তাহা সেই এককে অবলম্বন করিয়াই। সেই এককে পাইলেই সকলই সমষ্টিভাবে পাওয়া হইয়া গেল। সাধারণ দৃষ্টিতে তোমরা কাহাকেও পুরুষ বল এবং কাহাকেও স্ত্রী বল; কিন্তু ওইগুলি তো শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে। মূলে তো সেই একই। যা কিছু বিশ্বে দেখিতে পাওয়া যায় উহা একেরই ক্রিয়া। কাজেই এককে পাওয়ার অর্থই হইল সকলকে পাওয়া। অনেক সময় বলা হয় না যে 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি', কিন্তু উহাও তো একটা অবস্থা। ইহা তো পূর্ণতা নয়। ইহা একের জ্ঞান মাত্র, অনন্তের জ্ঞান নয়। কিন্তু তৎরূপে যখন সমস্তই প্রকাশ হইয়া যায় তখনই জ্ঞানের পূর্ণতা হয়।

গোপীবাবু। আচ্ছা, অপ্রাপ্তির ব্যথা যাহা সাধকের মধ্যে দেখা যায় সেগুলি কি আপনার সাধনার খেলার সময় হইয়াছিল?

মা। (হাসিয়া) হাঁ। কারণ অভিনয় করিতে গিয়া যে, যে অংশ গ্রহণ করে তাহাকে সেই অংশ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কেহ পুরুষ হইয়া যদি মেয়ের পার্ট করে তবে তাহাকে সাধ্যমতো মেয়েদের হাবভাব সবই প্রকাশ করিতে হয়। যতটুকু সে নিজেকে অভিনয়ের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে পারিবে তাহার অভিনয় ততটুকুই সফল হইবে। সেইরূপ সাধনার খেলা করিতে হইলে সাধকের

যা'কিছু ভাব হয় তাহা তো প্রকাশ হওয়া চাই। তাই তাহার অভাব বোধ এবং ব্যাকুলতা সবই প্রকাশ হয়। অভিনয়ের বেলা বলিতে পার যে, যে অভিনেতা সে যে পার্টই করুক না কেন তাহার ব্যক্তিত্বের জ্ঞান লোপ হয় না। পুরুষ হইয়া মেয়ের পার্ট করিলেও সে যে পুরুষ সে জ্ঞান তাহার থাকিয়া যায়। সেইরূপ বলিতে পার যে যিনি পূর্ণ তিনি সাধকের খেলা খেলিলেও তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানের লোপ হয় না। সেইজন্য তাঁহার বিরহ, তাঁহার ব্যাকুলতা, অজ্ঞানী সাধকের বিরহ, ব্যাকুলতা হইতে ভিন্ন। তবে জানিও ব্যাকুলতা, বিরহ যে কী তাহার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই উহার প্রকাশও পূর্ণভাবে হওয়া সম্ভব।

আমি। আচ্ছা মা, অনেক সময় তোমাকে সাধনার কোনও অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তুমি বল, 'এ শরীরে ওই অবস্থা হইয়াছিল বলিয়াই উহা জোরের সহিত বলিতে পারে।' এখন কথা হইল 'এ শরীর বলিতে তুমি কি তোমার ৩।। হাত দেহের কথাই বল, না তোমার যে বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বাতীত দেহ আছে সেই দেহের কথাই বল? (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) তোমরা যাহা মনে কর।

২৩শে পৌষ, রবিবার (ইং ৮।১।৫৬)

আজ বেলা ৩টার সময় মা কাশী রওনা হইয়া গেলেন। কাশী হইয়া দিল্লি চলিয়া যাইবেন। আমরা (অর্থাৎ গোপীবাবু এবং আমি) বিন্ধ্যাচলে রহিয়া গেলাম। আগামীকল্য, সোমবার গোপীবাবুর মৌনের দিন বলিয়া আমাদের কাশী যাওয়া হইবে না। স্থির হইয়াছে যে আগামী মঙ্গলবার দিন আমরা কাশী যাইব। আমাদের জন্য মা তাঁহার গাড়ি বিন্ধ্যাচলেই রাখিয়া গেলেন।

২০শে মাঘ, শুক্রবার,

মা দিল্লি হইতে বৃন্দাবন হইয়া কাশী আসিয়াছেন। হরিবাবা সুস্থ হইয়া হোসিয়ারপুর চলিয়া গিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে আসিয়াছেন টিহরির রাজমাতা এবং তাহার কন্যা আর আসিয়াছে ১৫।১৬ বৎসরের একটি ছেলে, নাম সদন। ছেলেটি হইল নির্বুদ্ধিতা এবং লাম্পট্যের অপূর্ব সমন্বয়। ছোট বেলায়ই ইহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। খুব দুঃস্থ বলিয়া খুকুনীদিদি ইহাকে এবং ইহার আরও দুই ভাইকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য আলমোড়ার বিদ্যাপীঠে লইয়া

যান। কিছুদিন পরে যখন দেখা গেল যে ইহার মস্তিষ্কে পড়াশুনার কিছুই প্রবেশ করে না এবং কথার বাধ্যও নয় তখন ইহাকে আবার ইহার ঠাকুরমার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সেইখানে এ একদিন কাহারও ক্ষেত হইতে শসা চুরি করিয়া খাইয়া মার খাওয়ার ভয়ে বাড়ি হইতে পলাইয়া যায়। দশ বৎসর পর্যন্ত বাহিরে বাহিরেই ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিয়াছে। কয়েকবার এ নাকি জেলেও গিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে এইবার এ দিল্লিতে মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মা ইহাকে সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া আসিয়াছেন। ইহার ব্যবহার এবং আবদার দেখিলে সর্ব শরীর জ্বলিয়া যায় এবং ধৈর্য ধারণ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু মা শান্তভাবে ইহার প্রায় সকল আবদারই রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। মায়ের অসীম ধৈর্য এবং স্থৈর্য দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

মা দুই দিন কাশীতে থাকিয়া ২২শে মাঘ রাজমাতা সহ বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যান। সেইখানে রাজমাতা তিনদিন থাকিয়া পরে কাশী হইয়া দিল্লি চলিয়া যান। মাও ২৭শে মাঘ বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী চলিয়া আসেন।

৩০শে মাঘ কন্যাপীঠের মেয়েরা খুকুনী দিদির জন্মোৎসব করিয়াছে। এই উৎসবের বিশেষত্ব হইল এই যে ইহারা খাওয়া দাওয়ার ধুমধাম না করিয়া সংযত আহার করিয়া সমস্ত দিন পাঠ, কীর্তন এবং ধর্মালোচনায় কাটাইয়াছে।

১লা ফাল্গুন, ১৩৬২ সন (ইং ১৪।২।৫৬)

আজ ডক্টর আরনল্ড বাকে (Dr. Arnold Bake) নামক একজন সাহেব আসিয়া মাকে বাংলা গান শুনাইলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং কীর্তন গানও করিলেন। সাহেবটি জাতিতে ডাচ্। তিনি ডাচ্ ভাষারও একটি গান করিলেন। আগামীকল্য ইনি পাটনায় চলিয়া যাইবেন। ভারতীয় এবং অভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে যেসকল সাদৃশ্য আছে তাহাই ইনি বক্তৃতা এবং গান করিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়া থাকেন। সাহেবের বাংলা গান শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের ধৈর্য এবং অধ্যবসায় দেখিলে অবাক হইতে হয়। মুক্তিবাবার কথায় মাও গাহিলেন 'হে ভগবান' ইত্যাদি এবং 'ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়।' শেষ নাম কীর্তনটি নাকি হরিবাবার অনুরোধে এক পাঞ্জাবি

সৎসঙ্গে মা প্রথম গাহিয়াছিলেন। সাহেব এবং তাহার স্ত্রীকে আজ আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলা হইয়াছে।

মেয়েদের এবং শূদ্রের প্রণবে অধিকার আছে কিনা

২রা ফাল্গুন, বুধবার (ইং ১৫।২।৫৬)

আজ সন্ধ্যায় গোপীবাবু মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর আশ্রমে গেলে শুনিতে পাইলাম যে মা আমার খোঁজ করিয়াছেন। তখনই দোতলায় মায়ের ঘরে গেলাম। সেইখানে মাত্র গোপীবাবু উপস্থিত ছিলেন। মৌন পর্যন্ত মায়ের সহিত নানা কথা হইতে লাগিল।

আজ সকালে প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের প্রণবে অধিকার আছে কিনা। এই সম্বন্ধে হরিবাবা নাকি বলিয়াছেন যে পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক মতে স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রেরও প্রণবে অধিকার আছে, কিন্তু বৈদিক মতে এই অধিকার নাই। শঙ্করানন্দ স্বামীজী এবং নারায়ণ স্বামীজী ইঁহারা দুইজনেই বলিয়াছিলেন যে তান্ত্রিক মতেও স্ত্রীলোকের প্রণবের অধিকার নাই। এই সময় মা বলিয়াছিলেন যে যদি প্রণব কাহারও ঠিক ঠিক উচ্চারণ হইয়া যায় তবে সেখানে জাতি কিংবা স্ত্রীপুরুষের প্রশ্ন থাকে না।

সকাল বেলার প্রশ্নটি আমি গোপীবাবুর নিকট উত্থাপন করিলে গোপীবাবু বলিলেন যে কতকগুলি তন্ত্রকে শ্রুতিমূলক বলা হয় আর কতকগুলিকে ভিন্ন ভাবে ধরা হয়। যেই সকল তন্ত্র শ্রুতিমূলক তাহাদের মতে অবশ্য স্ত্রী এবং শূদ্রের প্রণবে অধিকার নাই, কিন্তু অন্যান্য তন্ত্রের মতে ওই অধিকার আছে। সকল তন্ত্রের ভিত্তিই হইল ঋষিবাক্য। কাজেই কোনও মতকে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রকৃত পণ্ডিতের কাজ হইল শাস্ত্রের বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা। আবার কেহ কেহ এইরূপ সামঞ্জস্যেরও বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে, যেইহেতু বুদ্ধি দ্বারাই এই সামঞ্জস্য করা হইয়া থাকে কাজেই এইখানে ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে। বুদ্ধির ব্যাপারকে ঋষিবাক্যের উপরে স্থান দেওয়া যায় না।

এই সময় আমি মাকে বলিলাম, 'সর্বদাই দেখিয়াছি যে কোনও শাস্ত্রের বিষয় লইয়া দুই মত দেখা গেলে তুমি নিজের কোনও মত প্রকাশ কর না। এইরূপ হয় কেন?

মা। দেখ, কেহ যদি গোপনে তার সমস্যার বিষয় এই শরীরের কাছে বলে তবে কখনও কখনও তাহাকে স্পষ্ট করিয়াই কিছু বলা হয়। কিন্তু ওই সকল কথা যখন দশজনের মধ্যে হয় তখন অনেক সময়ই এ শরীর কোনও মতামত প্রকাশ করে না। তাহার কারণ এই যে এ শরীর যেভাবে কথা বলিবে তাহা হয়তো সকলে ধরিতে পারিবে না। কেহ হয়তো মনে করিবে যে মা অশাস্ত্রীয় কিছু বলিলেন। শাস্ত্রের সকল কথাই যে যথার্থ তাহা ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

'কেহ হয়তো গোপন কথা বলিতে আসিয়া বলে যে সে গুরুর নিকট যে মন্ত্র পাইয়াছে, অন্য কোনও মহাপুরুষ অপর কোনও মন্ত্র দিয়াছেন—এই অবস্থায় সে কী করিবে? অনেক সময় তাহাকে গুরু দত্ত মন্ত্র এবং মহাপুরুষ দত্ত মন্ত্র দুই-ই জপ করিতে বলা হয়।

এই সময় আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'বেবি দিদির বেলায় দেখিয়াছি যে কুলদা দাদা তাহাকে যেই মন্ত্র দিয়াছিলেন তুমি তাহাকে সেই মন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে।'

মা। উহার বিশেষ কারণ ছিল। দুই এক জনের বেলায় এরূপও করা হইয়াছে। কাহাকেও বলা হইয়াছে যে তাহারা যেন গুরু মন্ত্র লিখিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেয়। যখন দেখা গিয়াছে যে ওই মন্ত্র জপে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবে তখন তাহাকে ওইরূপ করিতে বলা হইয়াছে। গুরুর উপর মাঝে মাঝে অবিশ্বাস আসাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। জীব যখন তখন তাহাকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিতে হইবে। কিন্তু ওই অবিশ্বাস আসা সত্ত্বেও সে যদি তাহার নিত্য কর্ম অর্থাৎ গুরু দত্ত মন্ত্র জপ করিয়া যায় তবে পরিণামে ভালই হয়। কিন্তু অবিশ্বাস এমন ভাবেও আসিতে পারে যাহার জন্য তাহার নিত্য কর্ম বন্ধ হইয়া যাইতে পারে সেই সব স্থলেই মুস্কিল। গুরু মন্ত্র জপ করিয়া কিছু হইল না বলিয়া ব্যাকুলতা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে এই ব্যাকুলতা এবং অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। যদি সে অগ্রসর না হইত তবে তাহার মধ্যে এই ব্যাকুলতা কখনও আসিত না। যে অবিশ্বাসের ফলে লোকে জপ ছাড়িয়া ভোগে মত্ত হয় উহাই খারাপ। তাহা

না হইলে অবিশ্বাস ব্যাকুলতা সবই চলার পথে আসিয়া থাকে এবং ওইগুলিই প্রমাণ করিয়া দেয় যে সে চলার পথেই আছে।

কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

৩রা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (ইং ১৬।২।৫৬)

আজ সরস্বতী পূজা। আশ্রমের উত্তর দিকে যে নূতন বাড়ি ক্রয় করা হইয়াছে সেইখানে এই পূজার জোগাড় হইয়াছে। সকাল বেলা গঙ্গা স্নান করিয়া ফিরিবার পথে যখন আশ্রমে গেলাম তখন হঠাৎ মায়ের সহিত দেখা হইল। মাকে প্রণাম করিতেই মা আমাকে একটি আশীর্বাদী মালা দিলেন। এই শুভদিনে গঙ্গাস্নানের পরই মায়ের আশীর্বাদ পাইয়া খুব আনন্দ হইল।

বাসায় আসিয়া কাপড় পরিবর্তন করিয়া আশ্রমে গেলাম। ততক্ষণে পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কন্যাপীঠের মেয়েরা কীর্তন করিতেছে। খুকুনীদিদিকেও চেয়ারে বসাইয়া ওইখানে আনা হইয়াছে। কিন্তু মাকে ওইখানে দেখিলাম না। একটু পরেই মা আসিলেন। মায়ের এক অপূর্ব সাজ! কে যেন বাসন্তী রংয়ের একখানা রেশমের শাড়ি মাকে পরাইয়া দিয়াছে। গলায় এবং হাতে বড় বড় সুন্দর ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। কীর্তনের তালে তালে হাতে তালি দিতে দিতে মা পূজার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া মনে হইল সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবীই যেন চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া পূজার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মায়ের প্রতি পদক্ষেপেই যেন ঐশ্বর্য এবং স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস ফুটিয়া উঠিতেছিল। এমন চলার ভঙ্গি কখনও মানুষের মধ্যে সম্ভব হয় না। মা তাঁহার মালাগুলি সরস্বতী মূর্তির গলায় পরাইয়া দিয়া নিজের রেশমী বস্ত্র ছাড়িয়া সাধারণ সাজে পূজার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। পূজা এবং পুষ্পাঞ্জলি শেষ হইলে মা ওইখান হইতে চলিয়া গেলেন। আমরা দ্বিপ্রহরে আশ্রমেই প্রসাদ পাইলাম।

নারায়ণ স্বামী আজ এক সহস্র আটটি তুলসী পত্র শালগ্রাম শিলার মস্তকে দিয়াছিলেন। বিকালের দিকে ওই তুলসী পত্র মা আমাদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। রাত্রিতেও ক্ষীর মিশ্রিত মুড়কি প্রসাদ নিজ হাতে আমাদিগকে দিলেন।

গুরুধাম মন্দিরে মা

৯ই ফাল্গুন, বুধবার (ইং ২২।২।৫৬)

আজ সকালবেলা গোপীবাবু মাকে লইয়া গুরুধাম দেখিতে গেলেন। আমাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। এই 'গুরুধাম' কাশীর দুর্গাবাড়ির নিকটেই। ইহা প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। ভূ কৈলাসের জয় নারায়ণ ঘোষাল কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত। 'গুরুধাম' যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি মাকে লইতে আসিয়াছিলেন।

আমরা মোটরে গিয়া দেখিলাম যে মন্দিরটি অষ্টকোণ। মন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রাঙ্গণটিও অষ্টকোণ। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকিবার আটটি দ্বার। প্রত্যেক দ্বারেরই আলাদা আলাদা নাম। মন্দিরটি পূর্বাস্য বলিয়া ইহার প্রধান দ্বার পূর্ব দিকে এবং ইহার নাম কাশীদ্বার। গুরুদ্বার, কাঞ্চীদ্বার, অবন্তীদ্বার ইত্যাদি অন্যান্য দ্বারের নাম। মন্দিরটি এমন ভাবে নির্মিত যে দেখিলেই মনে হয় ইহা যেন অষ্টদল পদ্মের মাঝখানে অবস্থিত। এই দলগুলিকে বিভিন্ন ধাম বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে।

মন্দিরটি ত্রিতল। সর্ব নিম্নতলায় অষ্টকোণ সিংহাসনের উপর গুরু এবং গুরুপত্নীর বিগ্রহ আছে। মন্দিরের ভিতরে একটি গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠা যায়। দ্বিতলের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। আবার দ্বিতলের মন্দিরের ভিতর দিয়া একটি গুপ্ত সিঁড়ি আছে যাহা দিয়া ত্রিতলে উঠা যায়। ত্রিতলে মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নাই। উহা শূন্য। মন্দিরের চূড়ায় অষ্টদল কমলের উপর একটি কলসী। এই কলসীর গাত্রেও নাকি চারিশত কমলের পাপড়ি খোদিত আছে।

মন্দিরের নিম্নতলায় আটদিকে যে আটটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ যুক্ত আটটি আঙিনা আছে যাহাদিগকে পূর্বে আটটি ধাম বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে উহার প্রত্যেকটি হইতেই দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি আছে। কিন্তু ত্রিতলে উঠিবার বাহির হইতে কোনও সিঁড়ি নাই। ত্রিতলে যাইতে হইলে ভিতরের সিঁড়ি দিয়াই উঠিতে হয়।

মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অন্য একটি মন্দির আছে যাহাতে রাধাকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন স্থাপিত এবং ওই চরণ চিহ্নের কিছু উপরে গুরুপাদুকা। এই দুই মন্দিরের

মাঝখানে যে জায়গা আছে উহার উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে সারি সারি কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির। দক্ষিণ দিকে সাতটি এবং উত্তর দিকে সাতটি। এই সকল মন্দিরে বিভিন্ন বিগ্রহ আছে। কোনওটিতে সূর্য, কোনওটিতে গণেশ, কোনওটিতে দুর্গা, কোনওটিতে গিরিধারী গোপাল ইত্যাদি, কিন্তু প্রত্যেক মন্দিরেই একটি করিয়া শিবলিঙ্গ আছেন।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সাধনার বিভিন্ন স্তরগুলি দেখাইবার জন্য বোধহয় এই মন্দির তৈয়ার করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। তবে তাঁহার ভাবগুলি ছিল উদার। সর্ব নিম্নতলে গুরুকে স্থাপন করিয়া তিনি বোধহয় ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে গুরুর সাহায্য নিয়াই সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। গুরুর কৃপায় মধ্যপথ খুলিয়া গেলে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়। তাই দ্বিতলে ইষ্ট মূর্তি রাধাকৃষ্ণ স্থাপিত হইয়াছে। মন্দিরের ভিতর দিয়া যে গুপ্ত সিঁড়ি উপরে চলিয়া গিয়াছে উহাই সুষুম্না বা মধ্যপথ। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের পরে ইষ্টকে অতিক্রম করিয়া অদ্বৈত স্থিতি হয়। এইজন্য ত্রিতলে কোনও মূর্তি নাই। উহা নিরাকার। শুধু মধ্য পথ ধরিয়াই ওই স্থিতিতে পৌঁছানো যায়। সেইজন্য ত্রিতলে যাইবার বাহির হইতে কোনও সিঁড়ি নাই।

মন্দির প্রতিষ্ঠাতার মনে কী ভাব ছিল তাহা বলা শক্ত। ওই সম্বন্ধে শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। স্থানটি নির্জন এবং সাধন ভজনের অনুকূল। মন্দিরের সংলগ্ন জমিও অনেক, বোধহয় ২০।২৫ বিঘা হইবে। শুনা যাইতেছে যে কাশীর Improvement Trust নাকি এই জমিগুলি দখল করিয়া লইবে। তখন হয়তো মন্দিরের চারিপাশের শান্ত ভাব আর থাকিবে না। তাহা ছাড়া মন্দির জীর্ণাবস্থায় আছে। ইহার সংস্কার করাও আবশ্যক।

শ্রীহরিবাবা সম্বন্ধে মায়ের সূক্ষ্মে নানা প্রকার দর্শন

আজ বিকালে মা যখন চত্বরে বসিয়াছিলেন তখন দিল্লির বিড়লা মন্দিরের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাসজী মহাশয় মাকে হরিবাবা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে মা তাহাকে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মুখে ব্যাপারটি যাহা শুনিলাম তাহা এই—

চার পাঁচ বৎসর পূর্বে মা এবং হরিবাবা যখন কিষণপুর আশ্রমে ছিলেন

তখন একদিন মা সূক্ষ্মে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তিনি এবং হরিবাবা এক জায়গায় বসিয়া আছেন। এমন সময় মা হরিবাবার পিছন হইতে দুই হাতে তাঁহার কোমর ধরিয়া ছোট শিশুর মতো তাঁহাকে তুলিয়া নীচে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন, 'যাও প্রস্রাব কর গিয়া।' মা বলিলেন, 'এত বড় একটা লোককে বসা অবস্থা হইতে উঠাইলাম তাহাতে একটুও ভার বোধ হইল না। তখন মনে হইয়াছিল যে, যেন কোনও ছোট্ট শিশুকে ওইভাবে উঠানো হইয়াছিল। এই কথা অমি হরিবাবাকেও তখন বলিয়াছিলাম।'

এইবার অসুখের সময় হরিবাবাকে দিল্লিতে লইয়া আসা হইল এবং তাঁহাকে ডা. সন্তোষ সেনের Nursing Home এ ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। যেই দিন তাঁহার Operation হইবে তাহার পূর্ব দিন সকাল বেলা মা খুকুনীদিদির ঘরে বসিয়া দেখিতে পাইলেন যে হরিবাবা বিছানায় শুইয়া আছেন এবং তাঁহার নিকট মা এবং একজন তেজস্বী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। ওই তেজস্বী পুরুষের ডান দিকে মা দাঁড়াইয়াছিলেন। ওই মহাত্মা যখন হরিবাবার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন তখন মা বুঝিতে পারিলেন যে ইনিই হরিবাবার গুরু (স্বামী সচ্চিদানন্দ তীর্থ)। অবশ্য মা তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই কারণ তিনি অনেকদিন হয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। এমনকী মা তাঁহার কোনও ফটোও দেখেন নাই। যাহা হউক সচ্চিদানন্দ স্বামী কিছুক্ষণ হরিবাবাকে লক্ষ্য করিয়া মার দিকে ফিরিয়া মাকে বলিলেন, 'আগামীকাল ইহার সংরক্ষণের আবশ্যক হইবে।' মা বলিলেন, 'বাবার কথার অর্থ এই যে আমি যেন আগামীকাল হরিবাবাকে রক্ষা করি। ইহা দেখিয়া এই শরীর যখন হরিবাবাকে দেখিতে হাসপাতালে গেল তখন তাহার সেবকদিগকে এই শরীরের দর্শনের কথা বলিয়া তাহাদিগকে বাবার মঙ্গল কামনায় অখণ্ড ভাবে জপ, ধ্যান, পাঠ এবং কীর্তনাদি করিতে বলিল। সকলে সমবেত ভাবে না করিতে পারিলেও একজনের পর একজন করিয়া যেন অখণ্ডভাবে আগামীকাল সকাল হইতেই ওইরূপ করিতে থাকে। তাহাই করা হইয়াছিল।' যেই দিন হরিবাবার Operation হয় সেইদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তিনি যেন শিশু হইয়া মা আনন্দময়ীর কোলে শুইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে একটি নেংটি। উহার রং ঠিক গেরুয়াও নয়, হলদে

রংও নয়। আর মাকে ঘিরিয়া অনেক দেবদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করিয়া পতাকা। ওই পতাকাগুলির রং হরিবাবার নেংটির রঙের মতো, কিন্তু ওই পতাকাগুলি হইতে এমন জ্যোতিঃনির্গত হইতেছিল যে যাহার কাছে সূর্যের আলোও যেন নিষ্প্রভ। এই স্বপ্নের বিবরণ হরিবাবা নিজেই নারায়ণ দাস মহাশয়কে বলিয়াছেন। Operation এর কিছুদিন পর হরিবাবাকে দিল্লিতে মায়ের আশ্রমে (চন্দ্রলোকে) আনিয়া রাখা হইল। ওইখানে সুস্থ হইয়া যেদিন হরিবাবা হোসিয়ারপুর রওনা হইবেন সেইদিন ভোর ৫টায় নারায়ণ দাস মহাশয় হরিবাবাকে এরোড্রোমে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মোটর লইয়া আসিলেন। কথা ছিল মাও হরিবাবার সহিত এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাইবেন, কিন্তু মায়ের কষ্ট হইবে বলিয়া হরিবাবা মাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। মা বলিলেন, 'হরিবাবা মোটরে উঠিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, ভক্তরা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কীর্তন করিতেছে, এমন সময় এই শরীর বাবাকে আবার ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া চৌকির উপর বসিতে বলিল। কেন যে বাবাকে ওইরূপ বলা হইতেছে, বাবা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না অথচ তাহাকে যাহা করিতে বলিতেছি তাহা যেন তাহার না করিয়াও উপায় নাই। বাবা এক পা তুলিয়া চৌকির উপর একটু বসিলে এ শরীরও তাহার পাশে বসিয়া পিছন হইতে তাহার কোমর ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল এবং তাহার কানে কানে বলিল, 'বাবা, কিষণপুরে যাহা দেখা হইয়াছিল তাহা এবার কাজে হইয়া গেল।' এই বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে লইয়া আসিলাম। বাবা মোটরে বসিলে তাহার কোলে মাথা রাখিয়া বলিলাম, 'বাবা, তোমার কি স্মরণে আছে?' অর্থাৎ কিষণপুরে বাবার সম্বন্ধে সূক্ষ্মে যাহা দর্শন হইয়াছিল এবং ওই সম্বন্ধে বাবাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি তাহার স্মরণে আছে? বাবা মনে করিল Operation এর দিন বাবা যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিল এই শরীর বুঝি সেই কথাই বলিতেছে। তাই সে উত্তর করিল, 'হাঁ, হাঁ।' কিন্তু আমি বুঝিলাম যে বাবা আমার কথার অর্থ বুঝে নাই।'

নারায়ণ দাসজী বলিলেন, 'তাই সত্য, কারণ এয়ারপোর্টে যাইতে যাইতে বাবা আমাকে মোটরে বলিলেন, 'নারায়ণ, মা আজ সকালে আমার কানে কানে

কী কথা বলিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, আমার বোধহয় অপরাধ হইয়াছে।' নারায়ণ দাসজীর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। তিনি আরও বলিলেন, 'এবার হোসিয়ারপুর গিয়া বাবা হাজার হাজার লোকের কাছে বলিয়াছেন, 'আমি মরিতেই বসিয়াছিলাম, মাতাজী আমাকে নূতন জীবন দিয়াছেন। দিদি এবং মাতাজীর কৃপায়ই আমি নূতন জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।'

এই সকল কথা শুনিয়া মনে হইল যে চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে মা হরিবাবাকে যেই ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন উহাতেই তাঁহার রোগ এবং আরোগ্য হওয়ার ইঙ্গিত আছে।

বাবা বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে মা

১২ ই ফাল্গুন, শনিবার (ইং ২৫।২।৫৬)

আজ সকালে আশ্রমে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনা হইল। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা হইলেন কুমারী পদ্মা মিশ্র। ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। প্রায় এক বৎসর যাবৎ ইনি বিনা পারিশ্রমিকে কন্যাপীঠে আসিয়া মেয়েদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছিলেন। ইনি আশ্রমে দুইদিন গীতার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, বেশ ভালই বলিতে পারেন। শ্রীশ্রীমাকে দিয়াই বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করানো হইয়াছে।

বেলা প্রায় ৯।। টায় মাকে লইয়া 'বিশুদ্ধানন্দ কাননে' গেলাম। ওইখানে যে যাওয়া হইবে তাহা পূর্বেই স্থির ছিল। গোপীবাবু, জ্যোতির্ময়বাবু প্রভৃতি আশ্রমদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মা আশ্রমে প্রবেশ করিলেই মেয়েরা শঙ্খ বাজাইয়া মাকে অভ্যর্থনা করিল। মায়ের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সকলে মাকে প্রণাম করিলেন।

প্রথমেই মা বাবা বিশুদ্ধানন্দজীর মর্মর মূর্তির নিকটে গেলেন। মায়ের গলায় যে সকল মালা ছিল তাহা তিনি বাবার মূর্তির গলায় পরাইয়া দিলেন এবং ওই মূর্তিকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে মূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বাবার সঙ্গে সেই একরূপে দেখা হইয়াছিল, এখন আবার এইরূপে দেখা হইল।' মা এমনভাবে বলিলেন যেন জীবন্ত কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। মার আশ্রম হইতে একটি ঝুড়িতে কিছু ফল এবং ফুলের মালা আনা হইয়াছিল।

ওইগুলি আমার কাছেই ছিল। মা উহা বাবার মর্মর মূর্তির সম্মুখে রাখিয়া দিতে বলিলেন।

পরে মাকে মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে গিয়াও মা দুর্গামূর্তি এবং গোপালের মূর্তির মুখে মুখ রাখিয়া এমনভাবে আদর করিলেন যাহাতে মনে হইল যে বাস্তবিক যেন জীবন্ত কিছুকে আদর করা হইতেছে। ওইখানে যে সকল শিবলিঙ্গ ছিল মা তাহাও স্পর্শ করিলেন। পরে নবমুণ্ডীর আসনে গেলেন। এইখানে আসিয়াও মা নবমুণ্ডীর আসনে হাত বুলাইয়া দিলেন, কিন্তু ভাবটা এমন করিলেন যাহাতে মনে হইল যে ওই আসনটি অপরিষ্কার ছিল বলিয়াই মা হাত দিয়া উহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। নবমুণ্ডীর সংলগ্ন গুহাদিও মাকে দেখানো হইল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। এই সকল স্থান এইবারই আমার প্রথম দেখা হইল। পরে বাবার বসিবার ঘর, শয়ন ঘর, বিজ্ঞান মন্দির প্রভৃতি মাকে দেখানো হইল। আশ্রম হইতে মাকেও ফল মালা দেওয়া হইল। আমরা ওইখানে প্রসাদ পাইলাম। পরে বেলা ১১টার সময় আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

আজ মাঘী পূর্ণিমা। মৌনের পর কীর্তনাদি হইল। সকলকেই আজ প্রসাদ পাইয়া যাইবার জন্য দিদি অনুরোধ করিলেন। পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত বক্সী আসিয়াছেন। ইনি পাটনা রেভিনিউ বোর্ডের বড় অফিসার। ইনি মাকে গান করিবার জন্য খুব অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'ইহারা গান করিতে থাকুক যদি আসিয়া যায় তবে গাহিব। তাহা না হইলে আগামীকাল দেখা যাইবে।' যদিও একঘন্টা গান হইল, কিন্তু মায়ের গান আর আসিল না। রাত্রিতে কালীপূজা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম। মা নিজেই এই প্রসাদ বিতরণ করিলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন মার হাতে প্রসাদ পাইয়া সকলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। মা কোমরে কাপড় জড়াইয়া যে মূর্তিতে প্রসাদ বিতরণ করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল যে স্বয়ং ৺অন্নপূর্ণাই যেন প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। তখন মার মূর্তি এমনই অপূর্ব দেখাইতেছিল।

১৩ই ফাল্গুন, রবিবার (ইং ২৬।২।৫৬)

আজ বেলা ১০টায় মা ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন।

গতকল্য শ্রীযুক্ত বক্সীমহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের গান শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তাই আজ বেলা ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত কেবল গানই চলিল। মেয়েদের মধ্যে গৌরী, পুষ্প ও বুবা গান করিল। মাও প্রথম এবং শেষদিকে গান করিয়াছিলেন। সমস্ত গানই রেকর্ড করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহ্

শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহ এবং দিল্লির ডা. বলরাম গতকল্য আশ্রমে আসিয়াছিলেন, আজ বিকালে তাঁহারা দিল্লি চলিয়া গেলেন। বিকালবেলা এবং রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা শ্রীযুক্ত শাহ্ মহাশয়ের সদ্‌গুণের প্রশংসা করিলেন. তিনি এতদিন New India Life Insurance Co. র General Manager ছিলেন। এত বড় কোম্পানির তিনি হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন। ইদানীং সমস্ত Life Insurance Co. সরকার হাতে লইয়াছেন, কাজেই শাহ্ মহাশয়ের আর পূর্বের ক্ষমতা নাই। কিন্তু ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নন বরং তিনি বলেন যে জঞ্জাল শেষ হইয়া ভালই হইয়াছে। এখন ভগবানের নাম লওয়া যাইবে। অর্থ এবং প্রতিপত্তি তাঁহার যথেষ্ট থাকিলেও সংসার যাত্রা তিনি কতকটা নির্লিপ্তভাবে করিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষের সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়ানো তাঁহার স্বভাব। সাধুদিগকে জলে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতে দেখিয়া তিনি নিজের bathroom এ টবের মধ্যে গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া জপাদি করিতেন। সাধু সেবায় তিনি অজস্র ব্যয় করেন। খুকুনীদিদির চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করিয়াছেন। সংসারের খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা স্ত্রীর হাতে দিয়া বাকি টাকা তিনি সৎকর্মে ব্যয় করিয়া থাকেন। ছেলেমেয়েদের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা তিনি দোষনীয় বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার অসাধারণ কর্মদক্ষতা দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে আরও বেশি উপার্জন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি বলেন, 'ভগবান আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পরও যদি অর্থোপার্জনের চেষ্টা করি তবে উহা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে। আহারাদিতেও তিনি অতি সাধারণ। লোভনীয় জিনিস খাইবার স্পৃহা তাঁহার মোটেই নাই। তিনি মাকে বলিয়াছেন, 'যাহা কিছু আমাকে খাইতে দেয় আমি তাহাই খাই। উহা ভাল লাগে কী মন্দ লাগে সে বিচার আমি করি না।' শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'সংসার করিয়াও

অনাসক্ত জীবনযাপন করিতেছে।' মায়ের মুখে বি. কে. শাহ্ মহাশয়ের প্রশংসা শুনিয়া মনে হইল যে ইঁহারাই যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ।

১৬ই ফাল্গুন, বুধবার (ইং ২৯।২।৫৬)

গোপীবাবু মাকে 'বিশুদ্ধবাণী' তৃতীয় ভাগ একখণ্ড উপহার দিয়াছেন। ওই ভাগে গোপীবাবু লিখিত নবমুণ্ডী আসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছিল। গোপীবাবুর বোধহয় ইচ্ছা ছিল যে ওই প্রবন্ধটি মাকে শোনানো হয়। যাহা হউক মা খেয়াল বশে ওই প্রবন্ধটি আমাকে পাঠ করিতে বলেন। গত দুই দিন ওই প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছে। মনে হয় মাও উহা মনযোগ দিয়া শুনিয়াছেন।

আজ মৌনের পর মা গোপীবাবু, নারায়ণ স্বামী এবং আমাকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া লইয়া যান। ওই সময় মা নিজ হইতেই পঞ্চমুন্ডী এবং নবমুণ্ডী আসনের কথা তুলিলেন। তত্ত্ব হিসাবে গোপীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ছাড়াও ওই আসন প্রস্তুত করিতে কোন কোন বস্তুর দরকার হয় এবং ওই সকল বস্তুর সহিত পঞ্চমুণ্ডীর তত্ত্বের কী সম্বন্ধ মা এই প্রশ্ন উঠাইলে গোপীবাবু বলিলেন, 'পঞ্চমুণ্ডী আসন করিতে কী কী বস্তুর দরকার হয় তাহা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। জীবজন্তুর শরীরের কোন অংশ, কখন এবং কীভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাও শাস্ত্রে আছে। ওই সকল জিনিস একত্র করিয়া উহার উপর আসন রচনা করিতে হয়। ওই আসনের যে একটা প্রভাব আছে এবং উহার উপর ক্রিয়াদি করিলে যে একটা বিশেষ ফল পাওয়া যায় তাহাও স্বীকার্য। কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে পঞ্চমুণ্ডী এবং নবমুণ্ডী আসন কীভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহাই আমি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শবাসনের কথাও শাস্ত্রে আছে। ওই শব কোন জাতির হইবে এবং তাহার কীভাবে কোন সময়ে মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহকে আসন করিয়া ক্রিয়া করা যায় তাহা সমস্তই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রকৃত শবাসন হইতেছে নিজের দেহকে শবরূপে পরিণত করিয়া উহার উপর দেহী বা চৈতন্য যে ক্রিয়া করেন তাহাই, হইল প্রকৃত শবাসনের ক্রিয়া।'

গোপীবাবু এই কথা বলিয়াই নবমুণ্ডী আসনের তত্ত্বটি পুনরায় বর্ণনা করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন উহা তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশ। তাঁহার কথা

শেষ হইলে মা বলিলেন, 'বাবা, এই যে আসনের কথা উঠাইলাম তাহার কারণ এই যে অমূল্য যখন ওই বইটি পাঠ করিতেছিল, তখন ওই বইতে যে যে আসন এবং যে যে স্তরের কথা বলা হইয়াছে উহার সকলই যে এই শরীরের সাধনার খেলার সময় প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাই খেয়াল হইতেছিল, এ শরীরের দ্বারা যখন পূজাদি হইত তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোশাকুশী, ফুল চন্দন ইত্যাদি না থাকিলেও ওইগুলির ক্রিয়া এই শরীরে হইয়া যাইত। কারণ এমন স্থিতি আছে যেখানে কোশাকুশী, ফুল চন্দন ইত্যাদি সমস্তই প্রত্যক্ষরূপে বর্তমান থাকে। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে উহার কিছুই দেখা যায় না। তান্ত্রিক সাধনার খেলাগুলি যখন এ শরীরে হইতেছিল তখনও শ্মশান, শব ইত্যাদি প্রত্যক্ষ রূপেই ছিল এবং ওই সকল ক্রিয়া করিবার সময় শরীর যেন ভয়ে ছম ছম করিয়া উঠিত। তখন সাধকের খেলা হইতেছিল তো? তাই ওই সব ক্রিয়া হইতে শক্তির বিকাশ হইলে সাধকের অনুভূতিতে যাহা যাহা হয় তাহাও প্রকাশ হইতেই হইবে। বিরহের জ্বালা, মিলনের আনন্দ সমস্তই সাধকের মধ্যে থাকা চাই তো? সেইরূপ শক্তির প্রকাশ হইলে সাধকের মধ্যে যেরূপ একটা ভয় ভীতির উদয় হয়, এই শরীরের সাধনার খেলার সময় সমস্তই হইয়াছিল। এই জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে পঞ্চমুণ্ডী ইত্যাদি আসন করিতে কী কী জিনিসের প্রয়োজন হয়। কারণ সাধনক্ষেত্রে ওই জিনিসগুলিরও প্রয়োজন আছে এবং ইহাদের আলাদা আলাদা ক্রিয়া আছে। আবার পৃথিবী তত্ত্ব, জল তত্ত্ব ভেদ হইয়া কীভাবে ওইগুলি আসনে পরিণত হয় তাহাও স্তরে স্তরে দেখা গিয়াছে। অমূল্য যখন পাঠ করিতেছিল তখন খেয়াল হইতেছিল যে সে যেন এই শরীরের কথাই বলিতেছে।

'আবার দেখ, এ শরীর তো ভাগবত কখনও শুনে নাই। হরিবাবা যখন এই শরীরের কাছে ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিল তখনও খেয়াল হইতেছিল যে সে যেন এই শরীরের কথাই বলিতেছে। কবীরপন্থীদের সাধনের ধারাও এ শরীর বলিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য বোধ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কারণ তদাত্মা হইয়া সবই যে বলা যায়। একের মধ্যেই যে সব আছে। অনেকে বলে যে সাধনার ধারা তো অনন্ত, কাজেই কাহারও পক্ষে

এই অনন্ত ধারার জ্ঞান সম্ভব হয় কেমন করিয়া? কিন্তু একই তো অনন্ত হইয়া আছেন। এই একককে জানিলেই অনন্তকে জানা যায়। তাই নয় কি বাবা?'

গোপীবাবু ইহা স্বীকার করিলেন। এইভাবে রাত্রি প্রায় ১০।। টা পর্যন্ত মায়ের সহিত কথাবার্তা হইল।

১৭ই ফাল্গুন বিকালবেলা মা বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গিয়া আবার ১৮ তারিখে বিকালবেলা কাশী ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিবেলা যখন মার ঘরে গেলাম তখন গোপীবাবু প্রভৃতিকে ওই ঘরে দেখিতে পাইলাম। হরিবাবার অসুখের সময় মা হরিবাবার গুরুকে যে দেখিয়াছিলেন সেই সব কথা হইতেছিল।

গোপীবাবু। হরিবাবার গুরু যে তোমাকে দেখিতে পাইলেন তাহা তিনি কীভাবে পাইলেন?

মা। লোকের স্থিতি অনুসারে দর্শন হয়। যে, যে স্থিতিতে আছে তাহার দর্শন তদনুযায়ী হয়। কেহ এই শরীরটাকে না দেখিয়া তাহার ইষ্টকে দেখে। কেহ আবার এ শরীরকে তাহার ইষ্ট রূপেই দেখে।

গোপীবাবু। হরিবাবার গুরুর সহিত সাক্ষাৎভাবে তোমার পরিচয় ছিল না। তিনি তোমাকে স্থূলভাবে দেখেনও নাই। হরিবাবার সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল বলিয়াই তাঁহার কাছে তিনি গিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি তোমাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে হরিবাবাকে রক্ষা করার ক্ষমতা তোমারই আছে, তাঁহার নাই। ইহা তিনি কীভাবে বুঝিলেন?

মা। এই শরীরকে তিনি ইষ্টরূপে দেখিয়া কিংবা তাঁহার স্থিতি অনুসারে অন্য কোনও রূপে দেখিয়াও উহা বুঝিয়া থাকিতে পারেন। তাহা ছাড়া এ শরীরের সহিত হরিবাবার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অন্যান্য মহাপুরুষের সহিত তো সেরূপ নয়। হরিবাবার সহিত তাঁহার যে যোগসূত্র আছে ওই সূত্রে তাহার কাছে আসিয়া, ওই সূত্রে আবার এই শরীরকেও দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গোপীবাবু। তিনি তোমাকে দেখিয়াই যে বুঝিতে পারিলেন যে তোমারই রক্ষা করিবার শক্তি আছে, ইহা কি সাময়িক?

মা। ইহা সাময়িক হইতে পারে আবার ওই দর্শনের ফলে তাহার হয়তো একটা গ্রন্থি খুলিয়া যাইতেও পারে।

গোপীবাবু। তাহা হইলে তো খুবই ভাল।

অন্যান্য লোক আসিয়া পড়াতে এই আলোচনা বন্ধ হইল।

১৯শে ফাল্গুন, শনিবার (ইং ৩।৩।৫৬)

গোপীবাবু আজ মাকে ভোগ দিবার জন্য বাবা বিশুদ্ধানন্দের আশ্রমে লইয়া গেলেন। সঙ্গে বেলুদিদি এবং নারায়ণ স্বামী গেলেন। শঙ্করানন্দ স্বামীজী এবং আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমরা রিক্সা করিয়া মায়ের পূর্বেই আশ্রমে পৌঁছাইয়া ছিলাম। মায়ের মোটর আশ্রমে পৌঁছাইলে মাকে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। মায়ের ভোগের সময় বাহিরেও ঘন্টা বাজিতেছিল। ভোগের আয়োজনও বহু রকম হইয়াছিল। ভোজনান্তে মা নবমুণ্ডীর আসনের পিছনের কোঠায় গিয়া গোপীবাবুকে কিছু বলিলেন। মা চলিয়া আসিলে গোপীবাবু এবং তাঁহার অন্যান্য গুরু ভ্রাতাদের মুখে চোখে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব দেখিতে পাইলাম।

বৃন্দাবনে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা

২০শে ফাল্গুন, রবিবার (ইং ৪।৩।৫৬)

আজ রাত্রি ১১।।টার সময় মা মোগলসরাই রওনা হইয়া গেলেন। সেইখান হইতে তুফান মেল ধরিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন। শিবরাত্রির সময় বৃন্দাবন আশ্রমের শিবমন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা হইবে। এই জন্যই এখন মায়ের বৃন্দাবন যাওয়া।

৩০শে চৈত্র, শুক্রবার (ইং ১৩।৪।৫৬)

গতকল্য রাত্রি ১১।। টায় মা বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন। শিবরাত্রি এবং দোলের সময় মা বৃন্দাবনে ছিলেন। দোলের পর দশ দিনের জন্য হরিবাবা মাকে হোসিয়ারপুর লইয়া যান। সেইখান হইতে দিল্লি আসিয়া উড়িয়াবাবার তিরোধান উৎসব উপলক্ষে মা আবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেইখান হইতে কাশী আসিয়াছেন।

দিদিমার সন্ন্যাসতিথি উৎসব

আজ দিদিমার সন্ন্যাসতিথি উপলক্ষ করিয়া আশ্রমে উৎসব হইল। এই উৎসবে অগ্রণী ছিলেন দেরাদুনের নরেশবাবু। দিদিমার শিষ্যেরা খুব উৎসাহের সহিত এই উৎসব করিলেন। বেলা ১০টার সময় দিদিমাকে চণ্ডীমণ্ডপে এক

উচ্চাসনে বসানো হইল। এক শিষ্যা দিদিমার মস্তকের উপর গৈরিক ছত্র ধারণ করিল। অপর এক শিষ্যা দিদিমাকে চামর দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল। তাহার পর দিদিমার পূজা এবং আরতি শেষ হইলে শিষ্য-শিষ্যা এবং ভক্তরা দিদিমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। মা সমস্ত সময়ই চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন এবং কিছুক্ষণ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই মন্ত্রটি সকলকে দিয়া গান করাইয়াছিলেন। শেষে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে উঠিয়া আসার সময় মা দিদিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কোলে মাথা রাখিলেন। দিদিমাও মাকে আবেগ ভরে জড়াইয়া ধরিলেন। মা মণ্ডপ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'আমি নিজকেই অঞ্জলি দিয়া আসিলাম।'

এই উপলক্ষে ১২জন সাধুকে আশ্রমে ভাণ্ডারা দেওয়া হইয়াছিল। আমরাও আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছিলাম।

মৃত্যুর পূর্বে বৃন্দাবনের এক সাধুকে দর্শন দান

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গোপীবাবু মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মা আমাদিগকে লইয়া তাঁহার দোতলার ঘরে গেলেন। সেখানে অন্যান্য কথার মধ্যে মা বলিলেন, 'এবার বৃন্দাবনে গোয়ালিয়র হইতে একটি ছেলে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহার মা বাবা ৭ বৎসর যাবৎ বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। ছেলেটি গোয়ালিয়রে চাকুরি করে। তাহার বাবা বৃন্দাবনে সাধন ভজন লইয়া আছে। শুনিতে পাইলাম যে, সে নাকি বলিত যে সে তাহার মাথার মধ্যে বংশীধ্বনি এবং পেটের মধ্যে কীর্তনের ধ্বনি শুনিতে পায়। অনেক সময় সে যমুনার ধারে বসিয়া থাকিত এবং 'আমাকে এখন লও' বলিয়া যমুনার কাছে প্রার্থনা জানাইত। রোদের মধ্যে সর্বদা তাহাকে ওইভাবে বসিতে দেখিয়া লোকে মনে করিত যে তাহার মাথাটা বুঝি খারাপ হইয়া গিয়াছে। ওইভাবে যমুনার তটে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে যমুনার জলে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহও পাইয়াছিল।

যাক একদিন সে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢালিয়া এবং মাথায় ঘি মাখিয়া যমুনার ধারে গিয়া নিজের শরীরে আগুন লাগাইয়া দিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে সে যমুনায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকে যখন তাহাকে

জল হইতে উদ্ধার করিল তখন দেখা গেল যে তাহার পেট এবং মাথার পিছন দিকটা পুড়িয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। সেই অবস্থায় তাহাকে বাড়িতে আনা হইল। লোকটি এই শরীরকে নাকি পূর্বে একবার দেখিয়াছিল। তাহাকে বাড়ি আনা হইলে সে এই শরীরকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দিনরাত্রই নাকি এই শরীরের নাম ধরিয়া ডাকিত। তাহার ইচ্ছা যে মৃত্যুর পূর্বে এ শরীরের সহিত তাহার একবার দেখা হয়। সে যে এ শরীরকে দেখিতে চায় তাহা কিন্তু তাহার ছেলে আসিয়া এই শরীরকে বলে নাই। একদিন তাহার স্ত্রী আসিয়া ওই কথা বলিল। কিন্তু তখন এ শরীরের অবস্থা এত খারাপ ছিল যাহার জন্য হরিবাবার প্রোগ্রামেও যাওয়া হইতেছিল না। উহাদিগকে দুই দিন ঘুরাইয়া শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাকে দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি যে তাহার মাথা এবং পেটের অবস্থা অতি বিকট, পুড়িয়া সব যেন চাপটা বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুখখানার ভাব বড় প্রশান্ত। আমি উহা পরমানন্দকে লক্ষ্য করিতে বলিয়াছিলাম। তারপর সচরাচর যাহা করা হয় তাহা করিলাম; অর্থাৎ তাহার মুখে বুকে হাত বুলাইয়া দিলাম। উহাদের কথায় তাহার মুখে একটু বাতাসাও দিলাম। সে আমার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না বলিয়া উহারা তাহাকে চশমা পরাইয়া দিল। তখন সে আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। বৃন্দাবন হইতে আসার দিন শুনিতে পাইলাম যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।'

রাত্রিতে বিশুদ্ধানন্দ কাননে গমন এবং সেইখানে কয়েকটি অলৌকিক দর্শনের কথা শ্রবণ

৪ঠা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ সন (ইং ১৭।৪।৫৬)

আজ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে বাসন্তী পূজা আরম্ভ হইয়াছে। আশ্রমের উৎসব সচরাচর যেইরূপ ধুমধামের সহিত হয় এইবারও তাহাই হইয়াছে। আমরা আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছি।

রাত্রিতে মৌনের পর মা আমাকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন, 'দাসু মোটর লইয়া আসিয়াছে কিনা দেখ। যদি না আসিয়া থাকে তবে তাহাকে গাড়ি লইয়া আসিতে বল।' আমি রাস্তায় গিয়া দেখিলাম যে গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। পরে

আশ্রমে ফিরিবার পথে দাসুর সহিত দেখা হইলে তাহাকে বলিলাম যে সে যেন গাড়িতে গিয়া অপেক্ষা করে। আমি মাকে লইয়া আসিতেছি। মাকে ওই সংবাদ দেওয়া মাত্রই মা রওনা হইলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহা কাহাকেও না বলিয়া বলিলেন, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসিতেছি।' কাহাকেও সঙ্গে আসিতে দিলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই সময় গোপীবাবা কোথায় থাকে?'

আমি। এই সময় তিনি বাড়িতেই থাকেন। গোপীবাবুর শরীর অসুস্থ নাকি?

মা। এরূপ কিছু তো শুনি নাই।

দাসু। কোথায় যাইব?

মা। তুই কিছু দূর চালাইয়া যা পরে বলা যাইবে।

কিছুদূর যাওয়া হইলে মা বলিলেন, 'বাবার (বাবা বিশুদ্ধানন্দের) আশ্রমে চল। গোপীবাবার আজ সেইখানে থাকার কথা ছিল। যদি তাহাকে ওইখানে না পাওয়া যায় তবে তাহার বাসায় খোঁজ করা যাইবে।

আমি।' গোপীবাবুর বাসা হইয়া আশ্রমে গেলেই হয়। তাহা হইলে তো কোনও গণ্ডগোল থাকে না।

মা। না, প্রথমে আশ্রমেই যাওয়া যাক, পরে দেখা যাইবে। আশ্রমের গেট বন্ধ হয় কখন?

আমি। সন্ধ্যার পর তো কেহ ওইখানে যায় না, তাই মনে হয় যে সন্ধ্যার পরেই গেট বন্ধ হইয়া যায়। তবে বন্ধ থাকিলেও উহা খোলা কষ্টকর হইবে না।

আমি ভাবিলাম এই সময় তো গোপীবাবুর আশ্রমে থাকিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, তবুও মা কেন আশ্রমে যাইতেছেন? আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমরা যখন আশ্রমের গেটে গিয়া পৌঁছাইলাম তখন দেখিতে পাইলাম যে গোপীবাবু সীতারাম সহ ওইখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনিও তখনই বাসা হইতে আশ্রমে আসিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি খুব আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে মা কেন গোপীবাবুর বাসায় না গিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। মা সাধারণ ব্যবহার করিতে এমনই অভ্যস্ত যে তাঁহার সর্বজ্ঞতা আমাদের নিকট কিছুই ধরা পড়ে না।

গোপীবাবু বিজ্ঞান মন্দিরের দরজা খুলিয়া দিতে আশ্রমস্থ লোকদিগকে আদেশ করিলেন। এ ই দিকে মা যেই মন্দিরে বাবার মর্মর মূর্তি ছিল সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দির বন্ধ ছিল। মা মন্দিরের কপাট দুইটি এমন ভাবে স্পর্শ করিলেন যাহা দেখিয়া আমার মনে হইল যে তিনি যেন বাবার বিগ্রহকেই স্পর্শ করিতেছেন। বিগ্রহ স্পর্শ করিতে যেমন বিগ্রহের গায়ে নিজের মস্তক স্থাপন করেন এইখানেও কপাটের উপর সেইরূপ করিয়াছিলেন। গোপীবাবু মন্দির খুলিয়া দিতে আদেশ করিলে মা নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'যখন শয়ন দেওয়া হইয়াছে তখন আর মন্দির খোলা ঠিক হইবে না।'

ওইখান হইতে আমরা বিজ্ঞান মন্দিরে গেলাম। এইখানে আসিয়াও মা বাবার তৈলচিত্রের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তৈলচিত্রটি ঢাকিয়া না রাখাতে উহাতে ধূলা পড়িয়াছে—ইহাই যেন দেখাইতে মা চিত্রটির সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার মনে হইল যে উহা উপলক্ষ মাত্র। বিগ্রহের গায়ে মাকে যেইভাবে হাত বুলাইতে দেখিয়াছি, এইখানেও মা সেইরূপ করিলেন।

মাকে আসন পাতিয়া দেওয়া হইল। ওই সময় আশ্রমে যাহারা যাহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আসিয়া মায়ের কাছে বসিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, 'এমন ভাবে এখানে আসা হইয়াছে যে অমূল্যও জানিতে পারে নাই যে কোথায় যাওয়া হইতেছে। এ শরীরের খেয়াল হইয়াছিল যে বাবাকে (অর্থাৎ গোপীবাবুকে) আশ্রমেই পাওয়া যাইবে। তাই বাবার বাসায় না গিয়া এখানেই আসা হইয়াছে। অল্প একটু সময় এখানে থাকা হইবে।

আমি গোপীবাবুকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম যে জ্যোতির্ময় বাবুর দর্শনের কথা তিনি মাকে বলিয়াছেন কিনা। গোপীবাবু বলিলেন যে উহা খুব সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, বিস্তার করিয়া বলা হয় নাই। আমি তাঁহাকে ওই ঘটনাটি বিস্তার করিয়া বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি মাকে ওই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, 'যদি তোমার স্বাভাবিক ভাবে কথাটা আসে তবে বলিতে পার। আর যদি ভিতর হইতে কোনও বাধা আসে তবে বলিও না।'

গোপীবাবু বলিলেন, 'বলিতে কোনও বাধা নাই। তবে যিনি দর্শন করিয়াছেন তাহার নাম প্রকাশ না করাই ভাল। অবশ্য একদিন তো উহা প্রকাশ হইয়া

যাইবেই।' * এই বলিয়া গোপীবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—'বাবার জন্মোৎসবের দিন যখন বাবার তৈলচিত্র উন্মোচন করা হয় সেই সময় বেদপাঠ হইতেছিল। আমাদের এক গুরুভ্রাতা বাবার তৈলচিত্রের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে বাবার ছবির চোখ হইতে এক জ্যোতিঃ বাহির হইয়া ঘরটিকে পীত বর্ণের আলোকে ছাইয়া ফেলিল। তখন ঘরে যাঁহারা ছিলেন তাহাদিগকে তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি শুধু দেখিতেছিলেন বাবার ছবিখানি আর ওই পীত আলো। কিছুক্ষণ পরে ওই আলোকের রং রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়া শেষে স্ফটিকের মতো শুভ্র বর্ণ ধারণ করিল। তারপর তিনি দেখিতে পাইলেন যে বাবার মূর্তি হইতে আর একটি মূর্তি বাহির হইল, তাঁহার তিনটি মস্তক। পরে আবার ওই মূর্তি বাবার মূর্তির সহিত মিশিয়া গেল। তারপর তিনি এক তেজস্বী যোগীকে দেখিতে পাইলেন। এই যোগীর তিনি যে বর্ণনা দিলেন তাহাতে মনে হয় যে ওই যোগী বোধ হয় ভৃগুরাম স্বামী ছিলেন। তিনিও বাবার মূর্তির সহিত মিলিয়া গেলেন। ইহার পর গুরু ভাইটি বাবার বিভিন্ন বয়সের মূর্তি দেখিতে পাইলেন। আমি সেইগুলি ঠিক ঠিক বর্ণনা করিতে পারিব না। আমি অবশ্য গুরুভ্রাতাটিকে দর্শনের ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছি। তিনি যদি উহা করেন তখন ঠিক ঠিক ভাবে বলিতে পারিব যে তিনি কী কী মূর্তি দেখিয়াছিলেন। প্রায় ১৫ মিনিট কাল তিনি এই সকল দর্শন করিয়াছিলেন। ওই অল্প সময়ের মধ্যে কত দীর্ঘ কালের ঘটনা তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছিল। ত্রিমুণ্ডধারী যে মূর্তি দেখা গিয়াছিল তাঁহাকে আমি দত্তাত্রেয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কারণ তিনি আদি গুরু কিনা—তাই গুরুমূর্তির সহিত মিশিয়া গেলেন।

'এই দর্শনের চার পাঁচ দিন পর গুরুভ্রাতাটি মাকে (শ্রীশ্রীমা) একদিন সকাল বেলা আশ্রমে দেখিতে পান। সেই সময় মা বৃন্দাবনে ছিলেন। মার সহিত তাঁহার কিছু কথাবার্তাও হইয়াছিল, উহা অবশ্য প্রকাশ করা যাইবে না। তবে মা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তাঁহার যাহা দর্শন হইয়াছে, উহা যথার্থ বটে।'

মা। (হাসিয়া) কত রকমেই যে তিনি নিজকে প্রকাশ করেন!

---

* এই ঘটনাটির দর্শক পরে নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। 'বিশুদ্ধ বাণী' ৫ম ভাগ, ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমি। মা, হোসিয়ারপুর শ্মশানে তোমার কী দর্শন হইয়াছিল?

মা। (হাসিয়া) কেমন করিয়া উহা তোমার কানে গেল? ওই ব্যাপারটা এই মাত্র খেয়াল আসাতেই আমি বলিয়াছি—'কত রকমেই যে তিনি নিজকে প্রকাশ করেন!' সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ওই ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে।

এবার পরমানন্দের আগ্রহেই অনিল প্রভৃতিকে লইয়া হোসিয়ারপুরের শ্মশান দেখিতে যাওয়া হইয়াছিল। ইহার পূর্বেও একবার আমি ওই শ্মশান দেখিয়াছি। সেবার হরিবাবা এবং অখণ্ডানন্দজী প্রভৃতি এ শরীরকে শ্মশান দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। ওই শ্মশান একটি দেখিবার মতো স্থান। ওই স্থানটা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ওইখানে এত ফল ফুলের বাগান যে উহা দেখিলে উহাকে শ্মশান বলিয়াই মনে হয় না। তাহা ছাড়া ওইখানে প্রকাণ্ড একটি হল ঘর আছে এবং সেখানে সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো আছে—কোনওটা সাবিত্রী সত্যবানের, কোনওটা রামসীতার এইরূপ। শবদাহ শেষ হইয়া গেলে যেসকল ভস্ম এবং হাড়ের টুকরা পড়িয়া থাকে সেগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করিয়া রাখা হয়। ওইগুলি ফুল ফল গাছের সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিনা তাহা বলিতে পারি না। শুনিতে পাইয়াছিলাম যেখানে মৃত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয় সেইখানে নাকি আবার খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। এইরূপ করা কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

'যাহা হউক আমরা বেশিক্ষণ শ্মশানে ছিলাম না কারণ হরিবাবার প্রোগ্রাম ছিল বলিয়া আমাদিগকে সকাল সকাল ফিরিতে হইয়াছিল। কিন্তু শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে এই শরীরের ভয়ানক সর্দি লাগিয়াছে, এমনকী শ্বাস গ্রহণ করিতেও কষ্টবোধ হইতেছে এবং বুকের মধ্যেও একটা চাপা ব্যথা। যে বাড়িতে এই শরীরকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল উহা নূতন তৈয়ারি বলিয়া ঘরটি ঠান্ডা ছিল। পাঞ্জাবে তখন পর্যন্ত গরম পড়ে নাই। আমি উহাদিগকে বলিলাম, 'আমি আর ঘরের ভিতর শুইব না। আমার শুইবার জায়গা বারান্দায় করিয়া দাও।' তাহাই করা হইল। রাত্রিতে শুইয়া আমি তখন দেখিতেছি কী যে ওই শ্মশান হইতে একটা দৃষ্টি আসিয়া আশ্রমের কূয়ার উপর পড়িতেছে। ওই কূয়াটি যেখানে তৈয়ার করা হইয়াছে ওইখানেই সৎসঙ্গ বসে। বালক, বৃদ্ধ,

সকল বয়সের হাজার হাজার লোক ওই সৎসঙ্গে যোগদান করে। কূয়ার পারও বেশি উঁচু নয়। ওইখানকার হট্টগোলে যে কোনও লোক ওই কূয়াতে পড়িয়া যাইতে পারে এবং পড়িয়া গেলে হয়তো উহা কেহ জানিতেও পারিবে না, কারণ ওইখানে এত ভিড় থাকে যে ভিড়ের মধ্যে কিছু হইয়া গেলে কাহারও জানিবার কথা নয়। কূয়ার উপর ওই শ্মশানের দৃষ্টি পড়ার অর্থই হইল যে ওই কূয়ার ভিতর যে পড়িবে তাহারই জীবন শেষ হইবে। আর দেখিতেছি কী একটি ছেলে যেন জলে পড়িয়া মরিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার মৃতদেহটা যেন এই চোখের সামনে জ্বল জ্বল করিয়া ভাসিতেছে। ওই দৃশ্য দেখিয়া আমি উদাসকে ডাকিলাম। তখন সে-ই আমার কাছে ছিল। তাহাকে বলিলাম, 'কাল সকাল হইতে তুই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রটি ১০।১২ হাজার বার জপ করিস্। একদিনেই যে জপ শেষ করিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। রোজ কিছু কিছু করিলেই চলিবে। আমার খেয়াল হইয়াছিল যে জপটা কিছু না খাইয়া করিলেই ভাল হয়, কিন্তু উদাসকে ওই সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। পরে তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে সে ওই জপ রোজই আহারের পূর্বে করিয়াছে। এই জপ শেষ হইতে তাহার ৬।৭ দিন লাগিয়াছিল। যাহা হউক যেদিন তাহার জপ শেষ হয় তাহার পরদিনই আমাদের হোসিয়ারপুর ত্যাগ করিবার কথা হয়।

এদিকে হরিবাবা হোসিয়ারপুরে যে কীর্তন হল এবং ঘর বাড়ি তৈয়ার করিয়াছিল তাহাতে ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ওই টাকার বেশির ভাগই বাহির হইতে আসিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা যত টাকা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল তাহা তাহারা দেয় নাই। এইজন্য হরিবাবা অসন্তুষ্ট। অবশ্য বাহিরের লোকেরাও বাকি টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু হরিবাবার ইচ্ছা তাহা নয়। সে চায় যে লোকেরা তাহাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুক। এই ব্যাপার লইয়া হরিবাবা এবং তাহার গুরু ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। ইহা দেখিয়া আমি পরমানন্দকে বলিয়াছিলাম সে কোথাও হইতে এক হাজার টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিক; কারণ আমরা তো আর টাকা পয়সা সঙ্গে করিয়া হোসিয়ারপুর গিয়াছিলাম না। সে তাহাই করিল। কিন্তু ওই টাকা হরিবাবা

গ্রহণ করিল না। কাজেই যাহাদের নিকট হইতে টাকা ধার করা হইয়াছিল, তাহাদের উহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

হোসিয়ারপুর হইতে রওনা হইবার পূর্বের দিন রাত্রিতে বারান্দায় শুইয়া তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—'ওই টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া দাও'—এই কথাটি দুইবার শুনিলাম। পরদিন হোসিয়ারপুর হইতে বিদায় হইবার সময় হরিবাবা, অবধূতজী এবং আমি সৎসঙ্গের জায়গায় বসিয়া আছি তখন আমি হরিবাবাকে ওই বাণীর কথা বলিলাম, শুনিয়া হরিবাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,. 'এই বাণী কি আপনি আপনার ভিতরে শুনিয়াছেন না বাহিরে শুনিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'না, ইহা ভিতরের বাণী নয়, বাহিরের বাণী।' তখন সে অবধূতজী কে ডাকিয়া ওই বাণীর কথা বলিল। অবধূতজী বলিল, 'বেশ তো টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিলেই চলিবে।' তখনই পরমানন্দকে বলিয়া এক ডাক্তারের নিকট হইতে এক হাজার টাকা ধার করিয়া উহাদিগকে দিয়া আসা হইল।'

আমি। মা, তুমি যে একটি ছেলের মৃতদেহ দেখিয়াছিলে তাহার কী হইল?

গোপীবাবু। সে ছেলেটিকে আর জলে ডুবিয়া মরিতে হইল না।

মা। যে ছেলেটির ওইরূপ মৃত্যু লেখা ছিল তাহাকে অন্য গতি দেওয়া হইল। হয়তো সে আর ওইভাবে না মরিয়া অন্য কোনও রোগে মরিয়া যাইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে ওই ছেলেটির ওই ভোগটুকু মাত্র বাকি ছিল তাহা সে যেকোনও ভাবে ভুগিয়া অন্যগতি পাইতে পারে। অনেকে হয়তো সামান্য ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু এমনও হইতে পারে তাহাকে জন্ম গ্রহণ না করিতে দিয়া মর্ত্য হইতেই অন্যগতি দিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে স্থিতির কথা বলা হইতেছে সেখানে যে সবই সম্ভব। কারণ সেখানে যে নিজকে লইয়া খেলা হইতেছে। অপর বলিয়া তো কিছু নাই।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১০।। টা বাজিল। মা কিছুক্ষণ গোপীবাবুর সহিত আলাপ করিলেন। পরে আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

জাতি বর্ণ নির্বিশেষে মায়ের প্রসাদ বিতরণ

৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯।৪।৫৬)

আজ বাসন্তী পূজার নবমী তিথি। পূজান্তে মা আজ সকলকে ফল এবং

মিষ্টি প্রসাদ বিতরণ করিলেন। পরে ভোগ হইয়া গেলে আমরা যখন প্রসাদ পাইতে বসিলাম তখনও আবার মা আসিয়া আমাদিগকে খিচুরি প্রসাদ দিলেন। মা বলিলেন, 'যজ্ঞের আগুনে সমস্ত রান্না হইয়াছে কাজেই এগুলি মহাপ্রসাদ।' কেবল যে মা আজ আমাদিগকেই প্রসাদ দিলেন তাহা নহে, আশ্রমে যাহারা উপস্থিত ছিল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করিলেন। কাহাকেও কাহাকেও মা ওই প্রসাদ খাওয়াইয়াও দিয়াছিলেন। কাশীর আশ্রমে জাতিভেদ এবং শুদ্ধাচার খুব ভালভাবেই মানা হয়। সেই আশ্রমকে মা আজ শ্রীক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। যেই পাত্র হইতে মা মিস্ ব্ল্যাঙ্কাকে (আত্মানন্দ) প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, সেই পাত্র হইতেই আবার ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের সকলকেই খাওয়াইয়া দিলেন। যাচিয়া যাচিয়া মা এই প্রসাদ বিতরণ করিলেন। দেখিয়া মনে হইল মা যেন আজ কৃপার প্লাবনে সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। এইবারের বাসন্তী পূজার ইহাই বিশেষত্ব। মার কাছে আরও শুনিয়াছিলাম যে অষ্টমীর দিন সন্ধি পূজার সময় দেবীর মূর্তি জ্বল জ্বল করিয়া উঠিয়াছিল। মা বলিয়াছিলেন, 'যদিও চণ্ডীমণ্ডপের ইলেকট্রিক লাইটের জন্যই বোধহয় ওইরূপ হইয়াছিল কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যাইতেছিল যে দেবীর কপাল হইতেই যেন উজ্জ্বল আলো বাহির হইয়া আসিতেছে। সমস্ত বিগ্রহের মূর্তিই যেন ঝক ঝক করিতেছিল।'

১১ই বৈশাখ, মঙ্গলবার (ইং ২৪। ৪। ৫৬)

আজ কয়েকদিন যাবৎ বেলা ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত মা চণ্ডীমণ্ডপে বসিতেছেন। ওইখানে পাঠ এবং কীর্তনাদি হয়। প্রশ্নকর্তার অভাবে মায়ের কথা বিশেষ কিছু শুনা যাইতেছে না। আজ হরিদাসবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি যে বল, মনের ময়লা পরিষ্কার করা দরকার, আমরা তো দেখিতেছি যে চেষ্টা করিয়া মনের ময়লা পরিষ্কার করিলেও কিছুক্ষণ পরে উহা আবার পূর্ববৎ আবর্জনা পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা রোধ করিবার উপায় কী?

মা। ময়লার দিকে না যাওয়াই হইল উপায়।

হরিদাস বাবু। দেখিতেছি তোমার কৃপা ছাড়া কিছুই হইবার উপায় নাই। তুমি মনকে পরিষ্কার করিয়া না দিলে উহা পরিষ্কার হইবার নয়।

মা। তুমি দেখি জ্ঞানী হইয়া বসিয়াছ। (সকলের হাস্য)। তুমি যদি আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে ওইকথা না বলিয়া থাক তবে বলিতে হইবে তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। অন্তত এক কাজ করিও—যখন দেখিবে যে নিজে ইচ্ছা করিয়া নিজের গায়ের ময়লা মাখিতেছ, তখন স্মরণ করিও যে তিনিই আমাকে পরিষ্কার করিয়া দিলেন। গায়ে ময়লা মাখিবার সময় ইহা স্মরণ করা চাই। অন্য সময়ে উহা মনে করিলে চলিবে না। যদি নিজের ভোগের জন্য, সুখের জন্য তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া ময়লা মাখিতে থাক তবে কিন্তু উহা নিজেই পরিষ্কার করিতে হইবে।

হীরু। কেন? ছেলেরা যখন গায়ে মাটি কাদা মাখে তখন তো তাহারা মনে করে না যে মা-ই তাহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দিবেন। অথচ মা-ই তাহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দেন।

মা। তা' যদি বলিস তবে বলিব তোরা যে জাতীয় প্রশ্ন করিস তারা কি সে জাতীয় প্রশ্ন করে? (সকলের হাস্য)। ছোট শিশুরা কেবল যে গায়ে বিষ্ঠা মাখে তাহা নয়, তাহারা উহা মুখের মধ্যেও পুরিয়া দেয়। এজন্য তাহাদের মধ্যে কোনও বিকার বা বমির ভাব হয় না। তোরা কি ওইরূপ করিতে পারিবি? বিষ্ঠার নামেই যে তোদের বমি হয়। (সকলের হাস্য)

'শিশু হইতে পারিলে তো কোনও চিন্তার কারণই নাই। তাহা যখন হইতে দেখা যায় না তখন স্বকর্ম দ্বারাই নিজেকে পরিষ্কার করিতে হইবে। তোমরা সংসারের সকল কর্ম করিতে পার সেখানে তোমাদের শক্তির অভাব হয় না। রাগ, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি সবই তোমাদের মধ্যে প্রকাশ হইতে পারে। এসব বিষয়ে তোমাদের কোনও আলস্য বা অবসাদ দেখা যায় না। যত আলস্য এবং অবসাদ ভগবানের নাম করার বেলায়। কিন্তু জাগতিক যে সকল কর্ম কর উহা তো কর্ম নয়—অকর্ম। উহাতে মনের ময়লা কাটে না। ময়লা দূর করিতে হইলে স্ব-কর্ম করা দরকার। স্ব কর্ম কী? না, গুরু যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন উহা করাই হইল প্রকৃত কর্ম। ওইভাবে সর্বক্ষণ স্বক্রিয় হইতে পারিলেই নিষ্ক্রিয় হওয়া যায় অর্থাৎ কর্মের উর্ধ্বে উঠা যায়। অবশ্য সকলেই নিয়ম মতো নাম জপাদি করিতে পারে না। মাঝে মাঝে কর্তব্যে অবহেলা করা হয়, পদস্খলন হয়; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইতে নাই। আছাড় খাইলে লোকে

যেমন মাটি ধরিয়াই উঠে, সেইরূপ এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে হয়। ঔষধ যেমন জোর করিয়াই খাইতে হয় সেইরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুর নির্দেশ মতো কাজ করিয়া যাইতে হয়। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে ক্রিয়া শক্তির বিকাশ হয়। এই শক্তির বিকাশ হইলেই ক্রিয়া কী, আমি কে এবং কোথা হইতে আসিলাম এ সমস্তই প্রকাশ হইয়া যায়। আবার বৃক্ষ, লতা, মাটি—সর্বরূপেই একমাত্র তিনি বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া যদি তৎজ্ঞানে সর্বজীবের সেবা অখণ্ডভাবে করা যায় তবে সেই অখণ্ডের প্রকাশ না হইয়া যায় না।

১২ই বৈশাখ, বুধবার (ইং ২৫।৪।৫৬)

আজ বিকালে বিজয়ানন্দ (ফরাসি ডাক্তার) বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া মাকে প্রণাম করিলে মা তাঁহার আলখাল্লাটা পিঠের দিকে ছেঁড়া দেখিয়া তাহাকে কাছে আসিতে বলিলেন। বিজয়ানন্দ কাছে গেলে মা ওই জামাটার ছেঁড়া জায়গায় আঙুল ঢুকাইয়া টান দিয়া আরও বেশি ছিঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমার কি আর জামা নাই? যাও এখন গায়ে কাপড় জড়াইয়া থাক।' আমাদিগকে বলিলেন, 'দেখ, লোকের জামা কাপড়ের উপর কেমন আসক্তি। উহা ফাটিয়া ছিঁড়িয়া গেলেও উহা ত্যাগ করে না।'

পূর্বেও দেখিয়াছি মা ছেঁড়া জামা কাপড় পরা পছন্দ করেন না। আমাদের দেশের প্রবাদও এই যে পুরুষ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরিলে তাহার দারিদ্র ঘুচে না। যাহা হউক বিজয়ানন্দের জামা ছিঁড়িয়া মা মিস ব্ল্যাঙ্কাকে (আত্মানন্দ) বলিলেন, 'তুমি বুনী বা কারুর কাছে খোঁজ করিয়া দেখ তো একটা রঙিন আলখাল্লা আছে উহা আনিতে পার কিনা।' একটু পরে মিস ব্ল্যাঙ্কা খয়েরি রং এর কাপড়ের একটা আলখাল্লা আনিয়া মাকে দিলে মা উহা বিজয়ানন্দকে দিলেন। দেখা গেল যে উহা বিজয়ানন্দের গায়ে ভালভাবে লাগিয়াছে। বিজয়ানন্দ জামা পরিয়া মাকে প্রণাম করিল। মা বলিলেন, 'এই জামার কাপড় ৪।৫ বৎসর পূর্বে এই শরীরকে দেওয়া হইয়াছিল। ওই কাপড় দিয়া উহাদিগকে একটা আলখাল্লা তৈয়ার করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছিল। এতদিন উহা কোনও এক গুহায় পড়িয়াছিল। ইদানীং ইহাকে ধোপাবাড়ি দিয়া ধোয়াইয়া আনা হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় গোপীবাবু মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মৌনের পর গোপীবাবুকে লইয়া মার ঘরে যাইতে আমার উপর আদেশ হইল। মার কাছে গেলে নানা কথার মধ্যে গোপীবাবু মাকে বলিলেন, 'দীনেশ ভট্টাচার্যের নিকট সীতারাম ওঁকার নাথের অনেক কথা শুনিলাম। তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া অনেকেই নাকি বংশী ধ্বনি শুনিতে পায় এবং সীতারামদাসজীকে নানা স্থানে স্থূলভাবে দেখিতে পায় যেমন তাঁহার কোনও শিষ্য পরীক্ষা দিতে বসিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা মাত্রই তিনি তাহার নিকট স্থূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সীতারামদাসজীকে ওই সকল কথা বলা হইলে তিনি বলেন যে ওই সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। এইরূপ হয় কেমন করিয়া? তাঁহাকেই সকলে দেখিতেছে অথচ তিনি নিজে উহা জানিতে পারেন না। কেবল সীতারামদাসজীর বেলায়ই যে এইরূপ কথা শুনা যাইতেছে তাহা নয়, অন্যান্য লোকের বেলায়ও এইরূপ শুনা গিয়াছে।'

মা। কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া বলা যাইতে পারে যে যখন বলা হইতেছে যে 'ওই দর্শন সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না' তখন বুঝিতে হইবে যে আবরণ এখনও কাটে নাই। যখন সমস্ত আবরণ কাটিয়া যাইবে তখন অজানা তো কিছু থাকিবে না।

'আবার অনেক সময় এরূপ হয় যে সমস্ত গ্রন্থি মুক্ত হয় নাই। কিছু কিছু মুক্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় কেহ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার ভিতরের ভাবগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় ও বলা যায়।

'আবার এমনও হইতে পারে যে, কেহ সাধকের নিকটে দাঁড়াইলে তাহার নিকট হইতে এমন একটি আঘাত সাধকের উপর আসিয়া পড়ে যাহার ফলে হয়তো সাধকের মুখ দিয়া কোনও কথা আপনা আপনি বাহির হইয়া যায় যে সম্বন্ধে সে পূর্বে কিছুই জানে না এবং যাহাকে উপলক্ষ করিয়া কথাগুলি বাহির হয় সেও উহা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করে। কারণ ওইগুলি হইল তাহার মনের ভাব এবং সংশয় যাহা প্রকাশ করিতেই সে সাধকের কাছে আসিয়াছিল। আবার সাধকও তাহার ওই শক্তির প্রকাশ দেখিয়া আনন্দ পায়। অবশ্য শক্তির এইরূপ প্রকাশ দেখিয়া সাধক কতদিন আনন্দলাভ করিবে তাহা বলা যায় না। তবে

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানেও কিন্তু আবরণের ভিতর দিয়াই শক্তির প্রকাশ হইতেছে। পরে যখন তাহার সমস্ত গ্রন্থি মোচন হয় তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে নিজকে লইয়াই খেলা করিতেছে।

১৩ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার (ইং ২৬। ৪। ৫৬)

আজ বেলা ১০টায় মা চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলে শঙ্করানন্দ স্বামীজী মাকে বলিলেন, 'অনেক দিন পূর্বে ভাইজী এবং আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার উত্তর এখনও পাই নাই।'

মা। কী প্রশ্ন করিয়াছিলে?

শঙ্করানন্দ স্বামীজী। তুমি জগতে কেন আসিয়াছ?

মা। (হাসিয়া) আমি ছিলাম না কখন যে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন আসিয়াছি? আমি ছিলাম, আছি এবং থাকিব এগুলি সবই এক সময়ে সত্য।

স্বামীজী। পূর্বে ওই প্রশ্ন করিলে তুমি বলিতে, 'তোমরা দেখিয়া যাও।'

মা। (হাসিয়া) হাঁ, তখন যদি বলিতাম, 'আমি নাই কখন?' তাহা হইলে তোমরা চমকিয়া উঠিতে এবং ভাবিতে, 'এ বলে কী?' সেইজন্য বোধহয় এখন যাহা বলা হইয়া যাইতেছে সে জাতীয় কথা তখন মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তোমাদিগকে সহাইয়া সহাইয়া এখন এ জাতীয় কথা বাহির হইতেছে।

আমি। মা, যাহা আছে তাহারও তো আবার প্রকাশ হয়?

মা। হাঁ, যাহা আছে তাহা যেমন আবার প্রকাশ হয় সেইরূপ যাহা নাই তাহারও প্রকাশ হয়।

আমি। যাহা নাই তাহার আবার প্রকাশ একথা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

মা। ওই কথার অর্থ এই যে 'নাই' রূপেও তো তাঁহারই প্রকাশ। আচ্ছা, তুমি কী বলিতেছিলে?

আমি। যিনি নিত্য আছেন তাঁহারও প্রকাশ হয়। এই প্রকাশের কারণ কী?

মা। তাঁহার মৌজ, খেয়াল।

আমি। ভগবানের যখন আবির্ভাব হয় তখন শাস্ত্রে উহার একটা না একটা

কারণ বলা হয়। ভগবানের খেয়ালের জন্য যে তাঁহার আবির্ভাব হয় একথা শাস্ত্রে আছে বলিয়া শুনি নাই।

মা। ভগবানকে যে খেয়ালী বলা হয় তাহা তো প্রসিদ্ধ। তাই আমি বলিতেছি যে তিনি নিজের খেয়াল বশেই আবির্ভূত হন। এখন তোমরা এই খেয়ালের অর্থ এক এক জনে এক এক ভাবে নিতে পার।

শঙ্করানন্দ স্বামীজীও আমার কথায় সায় দিয়া বলিতে লাগিলেন যে ভগবান যখন আবির্ভূত হন তাহার কারণ শাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে। সাধুদের রক্ষা, দুর্জনের নাশ ইত্যাদি ভগবানের আবির্ভাবের কারণ।

মা। তোমরা যে কারণ বলিতেছ এই কারণ কে বলিবে? কাহাকে বলিবে? এ সম্বন্ধে বাস্তবিক তোমাদের প্রশ্ন আছে কী? যদি কাহারও প্রশ্ন থাকে, তবে সে উঠিয়া দাঁড়াও দেখি।

মা কথাগুলি খুব দৃঢ়তার সহিত বলিলেন। মার কথা শুনিয়া কেহই দণ্ডায়মান হইলেন না। সকলেই ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। মায়ের আবির্ভাবের কারণ জানিতে আমরা যে কেহই অধিকারী নহি, মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধিৎসা যে একেবারেই শূন্যগর্ভ এবং অবসর বিনোদনের একটা উপলক্ষ মাত্র উহাই যেন মা আজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

১৭ই বৈশাখ, সোমবার (ইং ৩০। ৪। ৫৬)

গতকল্য সকালে দেবশঙ্করবাবু মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি মায়ের সহিত কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যে সকল মহাত্মা স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা লোকদিগকে উপদেশ দিতে একটু নীচে নামিয়া আসিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। স্বরূপ জ্ঞানে স্থিত থাকিয়া উপদেশ দিতে পারেন না কারণ ওই অদ্বৈত স্থিতিতে কে কাহাকে উপদেশ দিবে? শাস্ত্রের মতানুসারে জীবের স্বরূপ জ্ঞান হইলেও একটু অবিদ্যার লেশ থাকিয়া যায়। উহা থাকে বলিয়াই তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষা দীক্ষা উপদেশাদি হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে মা বলিয়াছিলেন যে যাহার দ্বৈতভাব আছে, সে সাধক মাত্র। তাহার উপদেশ দিবার কোনও অধিকার নাই।

গতকল্য বিকালবেলা মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'সাধক কি উপদেশ দিতে পারে?' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'উপদেশ তো সাধকই দিয়া থাকে।' আজ সকালবেলা মা ওই কথা তুলিয়া আমাকে বলিলেন, 'যে সাধক, যাহার আবরণ কাটে নাই, সে কি তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারে?'

আমি। না।

মা। কাল তুমি বলিয়াছিলে যে উপদেশ তো সাধকই দিয়া থাকে। ওই কথা আমার কানে এখনও বাজিতেছে।

আমি। আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল যে আজকাল যাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই তো সাধক।

মা। 'আজকাল' কথাটা কাল তুমি বল নাই।

আমি। আমি না বলিলেও আমার মধ্যে যাহা আছে তাহা যে তোমার অবিদিত নয় একথা আমি বিশ্বাস করি বলিয়াই অনেক সময় সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলি না।

আমার কথা শুনিয়া মা হাসিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, 'গতকল্য অবিদ্যালেশের কথা হইতে ছিল না? সাধক সাধন করিতে করিতে স্বরূপ জ্ঞানের আভাস পাইয়া দেখিতে পায় যে, সে যে জ্ঞান বা আনন্দলাভ করিয়াছে উহা অপরে তখনও লাভ করিতে পারে নাই, যদিও যাহাদিগকে অপর বলা হইল উহারা সে নিজেই। সে নিজেই বহুরূপে, অনন্তরূপে আছে, উহাদের মধ্যে অনেকেরই স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় নাই। এই সময় তাহার যদি ওই স্বরূপ জ্ঞান উপদেশ করিবার ইচ্ছা হয় এবং উহা করিতে গিয়া যদি গুরুশিষ্য সম্বন্ধ মানিয়া লয় তবেই অবিদ্যালেশের কথা আসে। কিন্তু স্বভাবে স্থিত থাকিয়াও উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। এখানে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ বা দ্বৈত ভাব মানামানির কোনও প্রশ্ন নাই। ইহা কেমন? না, গাছে ফল পাকিয়া ঝরিয়া পড়ার মতো। জঙ্গলে কত ফলের গাছ আছে, উহা হইতে ফল পাকিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়ে। মাটির সংযোগে আসিয়া ওই ঝরা ফল হইতে কালক্রমে পুনরায় গাছ উঠে। এইভাবে কত গাছই না হইতেছে। ইহা সমস্তই স্বভাব হইতে হইয়া যাইতেছে এবং ইহা হইতে প্রমাণও হইতেছে—যাহা ফলরূপে গাছের আগায় আছে উহাই আবার

বীজরূপে মাটির নীচে থাকিয়া নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে। সেইরূপ যাঁহারা স্বরূপে বা স্বভাবে স্থিত তাঁহারাও উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা গাছ হইতে পাকা ফল ঝরিয়া পড়ার মতো স্বভাব হইতে হইয়া যায় এবং ওই উপদেশ লাভ করিয়া অজ্ঞানীও জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু যিনি উপদেশ দিতেছেন তাঁহার মধ্যে কোনও দ্বৈত বুদ্ধি বা ভাব নাই। এখানে অবিদ্যালেশের কোনও প্রশ্নই নাই।

'সাধক উপদেশ দিতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সাধকের স্থিতি অনুসারে ইহাও নানারূপ হইতে পারে। সাধকের দৃষ্টি পরম লক্ষ্যে এমনভাবে স্থিত থাকিতে পারে যে তাহার দ্বারা কোনও উপদেশই হয় না। সে মনে করে, 'আমি উপদেশ দেওয়ার কে?' তাহার মধ্যে দীনভাব এমনি প্রবল যে তাহার মনেই হয় না যে তাহার উপদেশ দিবার কোনও যোগ্যতা আছে।

'আবার এমনও হইতে পারে যে সাধক সাধন করিয়া কিছু লাভ করিলে উহা অপরের মধ্যে বিলাইয়া দিবারও ইচ্ছা হয়। সে মনে করে—'আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি উহা অপরে লাভ করুক।' ওই বাসনা হইতে সে অপরকে বলে যে তাহারা যদি এইরূপ করে তবে তাহারাও এই আনন্দ পাইবে। এখানেও কিন্তু গুরু সাজিবার বা শিষ্য করিবার কোনও বাসনা নাই। এখানে আনন্দ বিলাইয়া দেওয়াই হইল একমাত্র উদ্দেশ্য।

'আবার স্থিতি অনুসারে গুরুভাবও জাগিয়া উঠে এবং ওই ভাব হইতে উপদেশ দিতে গিয়া সে আবদ্ধ হইয়াও যাইতে পারে। এখানে অহং ভাবটা প্রবল বলিয়াই আবদ্ধ হইবার এবং পতনের নানা আশঙ্কা থাকে।

'আমি নানাভাবেই কথাটা বলিলাম। সাধকেরা উপদেশ দিতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে তোমরা যাহা বলিয়াছ উহাও তোমাদের স্থিতি অনুসারে সত্য।'

আমি। এই যে বিভিন্ন স্থিতির কথা বলিলে ইহার মধ্যে জগৎ গুরুর স্থান কোথায়?

মা। আমি যাহা বলিয়াছি উহাতে জগৎগুরুর স্থিতি সম্বন্ধে কিন্তু কিছু বলা হয় নাই।

এই সময় কোনও কারণে মাকে ডাকিয়া নীচে লইয়া যাওয়া হইল।

মায়ের ষষ্ঠিতম জয়ন্তী উৎসব

১৩৬৩ সনের ১৯শে বৈশাখ মা একষষ্ঠিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। সেইজন্য এইবার মায়ের ষষ্ঠিতম জয়ন্তী উৎসব এবং একষষ্ঠিতম জন্মোৎসব এক সঙ্গেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব ১৯শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়াছে। ইহা যেমন দীর্ঘকাল ব্যাপী তেমনই অনুষ্ঠান বহুল।

এই জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে যেই সকল অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

১) পূজা এবং হোমাদি অনুষ্ঠান
২) মহাত্মা হরিবাবার কর্মসূচি
৩) সৎসঙ্গ বা ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা
৪) নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান
৫) সাধু, ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র সেবা

উৎসবের যাবতীয় অনুষ্ঠান দুইস্থানে নিষ্পন্ন হইয়াছে—আশ্রমে এবং আশ্রমের বহির্ভাগে সভামণ্ডপে। পূজা হোমাদি এবং সাধু, ব্রাহ্মণ দরিদ্র সেবাদি আশ্রমে হইয়াছে, সৎসঙ্গ এবং সঙ্গীতাদি হইয়াছে নিকটস্থ সভামণ্ডপে।

আশ্রমের সন্নিকটে ৫।৬ বিঘা পতিত জমি ছিল। * এই জমিকে পরিষ্কার এবং সমতল করিয়া এখানে একটি প্রকাণ্ড প্যান্ডেল বা সভামণ্ডপ করা হইয়াছে যাহা উত্তর দক্ষিণে ১৩০ হাত দীর্ঘ এবং পূর্ব পশ্চিমে ৯০ হাত প্রশস্ত। সভামণ্ডপের মুখ্য প্রবেশ দ্বার দক্ষিণ দিকে ছিল এবং উত্তর দিকে একটি প্রশস্ত বেদি করা হইয়াছিল যেইখানে বসিয়া সাধু মহাত্মারা বক্তৃতা দিতেন এবং গায়কেরা সঙ্গীতাদি করিতেন। মণ্ডপের চারিদিকেই ইঁটের প্রাচীর ছিল এবং উহার উপরে খস্‌খসের পরদা টাঙানো থাকিত যাহা সর্বদাই জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা হইত। মণ্ডপে বৈদ্যুতিক আলো এবং পাখার বন্দোবস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে করা হইয়াছিল। সেইজন্য এইখানে শত শত লোক সমবেত হইলেও কাহাকেও গরমে কষ্ট পাইতে হয় নাই। তাহা ছাড়া সভামণ্ডপের চতুর্দিকের প্রাঙ্গণটি দুই বেলা জল দিয়া ভিজাইয়া

* বর্তমানে এই ভূমির উপরই 'মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়' অবস্থিত।

শ্রীশ্রীমার হীরক জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে সিংহবাহিনী বিশিষ্ট আসনে উপবিষ্টা শ্রীশ্রীমা

হীরক জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমার তুলাদান উৎসবের দৃশ্য

রাখা হইত। সেইজন্য উৎসব প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে মনে হইত যে, এ যেন এক নূতন রাজ্যে আসা হইয়াছে যেইখানে মার্তন্ডদেবের প্রবল প্রতাপও প্রতিহত।

সভামণ্ডপ হইতে কিছুদূরে ছোট ছোট কয়েকটি দোকান ঘর (Stall) করা হইয়াছিল যাহার একটিতে মায়ের ফটো এবং পুস্তকাদি, দ্বিতীয়টিতে কন্যাপীঠের কুমারীদের দ্বারা প্রস্তুত জিনিসপত্র বিক্রীত হইত। তৃতীয় ঘরটিতে আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য কিছু ঔষধপত্র এবং ডাক্তার থাকিতেন। ইহা আবার অফিস ঘর হিসাবেও ব্যবহৃত হইত। লোকে উৎসব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি এইখান হইতে সংগ্রহ করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি তাঁবুও ফেলা হইয়াছিল, যাহার একটিতে অগ্নি নির্বাপণকারীর দল (Fire brigade) যন্ত্রপাতি সহ সর্বদা অবস্থান করিতেন এবং অন্য একটি তাঁবুতে স্বেচ্ছাসেবক দল উৎসবে যোগদানকারীদের জুতা ইত্যাদি রক্ষা করিতেন।

সভামণ্ডপের ভিতরে ও বাহিরে কতকগুলি মাইক বসানো হইয়াছিল, যাহার ফলে সর্ব সাধারণ সভামণ্ডপের বাহিরে থাকিয়াও বক্তৃতা এবং সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতে পারিতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই সভামণ্ডপের পরিকল্পনা এবং নির্মাণ কার্য বিরাটভাবেই হইয়াছিল এবং ইহার জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পী বোম্বাই হইতে আসিয়াছিলেন। শুনিতে পাইলাম যে ইহা নির্মাণ করিতে ১১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহ মহাশয় ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

জয়ন্তী উপলক্ষে যেই সকল শুভানুষ্ঠান আশ্রমে হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) পূজা এবং হোমাদি অনুষ্ঠান

রাম অর্চ্চা এবং শিব অর্চনা

(ক) রাম অর্চ্চা হইল শ্রীরামের পূজা এবং মাহাত্ম্য পাঠ। ইহা হরিবাবার ইচ্ছানুসারে হইয়াছিল এবং ইহা উৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

শিব অর্চনায় যজুর্বেদীয় বিধি অনুসারে শিব পূজা এবং মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করা হইত। আশ্রমের ব্রহ্মচারী ব্যতীত বাহিরের লোকও ইহাতে যোগদান করিয়াছিল।

খ) সহস্র চণ্ডীপাঠ— ১৯শে বৈশাখ হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (2nd May to 27th May) সাধারণ এবং সম্পুটিত চণ্ডীপাঠ ও যজ্ঞ। ইহা মাতৃমণ্ডপে করা হইয়াছিল। চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে একটি দুই ভরি ওজনের সোনার চণ্ডীদেবীর মূর্তি তৈয়ার করিয়া উঁহাকে ছত্র সমন্বিত এক রৌপ্য আসনে বসাইয়া পূজা করা হয়। পূজাতে দেবীকে কয়েকপদ স্বর্ণালঙ্কার, রেশমের শাড়ি, জামা ইত্যাদি এবং রূপার থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ, রেকাব ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। ২৫ জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ দুইবার করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেন। যতদিন চণ্ডীপাঠ চলিতেছিল ততদিন প্রত্যহ তিনটি কুমারী এবং একজন বটুককে ভোজন করানো হইয়াছে। এই চণ্ডীপাঠ শেষ হইলে ইহার জন্য পাঁচদিন যজ্ঞ করা হয়।

এই চণ্ডীপাঠের সময় একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। উৎসব আরম্ভ হওয়ার তিন চার দিন পরে যোগীভাই (সোলনের রাজা সাহেব) কাশীর আশ্রমে আসেন। তিনি একদিন মাতৃমণ্ডপের নিকট দিয়া সভামণ্ডপে যাইতেছিলেন। আশ্রম হইতে সভামণ্ডপে যাইতে হইলে মাতৃমণ্ডপের নিকট দিয়াই যাইতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই মাতৃমণ্ডপেই সহস্র চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইয়াছিল। যোগীভাই ওইদিন মাতৃমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে বেদির উপর বড় একটি কালীমূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে এবং ওই মূর্তির সম্মুখে বসিয়া সকলে সমস্বরে চণ্ডীপাঠ করিতেছে। কালী মূর্তি স্থাপন করিয়া সচরাচর চণ্ডীপাঠ করিতে দেখা যায় না। যোগীভাই মনে করিলেন যে ইঁহারা বোধহয় এবার এইভাবেই সহস্র চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক কিছুক্ষণ তিনি ওইখানে থাকিয়া সভামণ্ডপে চলিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে যখন তিনি আবার মাতৃমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তিনি ভিতরে চাহিয়া দেখেন যে বেদির উপর কালীমূর্তি নাই। সেই স্থানে একটি ঘট বসানো আছে। গৃহের কোনও স্থানেই তিনি ওই মূর্তি দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তিনি খুব বিস্মিত হইলেন। পরে তিনি এই দর্শনের বিষয় শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতেই আমি এই ঘটনা জানি। যোগীভাইয়ের উপাস্য দেবী হইলেন শ্রীকালী। মনে হয় দেবী তাঁহাকে কৃপা করিয়া এইভাবে দর্শন দিয়াছিলেন।

গ) সম্পুটিত সহস্রচণ্ডী—সাধারণ চণ্ডীপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

সম্পুটিত সহস্র চণ্ডী পাঠ হয়। ইহাও মাতৃমণ্ডপে হইয়াছিল। উৎসবের কর্মসূচি যখন প্রস্তুত করা হয় তখন সম্পুটিত চণ্ডীপাঠের কোনও প্রস্তাব ছিল না। ইহা আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয় এবং পূর্বাহ্নে এই বিষয়ে প্রস্তুতি না থাকিলেও ইহা আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। এইজন্য এই চণ্ডীপাঠে চণ্ডীদেবীর কোনও মূর্তি তৈয়ার করা সম্ভব হয় নাই। মূর্তির পরিবর্তে দুই ভরি ওজনের এক স্বর্ণপাতের উপর দেবীর বীজমন্ত্র অঙ্কিত করিয়া উহাই সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। এই পূজায়ও দেবীকে স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, তৈজসপত্রাদি রাজকীয় ভাবে দেওয়া হয়।

এই চণ্ডীর জন্য জাপক এবং আচার্য সহ ৮৬ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হন। দুই চণ্ডীপাঠের ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। এই চণ্ডী শেষ হইলে পাঁচটি কুণ্ডে এক সময়ে ইহার যজ্ঞ সমাপন করা হয়। এই চণ্ডী পাঠের সময়ও প্রত্যহ তিনজন কুমারী এবং একজন বটুককে ভোজন করানো হয় এবং পাঠান্তে একটি কুমারীকে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া পূজা করা হয়। তাহাকে রূপার থালা, বাটি, গ্লাস প্রভৃতি দিয়া সেবা করা হয়।

সাধারণ চণ্ডী এবং সম্পুটিত চণ্ডীর যজ্ঞান্তে দুই চণ্ডীর জন্যই একযোগে একটি বৃষ এবং সবৎসা একটি গাভী দান করা হয়। দান করিবার পূর্বে ওইগুলিকে স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্য খুর এবং তাম্র পৃষ্ঠ দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া যজ্ঞান্তে আচার্য দম্পতিকে শস্য দান করা হয়। ইহাতে আচার্যকে একটি সোনার হার, পোশাক ইত্যাদি এবং আচার্য পত্নীকে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার, শাড়ি, জামা, খাট, পালঙ্ক, জলচৌকি, গৃহস্থালীর যাবতীয় তৈজসপত্রাদি এবং আহার্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়। দুই চণ্ডীর জন্য ২০০ ব্রাহ্মণ ভোজন হয়।

ঘ) শতচণ্ডী—অবধূতজীর প্রস্তাব অনুসারে ললিতা ঘাটে দেবীর সম্মুখে শতচণ্ডী পাঠও হয়। এইজন্য ছয়জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বেলায়ও স্বর্ণপাতে দেবীর মূর্তি করা হইয়াছিল।

ঙ) রুদ্রাভিষেক—২৩শে বৈশাখ হইতে রুদ্রাভিষেক আরম্ভ হয়। ইহা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় হয়। ইহার জন্য জাপক এবং আচার্য সহ ১৩ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়। ইঁহারা সকলেই উত্তর প্রদেশের লোক। গুলঞ্চ, গোলমরিচ, বাদাম ও সিদ্ধি—এইগুলিকে বাটিয়া উহা দুগ্ধ এবং গঙ্গাজলের সহিত মিশ্রিত

করিয়া ইহা দ্বারা রুদ্রদেবকে অভিষেক করা হইয়াছিল। অভিষেকান্তে ৩রা জ্যৈষ্ঠ হোম এবং পূর্ণাহুতি হয়। যজ্ঞান্তে একটি গোদান করা হয় এবং ১০০ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হয়।

চ) বিষ্ণু যজ্ঞ—রুদ্রাভিষেক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্ণু যজ্ঞ আরম্ভ হয়। ইহা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত হয়। ইহার জন্য আচার্য সহ ১৭ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাও এই প্রদেশের লোক। তবে অবধূতজীর ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুযজ্ঞের আচার্যকে ঋষীকেশ হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। এই যজ্ঞে সোনার পাতে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীমূর্তি, রূপার পাতে গরুড়ের মূর্তি অঙ্কিত করিয়া উহা সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া পূজা করা হয়। বিষ্ণু যজ্ঞ শেষ হইতে চারিদিন লাগে। পঞ্চম দিন ইহার পূর্ণাহুতি হয়। ওইদিনও গোদান এবং ব্রাহ্মণ ভোজন হয়।

ছ) তুলাদান—ইহার জন্য আলাদা করিয়া কন্যাপীঠের সম্মুখে একটি চৌচালা ঘর ও বেদী করা হয়। ঘরটি কাঠের ফ্রেমের উপর খড় দিয়া বানানো হয়। ওই খড়ের উপরের দিকটা মার্কিন কাপড় এবং ভিতরের দিকটা শালু কাপড় দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্তম্ভগুলিকেও শালু দিয়া মুড়িয়া উহার উপর জরি জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেদির উপর পাঁচটি যজ্ঞকুণ্ড করা হইয়াছিল—চারি বেদের জন্য চারিটি কুন্ড এবং পঞ্চমটি মুখ্য কুণ্ড।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ তুলাদান হয়। কিন্তু ইহার পূর্বদিন রাত্রিবেলা হইতেই পূজা এবং অভিষেকের কার্য আরম্ভ হয়। এতদুপলক্ষে আচার্য সহ ২৫ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বাঙালি।

পাঁচ কুণ্ডে যজ্ঞাদি করিতে বেলা প্রায় ২টা বাজিয়া যায়। ইহার পর তুলা দান কার্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীমাকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দ্বারা ওজন করা হয়— ১) অষ্টধাতু—ইহার মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা, পিতল, রাং, সীসা এবং লোহা ছিল। ২) চাউল, ৩)গম, ৪) যব, ৫) তিল, ৬) মাষকলাই, ৭) ঘি, ৮) চিনি, ৯) বাতাসা, ১০) ফল এবং ১১) বস্ত্র। বস্ত্রের মধ্যে সূতি এবং রেশমী কাপড় দুই-ই ছিল। এইগুলি দিয়া মাকে পৃথক পৃথক ভাবে ওজন করা হয়। অষ্টধাতুর মধ্যে সোনা ছিল আধ সের এবং রূপা ছিল ৩১ সের। পরে এই সব জিনিস ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

জ) গঙ্গাপূজা এবং বেদপাঠ—জয়ন্তী উপলক্ষে একদিন গঙ্গাপূজা ও একদিন বেদপাঠ হইয়াছিল। গঙ্গাপূজার সময় গঙ্গাকে একটি প্রকাণ্ড মালা এইপার হইতে ওইপার পর্যন্ত পরাইয়া দেওয়া হয় এবং এক মণ দুগ্ধ গঙ্গাজলে অর্পণ করা হয়। একদিন সাতজন ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদপাঠ করানো হয়। তাঁহাদিগকে ৪ টাকা করিয়া দক্ষিণা এবং দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি দেওয়া হয়।

ঝ) কুমারী পূজা—উৎসবের মধ্যে দুইদিন ১০৮টি করিয়া কুমারী সেবা করা হয়। একদিন ইহাদের প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দক্ষিণা এবং দ্বিতীয় দিন চারি আনা করিয়া দক্ষিণা ও একটি করিয়া ওড়না দেওয়া হয়।

ঞ) শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা—জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহই মাকে সকাল, সন্ধ্যায় আরতি করা হইত। ইহা শ্রীমান কুসুম ব্রহ্মচারী করিতেন। তাহাছাড়া অবধূতজীর আগ্রহে মাকে দুইদিন পুষ্প বাটিকায় বসিতে হইয়াছিল। এই বাটিকা নির্মাণ করিবার জন্য অবধূতজী বৃন্দাবনের বিহারীলালজীর মন্দিরের সাজসজ্জাকারীকে আনাইয়াছিলেন। তিনি ফুল দিয়া অতি সুন্দর সুন্দর মন্দির এবং গৃহাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সভামণ্ডপের বেদির উপরই করা হইয়াছিল। এগুলি প্রস্তুত করিতে এত ফুলের দরকার হইত যে উহার মূল্যও সহস্র মুদ্রার উপর। মাকে কিন্তু এই পুষ্প বাটিকায় আধঘন্টাও বসানো যায় নাই।

অবধূতজী নাকি একদা মাকে সিংহবাহিনী রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রস্তাব দিয়াছিলেন যে এইবার জয়ন্তীতে তিথি পূজার দিন মাকে অষ্ট ধাতু নির্মিত সিংহের উপর আসনে বসাইয়া পূজা করা হউক। অনেকেই এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু এই প্রস্তাব একজন বিশিষ্ট সাধু করিয়াছেন বলিয়া খুকুনী দিদি ইহাকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করেন। বোম্বাইতেই ওই সিংহ এবং আসন তৈয়ারের চেষ্টা হয়। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর বি. কে. পাল মহাশয়ের উপর এই কার্যভার ন্যস্ত করা হয়। তিনি অষ্টধাতু দিয়া একটি প্রকাণ্ড সিংহ তৈয়ার করেন। সিংহের পৃষ্ঠের উপর মখমল দ্বারা আচ্ছাদিত এবং রৌপ্য কারুকার্য খচিত একটি আসন করা হইয়াছিল। আসনটি এমন ভাবে নির্মিত ছিল যে ইহাকে সহজেই দ্বিখণ্ডিত করা যায় এবং খণ্ডিত অবস্থায়ও ইহা স্বয়ং পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। কাজেই এই

আসনে শোওয়া বসার কাজ দুই-ই চলিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে সিংহ এবং আসনটি অতি চমৎকার। সিংহটির চক্ষু দুইটি জীবন্ত সিংহের মতো জ্বল জ্বল করিত কারণ ইহার মস্তকের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা রাখায় ওই আলো জ্বলিলেই উহা সিংহের স্ফটিক নির্মিত অক্ষিগোলকে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু দুইটিকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিত। সিংহের উপর ন্যস্ত আসনটি মাটি হইতে প্রায় ৫ ফুট উচ্চ বলিয়া উহাতে উঠিবার জন্য একটি সিঁড়িও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহাও মখমল দ্বারা আবৃত। সিংহসহ আসনটির ওজন ২৮ মণ এবং শুনিতে পাইলাম যে ইহা প্রস্তুত করিতে ১২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। জয়ন্তী উৎসবে এই সিংহাসনটিই একটি দর্শনীয় বস্তুরূপে দাঁড়াইয়াছিল। অনেকে শুধু এই সিংহাসন দর্শন করিতে শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আশ্রমে আসিতেন এবং ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন।

সচরাচর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের সময় জন্মতিথি অনুসারেই মায়ের বিশেষ পূজা করা হইয়া থাকে। এইবার খুকুনীদিদির ইচ্ছানুসারে মায়ের জন্ম তারিখে এবং জন্মতিথিতে—এই দুই দিনই পূজা করা হইয়াছিল এবং পূজান্তে গোদান করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে যতবারই গোদান করা হইয়াছে ততবারই উহাদিগকে স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর এবং তাম্রপৃষ্ঠ দ্বারা সজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মায়ের প্রথম পূজা করা হয় ১৯ শে বৈশাখ শেষ রাত্রিতে। এই পূজা আশ্রমের চণ্ডীমণ্ডপে হয়। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মা হয়তো সিংহাসনে আসীনা হইয়া পূজা গ্রহণ করিবেন না। কার্যত তাহাই হইয়াছিল। মা সিংহাসনে না বসিয়া উহাতে উঠিবার সিঁড়িতে বসিয়া পড়িলেন। শঙ্করানন্দ স্বামীজী অনেক অনুরোধ করিয়াও মাকে আসনে উঠাইতে পারিলেন না। মা প্রস্তর মূর্তির মতো সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিলেন। এই সময় তাঁহার মুখ চোখের ভাবটাও যেন অস্বাভাবিক ছিল। শ্রীমান কুসুম মায়ের পূজা করিলেন। আমরা মায়ের সম্মুখে বসিয়া পূজা দেখিলাম।

মায়ের জন্মতিথির দিন পূজার আয়োজন আর আশ্রমের মধ্যে করা সম্ভব হয় নাই। কারণ ইতিমধ্যে আশ্রমে প্রায় চৌদ্দশত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। আশ্রমের মধ্যে ওই পূজা হইলে ইহার এক চতুর্থাংশ লোকও আশ্রম প্রাঙ্গণে

দাঁড়াইয়া ওই পূজা দেখিতে পারিতেন না তাহা ছাড়া তুলাদানের দিন লোক সমাগমের অভিজ্ঞতা হইতেও কেহ আশ্রমে মায়ের তিথি পূজা করিতে সাহসী হন নাই। তুলাদানের দিন জনসমাবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যমই যথেষ্ট না থাকায়, ওই ব্যাপারে পুলিশেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিথি পূজার দিন ওইরূপ বা উহা অপেক্ষা বেশি লোকের উপস্থিতি আশঙ্কা করিয়া ওই পূজার আয়োজন সভামণ্ডপে করা হয়। এইজন্য সিংহাসনটি চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সভামণ্ডপের বেদির উপর স্থানান্তরিত করা হয়। তাহা ছাড়া মায়ের ভক্ত ব্যতীত অপর কেহ এই সময় যাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারে সেইজন্য ভক্তদের মধ্যে টিকিট বিতরণ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে তিথি পূজার দিন খুব একটা ভিড় হয় নাই। এইবারও পূজার সময় মা সিংহাসনে আরোহণ না করিয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। হয়তো বা মা ওইখানেই পূজার সমস্তটা সময় কাটাইয়া দিতেন যদি না হরিবাবা এবং অবধূতজী আসিয়া মাকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন। এই সব মহাত্মার একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মা সিংহাসনে উঠিতে বাধ্য হইলেন সত্য কিন্তু উঠিয়াই ওইখানে শুইয়া পড়িলেন। ওই অবস্থায়ই পূজা হইল। পূজান্তে ভক্তগণ একে একে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

২) মহাত্মা হরিবাবার কর্মসূচি

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবে হরিবাবার কর্মসূচি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্বদিন হরিবাবা বৃন্দাবন হইতে কাশী আসেন। উৎসবের প্রথম দিন হইতেই তাঁহার কর্মসূচি আরম্ভ হয়। ভোর ৪টায় ভক্তগণ সহ তিনি ঊষাকীর্তন করিতেন। পরে বেলা ৭।। টায় তিনি রাম অর্চ্চায় যোগ দিতেন। এখানেও তাঁহার ভজন কীর্তন হইতে থাকিত। পরে সভামণ্ডপে গিয়া রাসলীলায় উপস্থিত হইতেন। সেইখানে হরিবাবাকে চামর হস্তে রাধাকৃষ্ণ বেশধারী অভিনেতাদিগকে ব্যজন করিতে দেখা যাইত। রাসলীলা বেলা ৭।। টা হইতে ১০।। টা পর্যন্ত চলিত।

রাসলীলা কিছুদিন হওয়ার পর গৌরাঙ্গলীলা আরম্ভ হয়। হরিবাবা গৌরাঙ্গ

ভক্ত বলিয়া তাঁহার এক সেবক চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীর কিয়দংশ ব্রজভাষায় নাটকাকারে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে মহাপ্রভুর জন্ম হইতে সন্ন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটনাই আছে। গৌরাঙ্গলীলায় উঁহাই অভিনীত হইত। যতদিন উৎসব চলিয়াছিল ততদিন প্রত্যহ সকালবেলা সভামণ্ডপে রাসলীলা অথবা গৌরাঙ্গলীলা চলিত।

৩) সৎসঙ্গ বা ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহাত্মা হরিবাবা ব্যতীত আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মহাত্মা কাশীর আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৃন্দাবনের স্বামী অখণ্ডানন্দজী, কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, বোম্বাইয়ের স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী শরণানন্দজী, স্বামী চক্রপানিজী, গোয়ালিয়রের স্বামী রামদাসজী ও কলিকাতার যোগেশ ব্রহ্মচারীজীর নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অনেক সাধু মহাত্মাও সৎসঙ্গে যোগদান করিতেন।

১৯শে বৈশাখ কাশীনরেশ শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মা তাঁহাকে লইয়া সভামণ্ডপে গিয়া বসিলেন। ওইখানে হরিবাবা প্রমুখ আরও মহাত্মারা উপস্থিত ছিলেন। বিন্দু মহারাজ যিনি বর্তমান সময়ে তুলসীদাসী রামায়ণের একজন সুপ্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার, তিনি একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন। ইহাকে উৎসবের উদ্বোধন বক্তৃতা বলিলেও চলে। তিনি বলিলেন, 'মায়ের এই জন্মোৎসবকে জন্মোৎসব না বলিয়া অবতরণ উৎসব বলাই সমীচীন, কারণ যিনি অজ তাঁহার আর জন্ম কী? তবে তিনি মাঝে মাঝে জীবের উদ্ধারের জন্য জগতে অবতরণ করেন। কাজেই জীবের দিক হইতে ইহাকে মুক্তি উৎসব বলা যাইতে পারে।

বিন্দু মহারাজ সুবক্তা, সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এইদিন হইতে প্রত্যহই ৪।। টা হইতে ৬টা কি ৬।। টা পর্যন্ত সভামণ্ডপে সদালোচনা হইত। স্বামী অখণ্ডানন্দজী, রামদাসজী, কৃষ্ণানন্দজী, চক্রপানিজী, শ্রীনাথজী, যোগেশ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি একাধিকবার বক্তৃতা করিয়াছেন।

একদিন জগৎগুরু রামানুজাচার্যদেব নায়কজী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছত্র,

চামর এবং দণ্ডধারী কয়েকজন অনুচরও আসিলেন। জগৎগুরু হিন্দিতে সুন্দর একটি ভাষণ দিলেন যাহা সকলেরই মনোজ্ঞ হইয়ছিল।

সাধুমহাত্মা ব্যতীত অনেক পণ্ডিত গৃহীও এই সৎসঙ্গে বক্তৃতা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আত্রেয়জী যোগাবশিষ্ঠ সম্বন্ধে তিন দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। একদিন Advocate দেবনারায়ণজী কাশীর সাধুসন্তদের সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়াছিলেন। কলিকাতার ডা. নলিনী ব্রহ্ম মহাশয়ও বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয় বাল্মীকী রামায়ণ এবং মহাভারত সম্বন্ধে তিন দিন ভাষণ দেন। আরও অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত সভামণ্ডপে তিন দিন রামচরিতমানস সম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলন নাকি সর্ব ভারতীয় ব্যাপার। দুই এক বৎসর পর পরই নাকি ইহা হইয়া থাকে। এইবার কাশীতে ইহা হয়। মায়ের উৎসবের এই বিরাট প্যান্ডেল দেখিয়া ইঁহারা এইখানেই অধিবেশন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামচরিতমানসের সদালোচনা সৎসঙ্গের অন্তর্গত এবং সর্বসাধারণের শিক্ষাপ্রদ বলিয়া উৎসবের কর্তৃপক্ষগণ তিন দিন বিকালবেলা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত এই সভামণ্ডপটি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। এই তিন দিন এইখানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বক্তাগণ রামচরিতমানস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. সম্পূর্ণানন্দজীও একদিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমাও এই সকল বক্তৃতায় মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকিতেন।

৪) নৃত্যগীতাদি উৎসব

পূজা, হোম এবং সৎসঙ্গ ব্যতীত এই জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকাগণও গানবাদ্য দ্বারা মায়ের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরীবাঈ, শ্রী হরিশঙ্কর মিশ্র, শ্রীরবিশঙ্কর, শ্রীআলি আকবর খাঁ— ইঁহারা প্রত্যেকেই একদিন একদিন করিয়া ইঁহাদের গানবাদ্য মাকে শুনাইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে কেহই হাজার হাজার টাকার কমে কোনও আসরে গানবাদ্য করেন না। কিন্তু মায়ের উৎসবে ইঁহারা কোনওরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। আলি আকবর খাঁর সরোদ এবং রবিশঙ্করের সেতার বাদ্য শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

উৎসবের শেষ দিকে কাশীর তথা ভারতের বিখ্যাত সানাইবাদক বিসমিল্লা খাঁ ও সহশিল্পীবৃন্দ তাঁহাদের সানাই বাদন মাকে শুনান।

পূর্বোক্ত সঙ্গীত বিশারদ ব্যতীত আরও অনেক গুণীলোক উৎসব মণ্ডপে গান করিয়াছেন—শ্রীমতী গিরিজা দেবী, বলবন্তজী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, সুখেন্দু গোস্বামী প্রমুখ বেতার শিল্পী গান করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়াছেন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী মহাশয় চার দিন রামায়ণ গান করিয়াছেন। উহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নদের নিমাই পার্টিও একরাত্রি 'নদের নিমাই' যাত্রা অভিনয় করিয়াছেন। ইঁহারাও যাতায়াত খরচ ব্যতীত কোনও রূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

কাশীবাসী কয়েকটি যুবক যুবতীও একদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিয়া মাকে শুনাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন নৃত্যকলাও প্রদর্শন করেন। তাহা ছাড়া গুজরাটি সম্ভ্রান্ত মহিলারাও একদিন মাকে গরবা নৃত্য দেখাইয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠান সভামণ্ডপেই হইয়াছে।

৫) সাধু, ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র সেবা

আশ্রমের বাহিরে সভামণ্ডপে যেমন নৃত্যগীতাদি উৎসব চলিয়াছে আশ্রমের ভিতরেও ভোজনাদি ব্যাপারে কম আড়ম্বর দেখা যায় নাই। ১৯শে বৈশাখের পূর্ব হইতেই আশ্রমে ভক্ত সমাগম হইতে থাকে। বহিরাগত ভক্তের সংখ্যা দুই তিন শত হইতে আরম্ভ করিয়া উৎসবের শেষদিকে চৌদ্দশততে দাঁড়ায়। ইহাদের দুইবেলা আহারের বন্দোবস্ত করাও এক বিরাট ব্যাপার ছিল। আশ্রমে যে সকল সাধু মহাত্মা থাকিতেন তাঁহাদের সেবায় যাহাতে কোনওরূপ ত্রুটি না হয় সেই বিষয়ে মা সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন। এই তো ছিল আশ্রমের নিত্য ভোজনের ব্যাপার। তাহা ছাড়া জয়ন্তী উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন, সাধু ভোজন প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানও হইয়াছে।

তিন বৎসর ব্যাপী অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞের সময় যেমন একদিন বানরদিগকে ভোগ দেওয়া হইয়াছিল, জয়ন্তী মহোৎসবেও একদিন সেইরূপ বানর ভোজন হয়।

কাশীর কুষ্ঠাশ্রমের কুষ্ঠরোগীদিগকে একদিন মিষ্টি ও বস্ত্রদান করা হয়।

দুইদিন ২৫০ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। ইহার মধ্যে একদিন প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক ভরি করিয়া রূপা দান করা হয়।

আশ্রমের নিকটে যে সকল মাঝি মাল্লারা বাস করে তাহাদিগকেও একদিন খাওয়ানো হয়। ইহাদের সংখ্যা ৫০০ হইবে।

একদিন দণ্ডীস্বামীদিগকে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। বিশিষ্ট সাধু, মহাত্মাদিগকে কমন্ডলু, গরদের বস্ত্র, রূপার থালা বাটি দেওয়া হয়।

পণ্ডিত সম্বর্ধনা উপলক্ষে শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করা হয়। ইঁহাদের প্রত্যেককে দুই আনি সোনা, তাম্র এবং রৌপ্য পাত্র, ফল, এক পোয়া পরিমাণ একটি মিষ্টি, শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবীর লিখিত 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' পুস্তকের প্রথম খণ্ড এবং দুই টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হয়।

একদিন দরিদ্রদিগকে বস্ত্রদান করা হয়। তাহা ছাড়া মায়ের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আশীর্বাদী বস্ত্র লাভ করেন। প্রত্যেক ভক্তই ফল এবং মিষ্টি সহ একটি আশীর্বাদী রুমাল লাভ করেন।

এই উৎসবের ব্যয়ের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহাতে যে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে তাহাতে কোনওই সন্দেহ নাই।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উৎসবের প্রায় সমস্তটা সময়ই এখানে সূর্যের উত্তাপ ১১০ ডিগ্রি হইতে ১১৫ ডিগ্রির মধ্যে উঠানামা করিতেছিল। এই নিদারুণ গরমের মধ্যেও কর্মীরা যেইভাবে তাঁহাদের নির্দিষ্ট সেবা কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে উৎসব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে প্রবল বারিপাত হয়। ইহা যদি উৎসবের মধ্যে হইত তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না। সমস্ত উৎসবই পণ্ড হইয়া যাইত। এই বিরাট ব্যাপার যে নির্ঝঞ্ঝাটে সুসম্পন্ন হইয়াছে ইহা মায়ের কৃপারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এইখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—মায়ের ষষ্ঠিতম জয়ন্তী উৎসব যখন বিশেষ ভাবে পালন করিবার প্রস্তাব হয় তখন ইহা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন টিহরির মহারাজা শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র শাহ্। সেই সময় ইহা

সুস্থির করা হয় যে এই জয়ন্তীতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। ওই টাকা সংগ্রহের জন্য শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সঙ্ঘের সভ্যদের দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশে ছোট ছোট কমিটিও গঠন করা হয় এবং কোথা হইতে কত টাকা সংগৃহীত হইতে পারে তাহারও পরিকল্পনা করিয়া কার্য আরম্ভ করা হয়। কিন্তু ওই সকল সভ্যর চেষ্টা দ্বারা সংকল্পিত অর্থের এক চতুর্থাংশও সংগৃহীত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই জন্য উৎসবের প্রথম দিকে অর্থের অপ্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা এবং হতাশার সঞ্চার হয়। কিন্তু ইহাতে খুকুনীদিদি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। কারণ তাঁহার অটল বিশ্বাস যে মাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোনও কাজ আরম্ভ করিলে উহাতে কিছুরই অভাব হয় না। মায়ের উপর একান্ত নির্ভর-ই কার্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়—ইহা তিনি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই এবারও তিনি কর্মীদিগকে উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাই করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলও অবিলম্বে দেখা গেল। উৎসব শেষ হইবার পূর্বেই বিভিন্ন স্থান হইতে নগদ ৯০ হাজার টাকা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা ছাড়া কত হাজার হাজার টাকার সোনা, রূপা এবং কাপড় ইত্যাদি আসিল তাহার কোনও লেখা জোখা নাই। অখণ্ড মহাযজ্ঞের সময়ও এই রূপ হইয়াছিল। মায়ের উপর নির্দ্বন্দ্বভাবে নির্ভর করিতে পারিলে যে বঞ্চিত হইতে হয় না—এইগুলি তাহারই নিদর্শন। মায়ের শ্রীচরণে আমাদের ইহাই প্রার্থনা যে আমরা যেন মায়ের ভুবন প্লাবিনী করুণার উপর বিশ্বাস রাখিয়া অনিশ্চিত এবং ভীতি সঙ্কুল অনাগতকে আনন্দে স্বাগত জানাইতে পারি।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪। ৬। ৫৬)

উৎসবান্তে গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ ৫ই জুন মা হৃষীকেশ চলিয়া যান। হৃষীকেশে স্বামী শুকদেবানন্দ এক উৎসব করিতেছেন। সেইখানে হরিবাবা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিবেন। মাকেও ওই উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সেইজন্য মায়ের হৃষীকেশ যাওয়া। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ খুকুনীদিদির বোম্বাই যাওয়ার কথা ছিল। সেইখানে বি. কে. শাহ্ মহাশয় দিদিকে ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইয়া বর্তমান.অবস্থায় দিদির কী করা উচিত সেই বিষয়ে ডাক্তারদের নির্দেশ লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এইদিকে দিদি অসুস্থ হইয়া

পড়ায় তাঁহার বোম্বাই যাওয়া স্থগিত রাখিতে হয়। মাকেও টেলিগ্রামে দিদির অবস্থা জানানো হয়। মা কোনও খবর না দিয়া আজ বিকাল ৪টায় হঠাৎ কাশী আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন।

মায়ের আগমন সংবাদ পাইয়াই মায়ের সহিত দেখা করিতে আশ্রমে গেলাম। দিদির ঘরেই মা ছিলেন। ডা. গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ও ওইখানে ছিলেন। মায়ের কথায় বুঝিলাম যে মা ৫।৭ দিন এইখানে থাকিয়া দিদি একটু সুস্থ হইলেই দিদিকে লইয়া দেরাদুন যাইবেন। রাত্রিবেলা যখন মায়ের কাছে বসিলাম তখন নানা কথাই হইতে লাগিল। মায়ের প্রতি হরিবাবার যে বিশেষ ভক্তি আছে এবং যাহার জন্য মা হরিবাবার প্রায় সমস্ত বাসনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন— এই সব কথা হইল।

ইতিমধ্যে গোপীবাবুকে মা যে সূক্ষ্মে দেখিয়াছেন কথায় কথায় মা তাঁহাও বলিলেন। মা বলিলেন, 'একদিন দেখিতেছি যে গোপীবাবা এ শরীরের পিঠে হাত দিয়াছে এবং এই শরীরকে স্পর্শ করা মাত্রই বাবা যেন কেমন হইয়া গেল। স্থূলে যখন বাবাকে দেখা যায় তখন তাহার ভাবটা কিছু চাপা থাকে; কিন্তু সূক্ষ্মে দেখার সময় সে সব কিছুই থাকে না। এই শরীর স্পর্শ করা মাত্রই যে বাবা বিহ্বল হইয়া পড়িল তাহা লক্ষ্য করিলাম।'

ওই কথা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, 'তুমি তো গোপীবাবুকে আরও অনেকবার সূক্ষ্মে দেখিয়াছ। এই সব দর্শন সম্বন্ধে আমি গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি যে সূক্ষ্মে তোমার কাছে আসেন তাহা তিনি জানিতে পারেন কিনা?

মা। না, তাহা জানিবে কেমন করিয়া?

আমি। তিনিও তাহাই বলিয়াছিলেন। তবে কীজন্য যে আমরা আমাদের সূক্ষ্মে গমনাগমন জানিতে পারি না তাহার কারণও তিনি বলিয়াছিলেন।

মা। কী বলিয়াছিল?

আমি। তিনি বলিয়াছিলেন যে আমরা গুরু হইতে যে শক্তিলাভ করি এবং সাধন ভজন দ্বারা উহার যেইরূপ বিকাশ করি—উহাই হইল আমাদের গুরুদত্ত কায়া। ওই দেহই উহার প্রয়োজন মতো নানা স্থানে গিয়া থাকে এবং বিভিন্ন স্থান হইতে শক্তি আহরণ করিয়া থাকে। উহার গমনাগমন আমরা কিছুই জানিতে

পারি না। কিন্তু যেই দিন নানাস্থান হইতে উহার শক্তি আহরণ শেষ হইবে সেই দিনই নাকি আমরা উহাকে স্থূলে থাকিয়াও জানিতে পারিব।

মা। বাবা ঠিকই বলিয়াছে।

সূক্ষ্মে যামিনীবাবুকে সন্ন্যাস দান

মায়ের জন্মোৎসবের সময় যামিনী চক্রবর্তী নামে এক বৃদ্ধ কাশীর আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটির বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। কলিকাতায়ও তাঁহার বাড়ি আছে। অবস্থা বেশ ভাল। তাঁহার ছেলে মেয়েও এগারটি। সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ৫০০্ পেনসন পাইতেছিলেন। শেষ জীবনটা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কাটাইবেন মনে করিয়া তিনি ১১ মাস পূর্বে স্ত্রী পুত্রদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এক বন্ধু সহ হৃষীকেশে চলিয়া যান। এইবার দোলের সময় বৃন্দাবনে মায়ের সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়, যদিও তিনি দুই বৎসর পূর্বে দিদিমার নিকট হইতেই দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। মা তাঁহাকে বৈশাখ মাসে কাশী আসিতে বলেন, কেননা ওই সময় দীর্ঘদিন মায়ের কাশীতে থাকার কথা। মায়ের কথানুসারে ভদ্রলোক মায়ের উৎসবের সময় তাঁহার বন্ধুকে লইয়া কাশী আসেন। ভদ্রলোকের নাকি Low blood pressure ছিল। একদিন হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ডা. দাশগুপ্ত এবং ডা. ভার্গব তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি প্রায় ১৫ দিন ভুগিয়া কাশীপ্রাপ্ত হন। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্রকে টেলিগ্রাম করিয়া এইখানে আনা হয়। ভদ্রলোকের যখন মৃত্যু হয় মা তখন হৃষীকেশে। গোপীবাবুকে সূক্ষ্মে দেখার কথা উঠায় মা বলিলেন, 'দেখ, যখন হৃষীকেশে ছিলাম তখন একদিন দেখিতেছি কী যে ওই ভদ্রলোক (অর্থাৎ যামিনীবাবু) উলঙ্গ অবস্থায় আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। তাহার বেশ লাল টকটকে চেহারা। সে এ শরীরকে বলিতেছে, 'আমাকে সন্ন্যাস দাও।' তাহার কথা শুনিয়া এই শরীরের ভাবটাও যেন কেমন হইয়া গেল এবং মুখ হইতে হঠাৎ এই কথাগুলি বাহির হইল, 'উহার পথও নিজেই করিয়া নিল', অর্থাৎ উহার অন্তর্সন্ন্যাস হইয়া গেল। এই সময় উদাস আমার নিকটে ছিল। সে এই দর্শনের কথা কাশীতে লিখিয়া দিতে আমার অনুমতি চাহিল। আমি বলিলাম, 'লিখিয়া দিতে পার তবে

ওই চিঠি সে পাইবে না, অর্থাৎ চিঠি পাইবার পূর্বেই তাহার দেহত্যাগ হইবে।'

মা ভদ্রলোকের স্বভাবের খুব প্রশংসা করিলেন। খুকুনীদিদিও বলিলেন, 'ভদ্রলোকের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় নাই অথচ মৃত্যুর পূর্বে অলৌকিক ভাবে মায়ের নিকট হইতেই তিনি সন্ন্যাস লাভ করিয়া গেলেন। মায়ের কৃপালাভ করা দীর্ঘ দিন বা অল্প দিনের পরিচয়ের উপর নির্ভর করে না।'

১লা আষাঢ়, শুক্রবার (ইং ১৫।৬।৫৬)

আজ রাত্রিতেও মা যামিনীবাবুর কথা উঠাইলেন। এই সময় গোপীবাবুও নিকটে ছিলেন। মা বলিলেন, 'গতকাল রাত্রিতেই তোমাদিগকে যামিনীবাবুর সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছি। আবার মজাও এমন, দেখ, গত রাত্রিতেই যামিনীবাবা এ শরীরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম যে ইতিমধ্যে তাহার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে—সুন্দর জ্যোতির্ময় চেহারা হইয়াছে। সে এই শরীরের কাছে আসিয়া বলিল, 'কমন্ডলু?' অর্থাৎ 'আমাকে কমন্ডলু দাও।' কথাগুলি সে একটি সরল শিশুর মতো বলিয়া গেল। তোমরা তো জান যে উৎসবের সময় সাধু মহাত্মাদিগকে দিবার জন্য কতগুলি কমন্ডলু ও খপ্পর আনা হইয়াছিল। উহার প্রায় সবগুলিই বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুইটি বোধহয় ছিল। উদাসকে সেই দুইটি কমন্ডলু লইয়া আসিতে বলিলাম। কারণ তাহার (অর্থাৎ যামিনীবাবুর) মনের ভাবটা এই ছিল যে সে তো নিজে একটা কমন্ডলু নিবেই তাহা ছাড়া যাহার (অর্থাৎ এই শরীরের) নিকট হইতে সে সন্ন্যাস মন্ত্র লাভ করিয়াছে তাহার নিকটও একটি কমন্ডলু থাকিবে।

দুইটি কমন্ডলু আনা হইলে একটি যামিনীবাবাকে দিয়া বলিলাম, 'এই শরীরের জন্য যে কমন্ডলুটি রহিল উহা আমি ওই লোকটিকে দিয়া দিব।' এই বলিয়া তাহাকে একজন লোক দেখাইয়া দিলাম, সে হইল তোমাদের প্রাণগোপালবাবু। প্রাণগোপালবাবাও ওই সময় একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার লম্বা ছিপ ছিপে চেহারা, লম্বা সাদা দাড়ি এবং সাদা কাপড় পরা। দেখ, কী রকম যোগাযোগ! যামিনীবাবার সহিত প্রাণগোপালবাবার কোনও সম্বন্ধই নাই, দেখাশুনাও কোনওদিন হয় নাই, অথচ দুই-ই এক সময়ে আসিয়া উপস্থিত। কাজেই কাহার সহিত যে কাহার যোগাযোগ থাকে তাহা বলা শক্ত।'

নারায়ণ স্বামী। তোমার নিকট হইতে সন্ন্যাস মন্ত্র লাভ করিয়া অন্তর্সন্ন্যাসও হইয়া গেল, তাহারও দেখিতেছি গেরুয়া, কমন্ডলু আদি সন্ন্যাসীর বহির্চিহ্ন ধারণের বাসনা রহিয়া গেল!

মা। এই শরীরের খেয়াল হইতেছে যে যামিনীবাবা এখানে আসিয়া উৎসবের সময় সাধুদিগকে কমণ্ডলু হাতে করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া বোধহয় ওইরূপ কমণ্ডলু লইয়া বাহির হইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহার মনের ভাবটা এইরূপ হইয়াছিল যে কিছুই সঙ্গে থাকিবে না, শুধু একটি জলপাত্র কমণ্ডলু হাতে করিয়া ভগবানের জন্য বাহির হইয়া পড়াই বা মন্দ কী? যাক এই বাসনা তাহার পূর্ণ হইয়া গেল।

আজও কিছুক্ষণ পর্যন্ত মা যামিনীবাবুর সদগুণের প্রশংসা করিলেন। রাত্রি ১০।।টা হইতে ১১টা পর্যন্ত মায়ের সহিত কথাবার্তা হইল। মা উঠিয়া গেলে আমরা চলিয়া আসিলাম।

৬ই আষাঢ়, বুধবার (ইং ২০। ৬। ৫৬)

মা, খুকুনীদিসহ আজ দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন। সতীকেও স্টেশন হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

৫ই শ্রাবণ, শনিবার (ইং ২১। ৭। ৫৬)

আজ সকালবেলা ৭টায় মা ঝুঁসী হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। প্রায় একমাস কাল মা হৃষীকেশ এবং দেরাদুনে ছিলেন। গত ৩রা শ্রাবণ মা দেরাদুন হইতে কাশী রওনা হন। ওইদিন দিদিও দেরাদুন হইতে বোম্বাই রওনা হইয়া যান। দেরাদুন হইতে আসিবার পথে মা ঝুঁসী হইয়া আসেন। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী ১১ই জুলাই হইতে ভাগবত উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। এই উৎসবে উপস্থিত থাকিবার জন্য তিনি মাকে বার বার অনুরোধ করেন। সেইজন্য মা দেরাদুন হইতে ফিরিবার পথে ঝুঁসী গিয়াছিলেন। ঝুঁসী হইয়া গত কালই কাশীতে আসার কথা ছিল। তাহা আর হইয়া উঠে নাই। তাই আজ সকাল ৫ টায় ঝুঁসী হইতে রওনা হইয়া বেলা ৭ টায় কাশী পৌঁছাইয়াছেন।

গুরু পূর্ণিমা উৎসব

৬ই শ্রাবণ, রবিবার (ইং ২২। ৭। ৫৬)

আজ গুরু পূর্ণিমা। সকাল বেলায়ই মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিলাম।

আজিকার কর্মসূচির মধ্যে সকালবেলা ৯ টা হইতে ৯।। টা পর্যন্ত ধ্যানের ব্যবস্থা ছিল। আমরা ওই সময় মাকে লইয়া ধ্যানে বসিলাম। এই সময়টা বেশ ভালই লাগিল।

ইহার পর যজ্ঞ মন্দির হইতে যজ্ঞাগ্নি আনিয়া সাবিত্রী যজ্ঞকুণ্ডে স্থাপন করা হইল। চত্বরের উত্তর দিকে যে যজ্ঞ মন্দির করা হইয়াছিল এবং সাবিত্রী যজ্ঞের পূর্ণাহুতির পর যেই মন্দিরে ওই যজ্ঞাগ্নি সংরক্ষিত হয় সেই যজ্ঞাগ্নি আজ স্থানান্তরিত করা হইল। কারণ যেই চত্বরের উপর মন্দিরটি স্থাপিত তাহা ভীষণ ভাবে ফাটিয়া গিয়াছে। কাজেই ওইখানে যজ্ঞমন্দির রক্ষা করা আর সম্ভব হইবে না। অতুল ব্রহ্মচারীদাদা ওই অগ্নি আনিয়া সাবিত্রী যজ্ঞকুণ্ডকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিলেন। ইদানীং ওই কুণ্ডের উপর একটি ছোট মন্দিরও করা হইয়াছে। বাটুদাদা বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নি স্থাপনের যাবতীয় বিধি অতুলদাদাকে বলিয়া দিতে লাগিলেন। এই অগ্নি স্থাপন করিতে প্রায় আধ ঘন্টা সময় লাগিল। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতেই সমস্ত কার্য হইল।

ইহার পর মা চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসিলেন। ওইখানে মায়ের পূজার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীরা ওইখানে কীর্তন করিতেছিলেন। মায়ের বসিবার আসনও ফুল পাতা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। নারায়ণ স্বামীজীর অনুরোধে মা অল্প সময়ের জন্য ওই আসনে বসিলেন। পরে আসন হইতে নামিয়া নীচে বসিলেন। বিশু দাদা পূজা করিলেন। পূজা এবং আরতি শেষ হইতে বেলা ১টা বাজিয়া গেল। পূজা শেষে প্রসাদ লইয়া আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বিকাল চারটায় আবার মাকে পুরোভাগে রাখিয়া সকলে আধঘন্টা ধ্যান করিলেন। ধ্যানান্তে পাঠ আরম্ভ হইল। তুলসীদাসের শ্রীরামচরিতমানস, ভাগবত, গীতা এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তক পাঠ হইল। নারায়ণ স্বামী এবং কন্যাপীঠের মেয়েরা এই সব গ্রন্থ পাঠ করিলেন। বিকাল ৬টা পর্যন্ত এই পাঠ চলিল। গোপীবাবুও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে হরলালবাবু মা এবং গোপীবাবুকে তাঁহার গুরুর আশ্রমে লইয়া গেলেন।

রাত্রিতে কীর্তনাদি হইল। মৌনের পর সদালোচনাও কিছু হইল। হরিদাস (গাঙ্গুলি) বাবু গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান লাভের সহজ উপায় কী?' গোপীবাবু বলিলেন, 'নাম করা।' এই প্রসঙ্গে মা শ্রীযুক্তা সেবার (ডা. সারদা শর্মা) কথা উঠাইলেন। মা তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'এই শরীরকে স্পর্শ করিলে তাহার যে কীরূপ অবস্থা হয় তাহা তো তোমরা জান। সেই ভাবটা এখনও আছে। সে সর্বদাই নাম জপ করে। সে একদিন আসিয়া এ শরীরকে বলিয়াছিল, 'মা, জপ করিতে করিতে আমার আঙুলগুলির বড় ব্যথা হইয়াছে।' আমি তখন তাহাকে মনে মনে জপ করিতে বলিয়া দেই। সেই অবধি সে তাহাই করিয়া আসিতেছে। একদিন তাহার আপনা হইতেই জপ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে ঘাবড়াইয়া গেল। সে ভাবিল, সে তো ইচ্ছা করিয়া জপ করিতেছে না তবে এ আবার কী হইতেছে? নাম হওয়ার জন্যই নাম করা। তবে আপনা হইতে নাম হইতে থাকিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ হয় সেবার অবশ্য ওই সকল লক্ষণ এখনও পূর্ণভাবে প্রকাশ হয় নাই।'

মা আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমরাও শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্বাসের তালে তালে নাম করিতে চেষ্টা করিতে পার। শ্বাস গ্রহণ করিবার সময় এতবার এবং ছাড়িবার সময় এতবার নাম করিতে হইবে—তাহা বলিতেছি না। উহা করাও ভাল নয়। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিয়া যাওয়াই ভাল।'

৯ই শ্রাবণ, বুধবার (ইং ২৫।৭।৫৬)

আজ বিকালে গোপীবাবু আশ্রমে আসিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি মায়ের সঙ্গে গোপনে কথা বলিলেন। মৌনের পরও তিনি কিছুক্ষণ মায়ের সহিত কথা বলিলেন। গোপীবাবু চলিয়া গেলে মা আমাকে ডাকিলেন। আমি মায়ের কাছে গেলে মা আমাকে বলিলেন, 'গোপীবাবা যেন ছোটমার সঙ্গ ছাড়িয়া দেয় এইরূপ কথা বলিতে তোমরা আমাকে বলিয়াছিলে না? আজ তাহাই করিয়াছি। গোপীবাবার নিকট শুনিতে পাইলাম যে যাজ্ঞিক নাকি তাহাকে বলিয়াছে যে অখণ্ড মহাযোগের সময় আবার আসিয়াছে, মাত্রই নাকি চার

মাস বাকি। কাজেই গোপীবাবা ছোটমার কাছে গিয়া আবার যেন কৃপাশূন্য কর্মে যোগদান করে। গোপীবাবার নিজের জন্য যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাদের দশজনের জন্য যেন এইরূপ করে। গতবার যে দোষের জন্য ওই অখণ্ড যোগ হয় নাই—উহা এবার সংশোধন করা হইবে। ওই সম্বন্ধে গোপীবাবা ছোটমার সহিত আলাপ করিতে পারে। ছোট মা যেখানে থাকেন সেখানে না গিয়াও অন্য স্থানে ছোটমার সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এই সকল কথা বলিয়া যাজ্ঞিক গোপীবাবাকে আবার ছোটমার কাছে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। তুমি কি মনে কর যে গোপীবাবার ওইখানে গিয়া ছোটমার সহিত দেখা করা উচিত?

আমি। না, মা, গোপীবাবুর নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত নয়।

মা। গোপীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাহার কী ইচ্ছা। তাহাতে সে বলিয়াছিল যে তাহার আর যাইবার ইচ্ছা নাই। তাহার এই কথা ধরিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছি, 'বাবা, তোমার যখন ইচ্ছা নাই তখন তুমি যাইও না। মনে কর যে এই ডাক তোমার সাধনার বিঘ্নরূপেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এর চেয়ে তুমি তোমার গুরুকে লইয়া পড়িয়া থাক। পূর্বে যে ছোটমার কাছে গিয়াছিলে ইহা নিরপেক্ষ লোকেরা ভাল চোখে দেখে নাই। তাহারা বলিয়াছে যে এত বড় একজন পণ্ডিতকে পুতুলের মতো নাচানো হইতেছে। ওই সময়ই বুঝা গিয়াছে কে তোমার প্রকৃত বন্ধু। যাহারা তোমার প্রকৃত বন্ধু তাহারা তোমার ওই অবস্থা দেখিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে।' এইভাবে আমি বাবাকে বলিয়াছি।

আমি। মা, তুমি বেশ বলিয়াছ। আমার মনে হয় গোপীবাবু আর ছোটমার কাছে যাইবেন না।

মা। তবে তাহাকে ওইখানে নিতে চেষ্টা করা হইবে। যাক তুমি এ কথা গোপীবাবাকে বা আর কাহাকেও বলিও না।

ওই সম্বন্ধে মা-র সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইলে আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

১০ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ সন (ইং ২৬।৭।৫৬)

আজ বেলা ১০।। টার সময় মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিলেন।

প্রশ্নকর্তা কেহ ছিলেন না বলিয়া আজ আর কোনও বিষয়ের আলোচনা হইল না। মা পুষ্প ও চিত্রাকে গান করিতে বলিলেন। তাহারা প্রায় এক ঘন্টা কাল গান করিল। তাহাদের গান শেষ হইলে স্বামী শঙ্করানন্দজী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন ইহারা গান করিতেছিল তখন তুমি শূন্যের দিকে তাকাইয়া কী দেখিতেছিলে?'

মা। (হাসিয়া) কিচ্ছু না।

স্বামীজী। তুমি যে গান শুনিতেছিলে না তাহা তো স্পষ্টই বুঝা গেল; কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিলে কী?

মা। (হাসিয়া) হরিবাবার পাঠেও তো এ শরীর এমনি করিয়া বসিয়া থাকে। আর দেখার কথা যে বলিলে, এই তো বলা হইল 'কিচ্ছু না' অর্থাৎ 'অল্প না।' আবার 'কিছু'ও। আবার 'কিছু', 'কিছু না'র কোনও প্রশ্নই নাই। 'হাঁ' ও না, 'না' ও না, যা' বল তাই।

স্বামীজী। শুনিয়াছি ছোট বেলায় তুমি আকাশ পথে দেব দেবী যাইতে দেখিয়াছ। তাই বলিতেছিলাম যে আজ তুমি কী দেখিতেছিলে? এদিকে গান হইতেছে আর তুমি বলদের মতো আকাশের দিকে চাহিয়া আছ। (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) বাবা, আজ তুমি আমাকে একটা ভাল নামই দিলে। আজ বৃহস্পতিবার, গুরুবার, এই দিনে আমার একটা ভাল নামই হইল। (সকলের হাস্য)

মুক্তিবাবা। বলদ অর্থ হইল যে বল দান করে। এই অর্থে নাম ঠিকই হইয়াছে। (সকলের উচ্চহাস্য)

মুক্তিবাবার কথা শুনিয়া মাও খুব হাসিতে লাগিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'মুক্তিবাবা কিনা, তাই মুক্তির পথ বলিয়া দেয়। শঙ্করবাবা ওই কথা বলিয়া একটু মুশকিলেই পড়িয়াছিল।

স্বামীজী। না, মুশকিল আর কী? তোমাকে যাহা বলিতে পারি অন্য কাহাকেও তাহা বলিতে পারি না।

মা। (হাসিয়া) এখানে যা' তা' কিনা, তাই এই শরীরকে তোমরা 'যা তা' বল। যাক একটা ভাল নামই পাওয়া গেল।

মুক্তিবাবা। আজ মায়ের জন্মবার (অর্থাৎ বৃহস্পতি বার) জন্মতিথি (কৃষ্ণা চতুর্থী) তাহার মধ্যে আবার নামকরণও হইল। আমাদের কিছু খাইতে দেওয়া উচিত। (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) আগামীকল্য তোমাদিগকে ব্রহ্ম খিচুড়ি খাইতে দেওয়া হইবে। যেমন নাম দিয়াছ, তেমনই তো খাইবে। (সকলের হাস্য) (শঙ্করানন্দজীকে) বাবা, এ শরীরকে তুমি খুব স্নেহ কর বলিয়া ওই নাম দিতে পারিয়াছ। এই শরীরের মাও এ শরীরকে ওই নাম দিয়াছিল। ছোট বেলায় এ শরীরের মা এ শরীরকে 'বলদী', 'টেলা' বলিত এবং 'বলদী' ছিল স্ত্রীলিঙ্গ। আর বাবা যে নাম দিয়াছে তাহা পুংলিঙ্গ। (সকলের হাস্য) এ শরীরকে লইয়া এই শরীরের মা-র কত ভাবনাই না ছিল। বলিত, 'এর কী উপায় হবে? কোন ঘরে পড়িবে? সেখানে কী করিবে?' এই শরীর আর কী করিবে? যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। যে ঘরে পড়িয়াছিল তাহা জ্বালাইয়া দিয়াছে। (সকলের হাস্য) যাহার হাতে এই শরীরকে দেওয়া হইয়াছিল তাহাকেও সন্ন্যাসী করিয়া ছাড়িয়াছে। (সকলের হাস্য)

আজ মা এমনভাবে কথা বলিতেছিলেন যাহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া কুটিপাটি হইতেছিল।

১৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার (ইং ৩।৮।৫৬)

আজ বিকালে এক মার্কিন সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সম্প্রতি আলমোড়া হইতে আসিয়াছেন। শুনিলাম ইঁহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া সাধু মহাত্মাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। মাকে দেখিয়া ইঁহারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সাহেবটি মাকে বলিয়াছিলেন, 'আমরা ভারতবর্ষের অনেক সাধু মহাত্মা দেখিয়াছি, কিন্তু আপনাকেই সবচেয়ে পবিত্রতম বলিয়া মনে হয়।' এই কথা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, 'এ শরীর তো তোমাদের baby'. মা আমাদিগকে বলিলেন, 'যেই ওই কথা বলা আর অমনি তাহাদের পিতৃমাতৃভাব জাগিয়া উঠিল। সাহেবটি আমার কাছে আসিয়া আমার পিঠে এক হাত রাখিয়া আমার মস্তক স্পর্শ না করিয়া উহার এক পাশে চুমু খাইল। যেমটি আমাকে স্পর্শ করিল না

বটে তবে সেও সাহেবের মতো চুমু খাইল। এ শরীর নিজের বাপ মা হইতে এইভাবে আদর পায় নাই।' এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বিদেশী আগন্তুকও মাকে দর্শন করিয়াই মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা এমন সব ব্যবহার করিতে থাকেন যাহা হইতে মনে হয় মা যেন তাঁহাদের কত আপন জন।

শ্রীশ্রীমায়ের উপবীত গ্রহণের কথা

৩০শে শ্রাবণ, বুধবার (ইং ১৫।৮।৫৬)

আজ সকালবেলা সৎসঙ্গে বসিয়া মা তাঁহার উপবীত ধারণের গল্প বলিলেন। মা বলিলেন, 'এ শরীরে যখন সাধনার খেলা চলিতেছিল তখন এক একটা বিষয়ে এমনভাবে খেয়াল হইত যে উহা তখন না করিয়া উপায় ছিল না। অবশ্য ওইরূপ খেয়াল যে এখনও না হয় তাহা নহে। তবে তখন সাধনার খেলার অবস্থা ছিল বলিয়া উহার একটা ধারা ধরিয়া ওই খেয়াল উপস্থিত হইত। এখন তো এ শরীরের বিশেষ কোনও ধারা নাই। এখন সকল ধারাই এই শরীরের ধারা। কাজেই এখনকার খেয়াল আর তখনকার খেয়ালের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। এখন তোমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার হইয়া যাইতেছে উহা সাধারণ হইতেও সাধারণ। এ শরীরের পূজা, ধ্যান, জপ ইত্যাদি তো কিছুই নাই; এ শরীর দশজনের মতো একজন হইয়া আছে। অথচ ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে খেয়াল হইয়া যাইতেছে। তোমাদের পক্ষে এ অবস্থা ধরা খুব শক্ত।

'একবার ভোলানাথের ভগ্নীপতি কুশারী মহাশয় খুব অনুরোধ করিয়া এই শরীরকে তাহাদের বাসায় লইয়া গিয়াছিল। সে পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর ছিল এবং তাহারা তখন সালকিয়ায় (হাওড়া) থাকিত। কুশারী মহাশয় প্রথম প্রথম এ শরীরকে নিয়া ঠাট্টা ইত্যাদি করিলেও পরে এই শরীরের প্রতি তাহার খুব শ্রদ্ধার ভাব ছিল এবং এ শরীরকে সে খুব ভালওবাসিত। কুশারী মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া এ শরীরের পৈতা লওয়ার একটা খেয়াল হইল। স্ত্রীলোক যে পৈতা লইতে পারে এ কথা এ শরীর কখনও শুনে নাই। অথচ খেয়াল যখন হইয়াছে তখন তো উহা হইতেই হইবে।

'একদিন ভোলানাথের বোন এ শরীরকে সাবান দিয়া স্নান করাইতে বসিল। সে সময় এই শরীরের গলায় একটা সরু লম্বা সোনার হার ছিল। সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার সময় ওই সোনার হারটি পৈতার মতো করিয়া এই শরীরকে পরাইয়া দিল। ওই উপলক্ষ লইয়া এই শরীর বলিতে লাগিল যে এ শরীরের পৈতা হইয়া গেল। আর বাস্তবিক পক্ষে সামবেদীয় পৈতা যতখানি লম্বা হয় ওই সোনার হারটি ততখানি লম্বা ছিল।

'ওই দিন বিকালে আমি বাড়ির সকলকে বলিলাম, 'কিছুদিন হয় এই বাড়ির পাঁচজনের পৈতা হইয়াছে, সেই পাঁচজন আসিয়া আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র শুনাক, কারণ আমার যখন পৈতা হইয়াছে তখন আমার গায়ত্রী মন্ত্র শোনা দরকার। কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখা গেল যাহাদের পৈতা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও গলায় এখন পৈতা নাই। ওই পৈতা ছিঁড়িয়া যাওয়ার পর আর কেহই পৈতা ধারণ করে নাই। এমনকী কুশারী মহাশয়ের গলায়ও পৈতা নাই। এ সব খবর আমি যে না জানিতাম তাহা নয়, তবে এ শরীর সাধারণত এমন কিছু বলে না বা করে না যাহাতে অলৌকিকত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে কথা বাহির করি তাহা এ শরীর সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াই বাহির করিয়া ফেলে। আমি যখন পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আসিয়া গায়ত্রী শুনাইতে বলিলাম তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল বাড়ির কাহারও পৈতা নাই। তখন অন্য এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে গায়ত্রী শুনা হইল। শোনা আর কী? আমি নিজে নিজেই গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম। তবুও একটা যোগ রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী মন্ত্র শুনাইবার কথা বলা হইল।

'পৈতা হইলে ভিক্ষা নিতে হয় এবং ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। তাই তখন আমি বলিতে লাগিলাম, 'আমার যখন পৈতা হইয়াছে আমাকে তোমরা ব্রত ভিক্ষা দেও।' আমার এই সব খেলা দেখিয়া ভোলানাথ বাধা দিতে সাহস পাইল না; কারণ সে জানিত যে আমার খেয়ালে বাধা দিলে বিষম অবস্থা হয়। শরীরের এমন অবস্থা হয় যাহা দেখিয়া উহারা মনে করে যে আমি বোধহয় দেহ ছাড়িয়া চলিলাম। আঙুলগুলি নীল বর্ণ হইয়া যায়, শ্বাসের গতিও বদলাইয়া যায়। হয়তো দুই তিন দিন কোনও জ্ঞানই থাকে না। কিন্তু দুই তিন

দিন পরে যখন ওই অবস্থা হইতে আবার স্বাভাবিক ভাবে আসি তখন শরীরে কোনও গ্লানি দেখা যায় না, শরীরও বেশ সুস্থ সবল। আমি দুই দিন যে কিছু খাই নাই তাহার কোনও চিহ্নই শরীরে নাই। যাক সে কথা।

'আমি ভিক্ষা চাহিলে উহারা আমাকে ভিক্ষা দিল—পৈতা, টাকাপয়সা ইত্যাদি কী কী যেন আমার আঁচলে বাঁধিয়া দিল। আমি একদিন কী তিন দিন নিজকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলাম।

'আরও মজা দেখ, পূর্বে যখন আমরা ঢাকা হইতে বাহির হইতাম তখন যজ্ঞের আগুন কিন্তু সঙ্গে করিয়া আনা হইত না; কিন্তু এইবার ঢাকা হইতে যজ্ঞের আগুন তারাপীঠে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ওই আগুন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। পরে কুশারী মহাশয় এবং তাহার ছেলেদের যখন পুনরায় পৈতা দেওয়া হইল তখন ওই যজ্ঞের আগুন গঙ্গাতীরে নিয়া, গঙ্গা ও অগ্নি স্পর্শ করিয়া ভোলানাথ সকলকেই গায়ত্রী মন্ত্র শুনাইল এবং পৈতা দিল।

'আমাকে ওইভাবে পৈতা গ্রহণ করিতে দেখিয়া, উহাদের অর্থাৎ ভোলানাথ প্রভৃতির মনে সন্দেহ জাগিল যে আমি পৈতা গ্রহণ রূপ অশাস্ত্রীয় কর্ম কেন করিলাম। কারণ শাস্ত্রে তো স্ত্রীলোকের পৈতা গ্রহণের কোনও ব্যবস্থা নাই। তখন ইহারা ওই সম্বন্ধে কাশীর পণ্ডিতদের অভিমত জানিবার জন্য চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে লাগিল। কাশী হইতে পণ্ডিতেরা মত দিলেন যে প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকেরও পৈতার ব্যবস্থা ছিল। সীতা এবং আরও একজন স্ত্রীলোকের পৈতা হওয়ার কথা নাকি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে ওই প্রথা লোপ পাইয়াছে। ইহা জানিয়া উহাদের আমার কর্মের যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা দূর হইল।

ইহার পর মরনীর এবং দিদির (খুকুনীর) পৈতা হইল। দিদির বিবাহ হইলেও সে আজীবন ব্রহ্মচারিণী, কাজেই তাহাকে পৈতা দেওয়া হইল। ভোলানাথের ইচ্ছা ছিল যে মরনী আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া ধর্মজীবন যাপন করে; কিন্তু আমি তাহার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার দেখিয়াছিলাম। খেয়াল হইলে তাহার ওই সংস্কার যে বদলাইয়া দিতে না পারিতাম তাহা নহে, কিন্তু সেরূপ কোনও খেয়াল হইল না। তাই যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন না করিয়া গৃহী

হইয়াও ধর্ম পথে থাকিতে পারে সেইজন্য তাহাকে পৈতা দিয়া উহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

'কুশারী মহাশয়ের বাড়ি গিয়া তাহাদের পৈতা না দেখিয়া যে তাহাদিগকে পৈতা দিবার খেয়াল হইয়াছিল, উহা কেন হইয়াছিল জান? উহা হইয়াছিল একাত্ম বোধ হইতে। যাহারা পৈতা ফেলিয়া দিয়াছিল তাহারা কে? তাহারা তো আমিই। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া আমি কেন অশাস্ত্রীয় জীবন যাপন করিব? ইহাই হইল সকলকে পৈতা দেওয়ার প্রকৃত কারণ। ওইজন্য ওই সময় পৈতা লইয়া এই ব্যাপারগুলি হইয়া গেল। ওই সময় কুশারী মহাশয়কেও আমি বলিয়াছিলাম, 'ছেলেরা যে পৈতা ফেলিয়া দিয়াছে সে জন্য দোষী তুমিই। যদি তুমি নিজে পৈতা ফেলিয়া না দিতে এবং দুই বেলা ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত কাজ করিয়া যাইতে তবে তোমার ছেলেরাও তোমাকে আদর্শ করিয়া ওই সকল কর্ম করিত এবং উহা করা যে উচিত তাহা বুঝিতে পারিত। প্রত্যেক পিতাই সন্তানের কাছে আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত।

'আবার এই পৈতার ব্যাপার নিয়া ভোলানাথ কটাক্ষ করাতে এ শরীরের ভাবের এক বিষম পরিবর্তন হইয়াছিল—দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে পড়িতে এ শরীর অসাড়ের মতো হইয়াছিল যাহা দেখিয়া ভোলানাথ এবং অন্যান্য সকলেই খুব অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। এই শরীরের পরিবর্তনের কারণ ইহা নয় যে এই শরীরকে কিছু বলা হইয়াছিল, ধর্মের উপর অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ভাব যে দেখানো হইয়াছিল, উহাই ছিল প্রকৃত কারণ। সেই সময় কাহাকেও ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে দেখিলে শরীরের এক বিষম পরিবর্তন হইত। শরীর যেন উহা সহ্য করিতে পারিত না। ওইরূপ দেখা এবং শোনার চেয়ে দেহপাত হওয়াও ভাল এইরূপ একটা ভাবের প্রকাশ হইত।

'তোমরা জান ঢাকায় একবার সাধুবেশধারী একজন আসিয়াছিল। সে নিজেকে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার বলিয়া প্রচার করিত। চৈতন্যদেবের যেমন কীর্তনে ভাব হইত তাহারও নাকি সেই সব হইত। তোমাদের আশ্রমের অনেকেই তাহার কাছে যাইত। তাহার চেহারা এবং ভাব দেখিয়া আসিয়া তাহারা খুব প্রশংসা করিত। যদিও এই শরীর ওই লোকটির অবস্থা সবই জানিত তবুও

তাহার সম্বন্ধে এ শরীর কখনও কিছু বলে নাই। এ শরীরের ধারাই এই যে কেহ যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়—সে যত খারাপ প্রকৃতির লোকই হউক না কেন এই শরীর হইতে সচরাচর এমন কোনও কথা বাহির হয় না যাহাতে তাহার শ্রদ্ধায় আঘাত লাগিতে পারে। কিন্তু একদিন যে তাহার ভুল ভাঙিবে এবং সেজন্য মনে কষ্ট পাইবে সেই ব্যথা এবং ধর্ম লইয়া প্রবঞ্চনা করার সমস্ত গ্লানি এই শরীরে প্রকাশ পাইয়া শরীরটা যেন কেমন হইয়া যাইত। ইহাও কিন্তু ওই একাত্মবোধ হইতে। কারণ এ প্রবঞ্চনা কে করিতেছে এবং কেই বা প্রাণে কষ্ট পাইতেছে? সেও তো এই শরীরই।

১ লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার (ইং ১৭।৮।৫৬)

আজ সৎসঙ্গে সান্যাল মহাশয় মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা ভাবে প্রশ্ন করিতে থাকেন। মাও তাঁহার স্বাভাবিক কৌশলে এমনভাবে ওই সকল প্রশ্নের দ্ব্যর্থক উত্তর দিতে থাকেন যাহা হইতে অনেকেরই মায়ের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব ছিল না। এই সকল কথাবার্তার সময় সান্যাল মহাশয় কথায় কথায় মাকে বলিয়াছিলেন, 'আপনার কথা সর্বদা শাস্ত্রানুগত কেন না আপনার সম্মুখে সর্বদাই শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রালোচনা হয় কিনা।'

এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, 'অনেকেই মনে করে যে এই শরীর হরিবাবা প্রভৃতির নিকট যে সকল শাস্ত্রীয় কথা শোনে উহাই মনে রাখিয়া পরে কথা বলিবার সময় ওই সকল কথা বলিয়া থাকে। (সান্যাল মহাশয়কে) বাবা, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর তোমাকে একটি কথা বলিয়া রাখি—এই শরীরের সম্মুখে গীতা, চন্ডী, ভাগবত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ পাঠ হয় অথবা এই শরীরের সম্মুখে সাধুরা যে সকল ধর্মালোচনা করে উহার কিছুই এ শরীর শুনিয়া জমা করিয়া রাখে না। ওইসব পাঠ বা আলোচনার সময় এ শরীরের উপস্থিত থাকাও যা' না থাকাও তা'ই। এ শরীরের এমন কোনও স্থান নাই যেখানে ওইগুলি জমা করিয়া রাখিবে। তবে অনেক সময় এ শবীর বলে যে 'আমি অমুকের নিকট ইহা শুনিয়াছি,' 'অমুকে বলিয়াছে যে এই কথাগুলি এই গ্রন্থে আছে।' ইহা কী ভাব হইতে বলা হয় তাহাও বলিতেছি। যাহাকে 'অমুক' বলিয়া বলিতেছি, বা যে গ্রন্থের কথা বলিতেছি বা যে কথাগুলি বলিতেছি,

সেগুলি কী? সেগুলি তো আমিই বা তিনিই। কাজেই এখানে শুনিয়া জমা করিয়া রাখিয়া পরে বলার কোনও অর্থ হয় না। এ শরীরের কাছে এক ছাড়া তো দ্বিতীয় কিছু নাই।

'অনেক সময় কথা বলিতে বলিতে কাহারও দিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হইল। ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য যাহারা আছে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য নাই। এই শরীর সকলের মধ্যেই আছে আবার সকলেই এই শরীরের মধ্যে আছে। এখানে খণ্ড ব্যবহার করিয়াও অখণ্ড স্থিতি, আবার অখণ্ডে স্থিত থাকিয়াও খণ্ড ব্যবহার।'

এই জাতীয় কথা মা অনেক বলিলেন। আজকাল মায়ের মুখে এই জাতীয় কথাই বেশি শুনা যাইতেছে। মা যেন এখন আর তাঁহার স্বরূপ গোপন করিতেছেন না। তবে আমাদের সকলের পক্ষে উহা বুঝা এবং বুঝিয়া নির্দ্বন্দ্বভাবে আত্মসমর্পণ করা হইয়া উঠিতেছে কই?

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন

৯ই ভাদ্র, শনিবার (ইং ২৫। ৮। ৫৬)

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি কৃষ্ণাচতুর্থী। মায়ের জন্মোৎসবের পর এইবার স্থির হইয়াছে যে প্রতিমাসেই কৃষ্ণাচতুর্থীর দিন আশ্রমে সংযম ব্রত পালন করা হইবে। ইচ্ছা করিলে বাহিরের ভক্তগণও ইহাতে যোগ দিতে পারেন। ওইদিন একবেলা ভাতে ভাত কী এক তরকারি ভাত খাইতে হইবে। রাত্রিতে শুধু দুগ্ধ পান করিতে হইবে। রাত্রি তিনটা হইতে কিছুক্ষণ কীর্তন করিয়া পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত ধ্যান। পরে পাঠ কীর্তনাদি, বিকালেও ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ধ্যান। পরে পাঠাদি ৫।। টা পর্যন্ত চলিবে।

আজ সকালবেলা ধ্যানের সময় আশ্রমে উপস্থিত ছিলাম। যদিও এই সময় মায়ের উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু মা উপস্থিত ছিলেন না। আমি এক ঘন্টা আশ্রমে থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। পরে আবার ১০।। টায় আশ্রমে গেলাম।

আলাউদ্দীন খাঁর একটি ছাত্র নাম শ্রীযতীন ভট্টাচার্য আজ মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। এই ছেলেটি প্রায় দুইমাস পূর্বে মাকে একদিন সরোদ বাজনা শুনাইয়াছিল। ছেলেটিকে দেখিয়া মা তাহাকে কাছে ডাকিয়া

নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেটি নাম বলিলে মা তাহাকে একটি মালা দিলেন, পরে একটি বেলপাতা দিয়া বলিলেন, 'পাতাটি খাইয়া ফেল, যদি সবটা খাইতে না পার তবে বাকিটুকু গঙ্গায় দিও।'

এই বেলপাতাটি একটি ভক্ত মায়ের মস্তকে দিয়াছিল। বেলপাতাটিতে বোধহয় কোনও বীজ মন্ত্র লেখা ছিল, কারণ মা মাথা হইতে বেলপাতাটি হাতে নিয়া একটু দেখিয়া উহা আবার নারায়ণ স্বামীকে পড়িতে দিলেন। ব্যাপারটি দেখিয়া মনে হইল মা যেন ছেলেটিকে দীক্ষা জাতীয় কিছু দিলেন। আর একবার গুরুপূর্ণিমার সময়ও এইভাবে কয়েকজনের দীক্ষা হইয়াছিল। ছেলেটি কিন্তু দীক্ষার্থী ছিল না। মা যাহা করিলেন তাহা অযাচিত ভাবেই করিলেন। ইহাকেই বলে অহৈতুকী কৃপা। পরে মা ছেলেটিকে কিছু মিষ্টি প্রসাদ দিতে বলিলেন। নারায়ণ স্বামীজী গোপালের ভোগের প্রসাদ আনিয়া ছেলেটিকে এবং আমাদিগকে দিলেন। ছেলেটি বিদায় হইবার সময় মা তাহাকে একটি পদ্মফুলও দিলেন।

আজ বিকালেও ধ্যান হইল। এই সময় মা উপস্থিত ছিলেন।

১১ই ভাদ্র, সোমবার (ইং ২৭। ৮। ৫৬)

আজ সৎসঙ্গে শ্রীমান হীরু মাকে নানা বিষয় প্রশ্ন করিতেছিল এবং মা উহার যে উত্তর দিতেছিলেন তাহা ভাল করিয়া না শুনিয়াই আবার ওই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিল। তাহাকে ওইরূপ করিতে দেখিয়া মা বলিলেন, 'এক পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার কোনও ছাত্রকে কোনও একটি বিষয় বুঝাইতে ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বুঝাইয়া যাইতেছেন আর ছাত্রটি লক্ষ্য করিতেছে একটি ইন্দুরকে, যে একবার গর্তের মধ্যে ঢুকিতেছে আবার ওই গর্ত হইতে বাহির হইতেছে। ছেলেটি দেখিতেছে যে ইন্দুরের সমস্ত শরীর গর্তের মধ্যে ঢুকিলেও তাহার লেজের খানিকটা বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। এদিকে পণ্ডিত মহাশয় অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, এখন বিষয়টি মাথায় ঢুকিল তো?' ছেলেটি ইন্দুরের খেলা দেখিতে এত মত্ত যে সে ওই 'ঢুকিল' কথাটি শুনিয়া বলিয়া উঠিল, 'না, পণ্ডিত মহাশয়, এখনও লেজের একটু অংশ বাকি আছে।' (সকলের হাস্য) মা বলিলেন, 'তোমাদের বুঝাও ওইরূপ। লেজের একটু অংশ বাকি থাকিয়াই যায়।'

সান্যাল মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন আছে—যদি আমরা ভগবানকে সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান, পরম দয়ালু ইত্যাদি বলিয়া শুনিতে পারি বা চিন্তা করি তাহা হইলেই কি ভগবানের প্রতি আমাদের প্রেম ভালবাসা হইবে?

মা। হাঁ, ভগবত কথা শ্রবণ এবং ভগবানের বিষয় চিন্তা হইতেই মন ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে চলিয়া যায়।

সান্যাল মহাশয়। শুধু শুনিয়া গেলেই ভগবানের প্রতি ভালবাসা হয়?

মা। হাঁ, যদি ঠিক ঠিক শোনা হয়। এই শরীর যখন বাজিতপুরে ছিল তখন ভোলানাথের ভাইপো আশুও ওইখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। ভোলানাথের বাসাটা ছিল পুকুরের এক পারে আর উহার অপর পারেই ছিল পুলিশ ইনসপেক্টরের বাসা। তাহার ছেলেও আশুর সঙ্গে স্কুলে যাইত। একদিন আশু তাহাকে বলিল, "তোর বাপ মা নাই। তুই যাহাদের কাছে আছিস তাহারা তো তোর আসল বাপ মা নয়। কেননা, তুই হইলি পোষ্যপুত্র। এই কথা শুনিয়া ছেলেটি বাড়িতে গিয়া তাহার মাকে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি আমার মা নও? তবে আমার মা কোথায়?" এই কথা বলিতেছে আর চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে। ছেলের মা আসিয়া এই শরীরকে বলিল, 'আপনি আশুকে বলিয়া দিবেন সে যেন খোকাকে আর ওই কথা না বলে।'

বাস্তবিক পক্ষে শিশু তো তাহার বাপ মাকে নিজ হইতে চিনিতে পারে না। সে অপরের মুখে শুনিয়া শুনিয়াই তাহার বাপ মাকে চিনিয়া লয়। সেইরূপ আমরাও যে ভগবানকে জানি ও ভালবাসি তাহাও শুনিয়া শুনিয়াই হয়। যদি শোনার মতো শোনা হয় তবেই লোকে সোনা হইয়া যায়।'

শঙ্করানন্দ স্বামী। এই বাক্যালঙ্কারগুলি তুমি তোমার কোনও বাবার নিকট শিখিয়াছ?

মা। (হাসিয়া) তোমার কথায় আমার আরও একটা কথা খেয়ালে আসিতেছে। এই শরীরের যখন সাধনার খেলাটা চলিতেছিল তখন এ শরীর সংসারের সমস্ত কাজই করিত আবার কখনও কখনও এলাইয়া পড়িয়া থাকিত।

ওইভাবে পড়িয়া থাকার কোনও সময় অসময় ছিল না। হয়তো তরকারি কাটিতেছি, কাটিতে কাটিতেই ওইখানে শরীরটা এলাইয়া পড়িল। কোথায় রহিল বঁটি আর কোথায় রহিল তরকারি। ওইভাবে হয়তো দুই তিন ঘন্টা কাটিয়া গেল। মশলা পিষিতেছি, পিষিতে পিষিতেই এলাইয়া পড়িয়া গেলাম। হয়তো সারাদিন জ্ঞানই হইল না। ভোলানাথ এ অবস্থা দেখিয়া কিছু বলিত না, কারণ সেও জানিত যে এই শরীর ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না। বাউলবাবু ভোলানাথের বন্ধু ছিল। সে মাঝে মাঝে শা'বাগে আসিত। সে একদিন এই শরীরের ওই অবস্থা দেখিয়া বলিল, 'আমি মশলা গুড়া করিয়া আনিয়া দিব, তাহা হইলে আর মশলা পিষিতে হইবে না।'

'ভোলানাথের তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সেইজন্য পাতিলে আগুন রাখিতে হইত। একদিন ওই আগুনের কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় শরীরের ওই অবস্থা হইল এবং হাতখানা গিয়া আগুনের মধ্যে পড়িল। আঙুলগুলি যে পুড়িয়া যাইতেছে সে জ্ঞান নাই। ভোলানাথ আসিয়া ওই অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে এ শরীরকে বলিল, 'আচ্ছা, আগুনে হাত পড়িলে যেমন তুমি উহার উত্তাপ বুঝিতে পার না, তোমার মুখে যদি মরিচ দেওয়া যায় তাহা হইলেও কি তুমি উহার ঝাল বুঝিতে পারিবে না?' আমি বলিলাম, 'মুখে দিয়া দেখিলেই পার।' ঠিক এই সময় বাউলবাবু মশলার গুড়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত। উহার মধ্যে মরিচের গুড়াও ছিল। ভোলানাথ তখন এ শরীরকে পরীক্ষা করিবার জন্য মুঠি মুঠি মরিচের গুড়া এই শরীরকে খাওয়াইয়া দিল। এ শরীরের তখন মনে হইতেছিল যে তাহাকে যেন ছাতু খাওয়ানো হইতেছে, ঝাল লাগা তো দূরের কথা।

ইহার ফলে হইল কী, ওই দিনই ভোলানাথের জ্বর আসিল এবং রক্ত পায়খানা হইতে লাগিল। ওই যে ভোলানাথ বিছানা লইল, তাহার আর কোনও হুঁশ নাই। এইভাবে ১৫।১৬ দিন কাটিয়া গেল। আর এ শরীর দিন রাত্রি তাহার কাছে থাকিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। বাউলবাবুও রাত্রিবেলা আসিয়া থাকিত। দিনের বেলা তাহার কাজকর্ম থাকিত বলিয়া সে আসিতে পারিত না। ভোলানাথের ভগ্নীও তখন শা'বাগে ছিল। এদিকে

ডাক্তারী চিকিৎসাও চলিতে লাগিল। একজন বড় ডাক্তারই চিকিৎসা করিতেছিল।

'একদিন আমি বাউলবাবুকে বলিলাম যে, সে যেন কিছু চিড়া কিনিয়া আনে। সে উহা আনিলে আমি উহার খানিকটা ভিজাইয়া রাখিলাম। পরদিন রাত্রিবেলা দেখা গেল যে ভোলানাথের বিষম বিকার অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। সে দাঁত কিটিমিটি করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে এবং সকলকে নখ দিয়া আঁচড়াইয়া দিতেছে। তাহাকে আমি জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'এভাবে পরীক্ষা করা কি ঠিক?' সেও বলিয়া উঠিল, 'আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা কর। আমি এরূপ আর কখনও করিব না।' তখন আগের দিনের যে চিড়া ভিজান ছিল তাহা ভাল করিয়া চটকাইয়া উহার এক গ্লাস ভোলানাথকে খাওয়াইয়া দিলাম। উহা দেওয়ার পরই তাহার শরীরের জ্বর এবং অন্যান্য গ্লানি কাটিয়া গেল। দুই একদিন সামান্য একটু জ্বর ছিল, তাহাও ঔষধ খাইয়া সারিয়া গেল। ১৮ দিনের দিন সে সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া উঠিল।

'প্রাণগোপাল বাবা যখন এই ঘটনার কথা শুনিতে পাইল, তখন সে এ শরীরকে বলিয়াছিল, 'তুমি এই গুরুমারা বিদ্যা কোথায় শিখিলে?' (সকলের হাস্য)

সান্যাল মহাশয়। আপনি তো বড় ভয়ানক লোক! (সকলের হাস্য) এখন হইতে আপনার সঙ্গে ব্যবহার করিতে সাবধান হইতে হইবে।

মা। (হাসিয়া) বাবার এই শরীরের উপর যে বিশ্বাস আছে অর্থাৎ এই শরীর যে বাবার কিছু করিবে না—এই বিশ্বাসই বাবাকে রক্ষা করিবে।

হীরু। মরিচের গুড়া খাইলেন আপনি, ভোলানাথের জ্বর এবং রক্তদাস্ত হইল কেন?

মা। একথা বুঝাইয়া বলিতে অনেকক্ষণ লাগিবে। বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। তবে সংক্ষেপে বলিতে পারি যে মুখ তো একটাই। কাজেই এই শরীর মরিচ খাইলেও উহা ভোলনাথেরই খাওয়া হইয়াছে এবং যাহা ভোগ করিবার তাহা হইয়া গিয়াছে। আবার এরূপও দেখা গিয়াছে যে অন্যে খাইলেও এই শরীরের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। একবার মুসৌরীতে গিয়াছি,

তখন গরমের সময়। রাস্তা দিয়া চড়াই ভাঙিয়া উঠিতেছি, তখন দেখিতেছি কি যে গলা যেন শুকাইয়া যাইতেছে। এমন সময় কোনও ঠান্ডা জিনিস খাইলে শুষ্ক গলা যেমন ঠান্ডা হইয়া যায় সেইরূপ এ শরীরেরও গলা ঠান্ডা হইয়া গেল। পরে জানা গিয়াছিল যে ওইদিন ওই সময়ে অটলবাবুর স্ত্রী এ শরীরকে সরবত ভোগ দিয়াছিল। তাই দেখ, ভোগ দেওয়া হইল কোথায় আর গলা ঠান্ডা হইল কোথায়!

কাশীতে জন্মাষ্টমী উৎসব

১৩ই ভাদ্র, বুধবার (ইং ২৯।৮।৫৬)

আজ জন্মাষ্টমী। আশ্রমে জন্মাষ্টমীর উৎসব এইবার খুব ধুমধামের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। খুকুনীদিদির জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তাঁহার গোপাল মায়ের আশ্রমে আনিয়া জন্মাষ্টমীর উৎসব করিতেছেন। এই গোপালকে চন্ডীমণ্ডপে বসানো হইয়াছে এবং সকালবেলা হইতেই এখানে কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে, যাহা অহোরাত্র চলিবে।

মায়ের আশ্রমে যে গোপাল আছেন তাঁহাকেও আজ সকালে ৭টার সময় কীর্তন সহ মাতৃমণ্ডপে আনা হইয়াছে। ওইখানে বেদির উপর এই গোপাল বসানো হইয়াছে। ওই স্থানটি ফুল পাতা এবং রঙিন ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়া অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। গোপালের পূজার স্থানটি একটি রেলিং দিয়া পৃথক করা হইয়াছে। বেলা ন'টা হইতে গোপালের বিশেষ পূজা আরম্ভ হইয়াছে। মাখন* এই পূজা করে। বাটুদাদা এবং নারায়ণ স্বামী মাখনকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

গোপালের পূজা হইলে গোপালকে জার্মান সিলভারের বড় একটি তুলা দণ্ডে (দাঁড়ি পাল্লায়) বসাইয়া প্রথমে তুলসীপত্র দিয়া ওজন করা হইল। শুনিয়াছিলাম যে গোপালের ওজন ১৫ সের হইতে আধ মণের মধ্যে। তুলসীপত্রের পর পঞ্চামৃত, বাতাসা, ফল, অষ্টধাতুর বিভিন্ন বাসন, তিল, চাউল, বস্ত্র এবং ঘৃত দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে ওজন করা হইল। তুলার ওজন করার সময় মা গোপীবাবুকে গোপালকে ধরিয়া থাকিতে বলেন। তিনিও তাহাই

* শ্রীশ্রীমার কনিষ্ঠভ্রাতা—শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য।

করিয়াছিলেন। প্রতিবার ওজনের সঙ্গে গোপালকে কর্পূর দ্বারা আরতি করা হইয়াছিল। মা নিজেই গোপালকে কিছুক্ষণ চামর ব্যজন করিয়া উহা অপরকে করিতে বলিলেন এবং নিজে সকলকে সঙ্গে লইয়া 'গোবিন্দ গোপাল, গোবিন্দ গোপাল, প্রাণ গোপাল, ব্রজ গোপাল', বলিয়া গান করিতে লাগিলেন।

আজ সকালবেলা হইতেই মা সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং আবশ্যক মতো নির্দেশ দিতেছিলেন। মায়ের এই আনন্দময় সক্রিয় মূর্তি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। ইহার পর মা নিজেই সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। সকালবেলার অনুষ্ঠান শেষ হইতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

রাত্রিবেলা গোপালের আবার পূজা হইল। এই পূজা শেষ হইতে প্রায় ১।। টা বাজিয়া গেল। আমরা প্রসাদ পাইয়া রাত্রি ২টায় বাসায় ফিরিলাম।

১৫ই ভাদ্র, শুক্রবার, (ইং ৩১। ৮। ৫৬)

জন্মাষ্টমীর দিন গোপালকে যে তুলাদণ্ডে ওজন করা হইয়াছিল আজ সকালবেলা সেই কথা উঠিলে মা বলিলেন, 'জন্মোৎসবের সময় এই শরীরের তুলাদানের কথা যখন দিদি (খুকুনী) বলে সেই সময় এই শরীর বলিয়াছিল যে যদি তুলাদান করিতে হয় তবে আশ্রমের নারায়ণ আছে, গোপাল আছে— তাহাদেরও তুলাদান করা হউক। এই শরীরের আবার তুলাদান কী করবি? কিন্তু উহারা ওই কথা শুনিল না। তুলাদান করিবার সময় এই শরীর নারায়ণকে কোলে করিয়া বসিল অর্থাৎ এ শরীর নারায়ণের আসন রূপে তুলার উপর বসিল। গোপালকে ওই সঙ্গে লওয়া গেল না কারণ দোলযাত্রা এবং জন্মাষ্টমী ব্যতীত বৎসরে আর কোনওদিন নাকি গোপালকে আসন হইতে নামানো যায় না। এই শরীরের মুখ হইতে ওইরূপ কথা বাহির হইয়াছিল বলিয়া গোপাল উহা পূর্ণ করিয়া নিলেন। তাহা ছাড়া দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে যেরূপ ধুমধাম করা হয় জন্মাষ্টমীতেও যে সেইরূপ হইতে পারে তাহাও গোপাল এবার দেখাইয়া দিলেন।

'গোপালকে প্রথমত ৪।৫ পদ দিয়া ওজন করিবার কথা উঠে কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে ৯ পদ দিয়া ওজন করা হইল। ঘি, কাপড়, চাউল ইত্যাদি দ্বারা

ওজন করার কথা পূর্বে ছিল না। আর ওজনের সময় দেখা গিয়াছে যে গোপালের ওজন সমান ভাবে থাকে নাই, কখনও কম, কখনও বেশি হইয়াছে। গোপাল জাগ্রত কিনা! কাপড় দিয়া ওজন করার সময় গোপালের ওজন বেশি হইয়াছিল। বস্ত্রহরণ করা গোপালের অভ্যাস কিনা তাই কাপড়ের উপর তাঁহার লোভ বেশি। যাক্ গোপাল বেশি কাপড় নিয়া উহা আবার বিলাইয়া দিলেন, কারণ ওই সব জিনিস সবই দান করা হইয়াছে।'

আমি। গোপালের ওজন যে কখনও কমিয়াছে এবং কখনও বাড়িয়াছে তাহার প্রমাণ কী? চাউল, তিল, বাতাসা ইত্যাদি আধামণ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছিল, কিন্তু ওইভাবে তো কাপড় সংগ্রহ করা হয় নাই। অথচ তুমি বলিলে যে কাপড় দিয়া ওজন করিবার সময় গোপালের ওজন বাড়িয়া গিয়াছিল।

মা। প্রমাণ দেওয়ার মতো অবশ্য কিছু নাই। তবে হাতের ওজনে দেখা গিয়াছিল যে অন্যান্য জিনিস অপেক্ষা কাপড় বেশি লাগিল।

ডা. পান্নালাল। গোপালকে কাপড় দিয়া ওজন করিবার সময় আপনি এইরূপ করিলেন কেন যেন ওজন ঠিক ঠিক হয়, যেন গোপালের ওজন কাপড়ের চেয়ে একচুল বেশি বা কম না হয়?

মা। উহা এই শরীরের খেয়াল হইতে হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত জিনিসই গোপালের ওজন হইতে বেশি বেশি ছিল। কাপড় দিয়া প্রথম যখন ওজন করা হয় তখনও কাপড়ের ওজন গোপাল হইতে বেশি। কিন্তু পরে এই শরীরের খেয়াল হইল যে অন্তত কাপড়ের ওজন যাহাতে গোপালের সমান সমান হয়। এইজন্য উদ্বৃত কাপড়গুলি নামাইয়া রাখিয়া কাপড়ের সঙ্গে কিছু ঘি দিয়া ওজন করা হইল, কারণ কাপড় দিয়া সমান সমান ওজন হওয়া মুশকিল, কেন না কাপড় তো আর ছিঁড়িয়া দেওয়া যাইবে না। সেইজন্য ঘি দেওয়া হইল, যাহা ইচ্ছামত কমানো বাড়ানো যায়। তাহা ছাড়া ঘি দিয়া যে পরে ওজন করা হইবে উহারও সূত্রপাত তখনই করিয়া রাখা হইল। ওজনের জন্য যে ঘি আনা হইয়াছিল উহা ভয়ানক গরম ছিল বলিয়া অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে উহা দ্বারা গোপালের ওজন হইতে পারে নাই।

'আরও একটা মজার ব্যাপার! যখন ঘি আনিতে বলা হয় তখন হঠাৎ এ শরীরের মুখ হইতে ১৫ সের ঘি আনার কথা বাহির হইয়াছিল। সেই অনুসারে ১৫ সের ভাল ঘি জোগাড় করিয়া আনা হইয়াছিল। যদি ওজন করিতে গিয়া দেখা যাইত যে ঘি কম পড়িয়াছে তবে তখন তখনই ৪।৫ সের ঘি জোগাড় করা মুশকিল হইত। কিন্তু ১৫ সের ঘি যখন তুলায় উঠাইয়া দেওয়া হইল তখন দেখা গেল যে ১৫ সের ঘি-ই গোপাল হইতে ওজনে বেশি।'

এই কথা বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। মায়ের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে ঘি দিয়া ওজন করিবার সময় গোপাল বোধহয় ওজনে কম হইয়া গেলেন কারণ মা এক সময় বলিয়াছিলেন যে গোপালের ওজন প্রায় আধা মণের কাছাকাছি হইবে।

ডা. পান্নালাল। গোপালকে মাপার সময় গোপীবাবুকে গোপাল স্পর্শ করিয়া থাকিতে বলিয়ছিলেন কেন?

মা। পাছে গোপাল ঝাঁকি লাগিয়া তুলাদণ্ড হইতে পড়িয়া যান, সেই ভয়ে একজন পণ্ডিত, সাধক এবং যোগীকে গোপাল রক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল। অবশ্য আমি গোপীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ওইভাবে গোপাল ধরিয়া থাকিতে তাহার কোনও বাধা আছে কিনা। বাবা বলিয়াছিল 'ইহাতে আবার বাধা কী?'

মুক্তিবাবা। গোপী ভিন্ন গোপালকে আর কে ধরিবে? (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) যাহা গুহ্য ছিল তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া দিলে?

১৬ই ভাদ্র, শনিবার (ইং ১। ৯। ৫৬)

আজ রাত্রিতে একজন সাধুর কথা উঠিল যাঁহার মধ্যে বিশ্বকল্যাণ সাধন করার ভাব বারবার জাগিয়া উঠিতেছে। কোনও এক বিশেষ দেবতার দর্শন অথবা চিন্তন হইতেই ওই ভাবের স্ফুরণ হয়। একবার তিনি ওই দেবতা হইতে নাম প্রচার করারও আদেশ পান। সেই অনুসারে তিনি তাঁহার ভক্ত এবং শিষ্যগণ সহ কিছুদিন নাম প্রচার করেন। মাঝে মাঝে মৌন থাকিবার প্রেরণাও তিনি ভিতর হইতে পান। সাধুটি জানিতে চাহিয়াছেন উহার মূল কারণ কী? মাকে ওই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে

মা বলিলেন, 'ওই সাধু তাহার নিজের সম্বন্ধে চিঠিতে যাহা লিখিয়াছে তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে উহার মধ্যেই তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।'

সাধুকে লক্ষ্য করিয়া কোনও কথা না বলিয়া মা আমাদিগকে সাধারণ ভাবে বলিলেন, 'সাধনরাজ্যে অনুভূতি অনন্ত এবং উহার প্রকাশও অনন্ত। কাহারও ভিতর জনসেবা বা বিশ্বকল্যাণের বাসনা সুপ্ত ভাবে থাকিলে সাধনার সময় উহার প্রকাশও হইয়া যাইতে পারে। আবার ঊর্ধ্ব হইতেও একটা প্রেরণা আসিতে পারে। কোন প্রেরণাটা নিজের সুপ্ত বাসনার জন্য এবং কোন প্রেরণাটা ঊর্ধ্বশক্তির ক্রিয়ার জন্য তাহা ধরা বড় শক্ত।

'কেহ কেহ এরূপও বলে যে তাহারা দেবদেবী বা ভগবান কিছুই মানে না, জনসেবাই তাহাদের নিকট পরমধর্ম বলিয়া মনে হয় এবং তাহারা আনন্দের সহিত জনসেবাই করিয়া যায়। এইভাবে তাহারা যে আনন্দ পায় উহা জাগতিক আনন্দ। এই আনন্দের মূলে যে প্রশংসা এবং প্রতিষ্ঠা লাভের ভাব প্রচ্ছন্ন আছে তাহা তাহারা জানিতে পারে না। কিন্তু ইহারাই যখন আবার আধ্যাত্মিক পথে চলিতে থাকে তখন সকলকে লইয়া নাম কীর্তন কী সদালোচনা করার ভাবটা দেখা যায়। আবার অনেকে ধ্যান জপ লইয়া এমন গভীর ভাবে মত্ত হইয়া যায় যে তখন আর তাহাদের অন্যের কথা মনে থাকে না। এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু এখানে ব্যক্তি বিশেষের কথা আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ওই সম্বন্ধে কথাগুলি বলা আসিতেছে না। বলিতে গেলেও ভাঙিয়া ভাঙিয়া যাইতেছে।'

১৭ই ভাদ্র, রবিবার (ইং ২। ৯। ৫৬)

আজ রাত্রিতে মৌনের পর মা নিজ হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'গতকাল রাত্রিতে এক সাধু আসিয়াছিলেন। তিনি এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছেন। সারাদিন এক পায়ে দাঁড়াইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকেন। যদি বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য স্থান পরিবর্তন করিতে হয় তবে এক পা এবং লাঠির সাহায্যে তাহা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় পা ব্যবহার করেন না। সাত আট মাস

শ্রীশ্রীমার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীগোপালজীর তুলাদান উৎসব

কাশী আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত সদাজাগ্রত শ্রীশ্রী গোপালজী

পরে নাকি পা পরিবর্তন করিয়া নেন। অনেকদিন যাবৎ তিনি এইভাবে তপস্যা করিয়া আসিতেছেন। মুখের ভাবটাও বেশ প্রশান্ত।

ডা.পান্নালাল। এইরূপ কষ্ট করিয়া লাভ কী?

মা। ইহাতে ধৈর্য শিক্ষা হয়। প্রথম কষ্ট হইলেও পরে অভ্যাসের ফলে আর তেমন কষ্ট হয় না।

ডা। পান্নালাল। সেদিন আপনি আগুনে আপনার আঙুল পুড়িয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময় আপনার আঙুলে আগুনের স্পর্শ হেতু যে যন্ত্রণা হইয়াছিল তাহা কি আপনি ধৈর্য ধরিয়া সহ্য করিয়াছিলেন?

মা। না, ওই স্থিতিতে জ্বালা যন্ত্রণার কোনও বোধই থাকে না। কাজেই ওইখানে তিতিক্ষার কোনও প্রশ্নই নাই। তবে সাধককে প্রথমে কষ্ট স্বীকার করিয়া ধৈর্য শিক্ষা করিতে হয়। পরে তাহার এমন একটা স্থিতি আসে যখন সে তিতিক্ষাস্বরূপ হইয়া যায়। ওই স্থিতিতে তিতিক্ষার কোনও প্রশ্নই থাকে না। আবার এমন অবস্থাও আছে যেখানে স্থিতি অস্থিতির কোনও প্রশ্নই নাই।

শ্রীশ্রীমা-র দেহের বিচিত্র সব অবস্থা

মা। আবার আগুন দিয়াই যে সর্বদা শরীর জ্বালাইতে হয় এমন নহে। আগুনের সাহায্য ছাড়াও শরীর জ্বলিয়া উঠিতে পারে। যেমন বলা হয় যে যোগাগ্নিতে সতীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। এখানে বাহিরের আগুনের কোনও প্রয়োজন হয় না। দেহের ভিতর হইতেই আগুন জ্বলিয়া দেহখানি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে।

ঢাকার শা'বাগে থাকিতে একবার ওইভাবে শরীর জ্বালাইবার খেয়াল হইয়াছিল এবং ওই জন্য এই শরীর আসন করিয়াও বসিয়াছিল। কিন্তু ভোলানাথ ভয় পাইয়া এই শরীরকে ধরিয়া আসন হইতে উঠাইয়া ফেলে।

আমি। মা, ভোলানাথ কীভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তুমি আসন করিয়া নিজেকে ভস্ম করিতে যাইতেছ।

মা। এই শরীরের গতিবিধি দেখিয়া অনেক সময় উহারা এ শরীর কী করিবে বা করিতে যাইতেছে তাহা অনুমান করিতে পারিত। যেমন ঢাকা আশ্রমের কালীর হাত ভাঙা হইলে দিদি কক্সবাজারে আমার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে

পারিয়াছিল যে আমি বুঝি দা দিয়া নিজের হাত কাটিয়া ফেলিব। সেইজন্য সে দা, ছুরি ইত্যাদি যাহা পাইয়াছিল তাহা লুকাইয়া রাখিতেছিল। আমি কিন্তু তাহাকে মুখে কিছু বলি নাই। আমি কী করিতে পারি তাহা সে আমার ভাব দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিল। সেইরূপ ভোলানাথও কখনও কখনও আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ঘাবড়াইয়া যাইত। ওই দিন 'তবে আমি যাই' বলিয়া যেই আসন করিয়া বসিলাম ভোলানাথ ওই কথা শুনিয়া এবং আমার চেহারায় অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করিয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠাইয়া আনিল। অনেক সময় আমি হাসিলে ইহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইত। অখণ্ডানন্দ এই শরীরকে হাসিতে দেখিলেই অস্থির হইয়া যাইত। তাহার ভয় হইত যে এই শরীর বুঝি হাসিতে হাসিতেই শেষ হইয়া যাইবে।

'মহাযোগী কীভাবে দেহত্যাগ করে তাহাও এই শরীরে প্রকাশ হইয়াছে। দেহত্যাগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া আবার খেয়ালবশে কীভাবে ক্রিয়াদি হইয়া শরীর প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। ওই সময় কিন্তু এ শরীরের নিজে আসনাদি করিবার সামর্থ ছিল না। এ শরীর শুধু বলিয়া দিতেছিল যে শরীরটাকে এমন এমন কর। এই শরীরে তখন লজ্জা সরমের কোনও ভাব নাই। আর যাহারা এ শরীরের কথামতো এ শরীরের হাত পাগুলি আসনের মতো করিয়া দিতেছিল তাহাদের কোনও সঙ্কোচ ছিল না। তাহারা মনে করিতেছিল যেন কোনও শিশুর হাত পাগুলি ওইরূপ করা হইতেছে।

'আরও একটি কথা—এ শরীর যোগাগ্নিতে দেহ ভস্ম করিতে গিয়াছিল শুনিয়া তোমরা মনে করিও না পার্বতীই এ শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছে এবং পার্বতীর মতোই এ শরীর যোগাগ্নিতে নিজকে আহুতি দিতে গিয়াছিল। সেইরূপ কালী, দুর্গার কোনও কোনও লক্ষণ এ শরীরের মধ্যে প্রকাশ হইতে দেখিয়া এ শরীরকে কালী, দুর্গা মনে করিলেও ভুল করা হইবে।

শোভাদিদি। হিরণদির নিকট শুনিয়াছি যে একবার মা নিজেকে জলের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন।

মা। (হাসিয়া) সে কী হইয়াছিল জান? একবার হরিদ্বারের কুম্ভের সময়

আমরা ওইখানে ছিলাম। যোগীভাই পাঁচ শত টাকা দিয়া একদিনের জন্য একখানা ঘর ব্রহ্মকুণ্ডের উপর ভাড়া করিয়াছিল, যাহাতে ওইখানে থাকিয়া আমি স্নান দেখিতে পারি। আমরা ওইখানে দাঁড়াইয়া কত লোকের স্নান দেখিলাম, কিন্তু সেই সময় একবারও খেয়াল হইল না যে আমিও উহাদের সহিত স্নান করিয়া আসি। স্নানের পরদিন আমরা খড়খড়িতে যোগীভাই-এর ধর্মশালায় চলিয়া গেলাম। ওইখানে গিয়া এ শরীরের স্নানের খেয়াল আসিল। বাঘাট হাউসের নিকটেই গঙ্গা এবং সেখানে বাঁধানো ঘাট আছে। এই শরীর ওই ঘাটে গিয়া গঙ্গায় নামিল। ওইখানে গঙ্গার জল তো বেশি নয়, কোমর পর্যন্ত হইবে কিনা সন্দেহ। কাজেই দাঁড়াইয়া ডুব দিবার উপায় নাই। এই শরীর সাঁতার কাটার মতো লম্বা হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যাহারা এই শরীরের সঙ্গে ছিল তাহারা এ শরীরকে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিল কিন্তু জলের মধ্যে ইহাকে দেখিতে পাইল না। অথচ ওইখানে জল এত পরিষ্কার যে জলের নীচের পাথরগুলিও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এ শরীরকে জলে না দেখিতে পাইয়া উহারা অস্থির হইয়া এদিকে সেদিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। প্রায় ১০।১৫ মিনিট পরে এ শরীর যেখানে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল আবার সেইখান হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে তো দেখিয়া অবাক! এ শরীর যেন জলের সঙ্গে মিশিয়া জল হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য উহারা এত কাছে দাঁড়াইয়া এ শরীরকে দেখিতে পাইতেছিল না।'

রাত্রি প্রায় ১০।। টা পর্যন্ত মা এই সকল কথা বলিলেন। মা আজ যে দুইটি ঘটনার কথা বলিলেন তাহা আমি পূর্বে শুনি নাই। এইরূপ আরও কত ঘটনা আছে তাহা কে জানে? মা নিজেও বলিলেন, 'সাধনার খেলার সময় এ শরীরে যাহা যাহা প্রকাশ হইয়াছে—তাহার কতটুকুই বা বলা হইয়াছে? বলিতে গেলে কিছুই বলা হয় নাই।'

১৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার (ইং ৪।৯।৫৬)

আজ মা তিনদিনের জন্য এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎই মাকে এই সময় এলাহাবাদে যাইতে হইতেছে, কারণ এই সময় স্বর্গীয় গোপাল ঠাকুর মহাশয় শ্রীদুর্গার কাঠামো পূজা করিতেন। গোপালদাদা স্বর্গগত

হইলেও মা ওইখানকার ভক্তদের আহ্বানে এই সময় দেবীর কাঠামো পূজায় উপস্থিত থাকেন। মা তিন রাত্রি গোপাল দাদার আশ্রমে থাকিয়া ২২শে শুক্রবার সকালে বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যান। আবার ওই দিনই বিকালে কাশী আসিয়া পরদিন শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহ্ মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যান। আবার ২৫শে ভাদ্র, সোমবার কাশী চলিয়া আসেন।

কাশীতে ভাগবত জয়ন্তী

২৭শে ভাদ্র, বুধবার হইতে ভাগবত জয়ন্তী আরম্ভ হইয়াছে। এবার পাঠ করিতেছেন বৃন্দাবনের শ্রীনিত্যানন্দজী। ইনি নাকি প্রভু দত্ত ব্রহ্মচারীজীর ওখানে মাঝে মাঝে ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। মা বলিলেন, 'ইহাকে প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্বে একবার বলা হইয়াছিল যে কাশীতে গিয়া ভাগবত পাঠ করিতে পারেন কিনা। ইনি তখনই পাঠ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। মাঝে ইহাকে দিয়া একবার ভাগবত পাঠের কথা উঠিয়াছিল। ইনি কীরূপ পাঠ করেন তাহা সেই সময় পান্নালাল বাবা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেনও। কিন্তু সেইবার অবধূতজী বৃন্দাবন হইতে শ্রীনাথকে পাঠাইয়া দিলেন। এবারও শ্রীনাথের আসার কথা ছিল। সে নিজেই বলিয়াছিল যে এবার সে এখানে ভাগবত পাঠ করিবে। কিন্তু এখান হইতে চিঠি না পাইয়া সে যেদিন অন্যত্র চলিয়া গেল, সেইদিনই এখানকার নিমন্ত্রণপত্র বৃন্দাবন পৌঁছিল। কাজেই তাহার পরিবর্তে ইনি আসিলেন। (হাসিয়া) দেখিতেছি এ পর্যন্ত যাহাকে যে কথা দেওয়া হইয়াছে তাহা ধীরে ধীরে সবই পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বহুদিন পূর্বে কয়েকজনকে বলা হইয়াছিল যে যদি যোগাযোগ হয় তবে তাহাদের বাড়ি যাওয়া হইবে। গত পূজার সময় কলিকাতায় তাহাদের বাড়ি যাওয়া হইয়াছিল। আর বোধহয় কাহাকেও কোনও কথা দেওয়া নাই। আরও দেখিতেছি যে এই শরীরের ঘোরা ফেরার ভাবটা যেন কমিয়া আসিতেছে। সেইজন্য এতদিন কাশীতে থাকা হইল।'

মায়ের এইসব কথা শুনিয়া আমাদের আতঙ্কই হইতেছে। মা কি তবে এখানকার লীলা সম্বরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন?

মায়ের অসুস্থতার কথা

৩০শে ভাদ্র, শনিবার (ইং ১৫।৯।৫৬)

আজ রাত্রিতে কথায় কথায় মায়ের শারীরিক অসুস্থতার কথা উঠিল। কিছুদিন যাবৎ মায়ের সর্দির ভাব খুব দেখা যাইতেছিল। ওই কথা মাকে বলা হইলে মা বলিলেন, 'সর্দির জন্য এ শরীরের কিছু হয় নাই। গোপালবাবা (ডা. দাশগুপ্ত) এই শরীরের হাত পায়ের ব্যথা বেদনা দেখিয়া এ শরীরকে রোজ একটি করিয়া এরণ্ড বীজ খাইতে বলিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে ওই বীজের সংখ্যা বাড়াইতে বলিয়াছিল। কিন্তু উদাস ভুলক্রমে একদিন অনেকগুলি বীজ খাওয়াইয়া দেয়। উহাতেই শরীরের একটা অস্বাভাবিক ভাব হয়। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত যেন শুকাইয়া যাইতেছিল। উহা ভিন্ন শরীরের আর কোনও উদ্বেগ ছিল না। তবে ওই বীজ খাইয়া যে কোনও উপকার হয় নাই তাহা বলা যায় না। কারণ শরীরের ব্যথা বেদনা কমিয়া শরীরটা এখন ঝরঝরে লাগিতেছে।

'আবার দেখ—শরীরের নিজের একটা তেজ আছে। যখন রোগ হয় তখন উহাতে অন্যরূপ তেজ আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ রোগগুলিও শক্তির রূপ কিনা। তাই ওই তেজের জন্য হাতের এবং শরীরের নাড়িগুলির মধ্যে বেদনা হইত। কিন্তু যখন রোগ চলিয়া গেল তখন শরীরের যেন কোনও কোনও অংশ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। এ শরীরটা আবার এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া ওই শূন্য অংশটা পূর্ণ করিয়া নিল। ওই রোগটাই বা কে? উহাও তো আমিই। কাজেই শরীরকে শূন্য আমিই করিতেছি আবার পূর্ণও আমিই করিতেছি। এতদিন যে বেশি কথাবার্তা বলা হয় নাই, ঘরে এলাইয়া পড়িয়া থাকা হইয়াছে তাহা ওই শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্যই। সকালবেলা ভাগবত পাঠের ওখানে যাওয়া হয় নাই। ইচ্ছা করিয়া যে যাওয়া হয় নাই তাহা নহে। যাওয়ার খেয়ালই হয় নাই। এ শরীরটা নানাভাবে কাজ করে। অনেক সময় ইহা কর্মের অধীন হইয়া কাজ করে অর্থাৎ পাঠে উপস্থিত থাকা দরকার—এই ভাব হইতেও এ শরীর পাঠে উপস্থিত হয়। আবার কর্মের অধীন হওয়ার কোনও প্রশ্ন নাই। খেয়াল অনুসারে কাজ হইয়া যায়। খেয়াল হইল তাই পাঠে যাওয়া হইল, খেয়াল হইল না কোথাও যাওয়া হইল না।

'আর এক ভাবে এ শরীর কাজ করে—যেমন এ শরীর নিজে কিছুই করিতেছে না অথচ যাহা যাহা হইবার বা যাহা যাহা হওয়া দরকার তাহা অন্য লোকের দ্বারা হইয়া যাইতেছে। এই অন্য লোকই বা কে? উহারাও তো এ শরীরেই। এই কথাগুলি বুঝা বড় শক্ত। এগুলি গুহ্যতত্ত্ব কিনা। মনে কর রোগযন্ত্রণায় আঃ উঃ করিতেছি। রোগের যাহা প্রকাশ হওয়ার তাহা পূর্ণভাবে এ শরীরে প্রকাশ হইতেছে। কেহ যদি এই শরীরকে ওইরূপ আঃ উঃ করিতে দেখে সে নিশ্চয়ই মনে করিবে যে এ শরীর রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে। কিন্তু এই আঃ উঃর মধ্যে যন্ত্রণা বোধের কোনও প্রশ্ন নাই। আবার রোগ যন্ত্রণার যাহা প্রকাশ হওয়ার তাহা এ শরীরে হইয়া যাইতেছে অথচ এ শরীরটা নির্বিকার। কিছুই যেন এ শরীরের শান্ত ভাবকে টলাইতে পারিতেছে না। আবার অনেক সময় এ শরীর রোগের সঙ্গে যোগ দিয়া আনন্দ করে। এ যেন রোগকে নিয়া কীর্তন করা অর্থাৎ রোগের যন্ত্রণাদির প্রকাশও যেন একটা আনন্দের রূপ। নির্বিকার থাকিয়াও যে আঃ উঃ করা যায় বা আনন্দ করা যায় ইহা সকলে ধরিতে পারে না এবং ইহা ধরাও খুব শক্ত।'

আমি। মা, আমরা যে কর্মের অধীন হইয়া কর্ম করি তাহা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু তুমি কীভাবে কর্মের অধীন হইয়া কর্ম কর তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না।

মা। তোমরা যে ভাবে কর্মের অধীন হইয়া কর্ম কর উহা সেরূপ নয়। কারণ যে কর্ম করে, যাহা করে এবং যাহার জন্য করে—সকলই যে এক।

১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭।৯।৫৬)

মা আজ বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। ওইখানে গিয়াই খবর পাঠাইলেন যে আমি যেন গোপীবাবুকে লইয়া শনিবার দিন বিন্ধ্যাচলে যাই। আমরা আবার রবিবার দিনই কাশী ফিরিতে পারিব তাহাও জানাইলেন। সর্দার বলদেব সিংকে বলিয়া দিলেন সে যেন তাহার জিপ গাড়িতে আমাদিগকে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাইয়া দেয়।

১৩ই শনিবার আমরা বেলা ২।। টার সময় বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। গোপীবাবু এবং আমি ব্যতীত পটলদাদা ও বিনু (নিয়োগী) দাদা আমাদের সহিত গেলেন। বিকাল ৪।। টার সময় আমরা বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাইলাম।

বিন্ধ্যাচলে প্রাচীন মন্দিরাদির অলৌকিক দর্শন

মাকে প্রণাম করিয়া যখন আমরা মায়ের কাছে বসিলাম, তখন মা তাঁহারএকটি দর্শনের বিষয় আমাদিগকে বলিলেন। মা বলিলেন, 'তোমাদের আশ্রমের সম্মুখে যে জায়গাটি খুঁড়িয়া কতকগুলি মূর্তি বাহির হইয়াছিল সেইখানে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। ওই মন্দিরও খুব পুরাতন। উহার পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে বারান্দা। পূর্বদিকের বারান্দা পশ্চিমদিকের বারান্দা হইতে প্রশস্ত। ওইদিকে আবার ভোগ রান্নার ঘরও আছে। মনে হয়, পূর্বদিকের অংশটি ভাণ্ডার হিসাবেই ব্যবহৃত হইত। ওইখান হইতে পাহাড়ের নীচে নামিয়া যাইবার একটি রাস্তা ছিল। পশ্চিমদিকেও ওইরূপ ছিল। আমি বারান্দার দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়াছিলাম। মন্দিরের পশ্চিম এবং উত্তর দিকের বারান্দায় শিব, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও ছিল। ওইগুলি পাথর দিয়াই তৈয়ারী। মূর্তিগুলিও দেখিতে বেশ পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের মূর্তির সহিত এই সকল মূর্তির পূজাও হইত। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম ওই দিককার কোণে এক দেবীর মূর্তিও ছিল। দেবীর হাতে একটি মালা ছিল, উহাও পাথরে খোদাই করা। কিন্তু উহা ভাঙিয়া যাওয়াতে দেবীর হাতে আলগা একটি মালা দিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু উহাও খণ্ডিত। দেবী আমার কাছে আসিয়া আমাকে ওই খণ্ডিত মালাটি দেখাইয়া কিছু বলিল। আমিও বলিয়া উঠিলাম, 'এইরূপ খণ্ডিত মালা হাতে দিয়া পূজা করা হয়। পূজারীও ওইখানে ছিল। আমার ওই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেবী আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া আবার যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিল। পূজারীর মধ্যেও একটি চঞ্চল ভাব দেখা গেল।

'মন্দিরের পূর্বদিকের যে বারান্দার কথা বলিয়াছি ওইখানে একটি স্ত্রীলোক শুইয়াছিল। সে ওই পূজারীর সেবাদাসী ছিল। আজকাল মন্দিরে যাহা হয় ওই সময়ও তাহাই হইত। মন্দির এবং বিগ্রহ যে ধ্বংস হইয়া যায় তাহারও কারণ থাকে। ভগবান নিজে নিজেকে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন আবার নিজেই উহা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করেন।

'আমি যে মন্দিরের কথা বলিলাম উহা ছাড়াও ওইখানে আর একটি খুব বড় মন্দির ছিল। ওই মন্দিরে যাইবার সিঁড়ি আলাদা। এই শরীর যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেখান হইতে ওই বড় মন্দিরের বিগ্রহ দেখা যাইতেছিল না কারণ মাঝখানে একটা পরদা ছিল। তবুও ওই পরদার ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতে মনে হইয়াছিল যে ওই বিগ্রহ বিন্ধ্যবাসিনীর মূর্তি হইতে আলাদা। ওই মূর্তি বর্তমান মূর্তি হইতে বড়ও ছিল এবং চেহারাও আলাদা। এরূপও হইতে পারে যে কালক্রমে ওই মূর্তিই বর্তমান বিন্ধ্যবাসিনীর মূর্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে অথবা এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে। প্রাচীন কালে এই পাহাড়ের উপর যে সকল মন্দির এবং বিগ্রহ ছিল তাহা এক মুহূর্তের জন্য দেখা হইয়া গেল। অবশ্য দর্শনের সময় তোমাদের আশ্রম ইত্যাদি যা' কিছু আছে উহার কিছুই তখন ছিল না।'

গোপীবাবু। যেই সময়ের কথা বলা হইতেছে উহা বোধহয় বহুদিন পূর্বের কথা, মনে হয় উহা মুসলমান রাজত্বের পূর্বের কথা।

মা। হাঁ, উহা অনেক দিনের কথা।

গোপীবাবু। তাহা হইলে কথা হইতেছে এই যে দেবী যে প্রতিকারের আশায় তোমার নিকট অভিযোগ করিতে গিয়াছিলেন তাহা বোধহয় তোমার নিত্যমূর্তির নিকট। কারণ তোমার বর্তমান মূর্তি তখন তো ছিল না।

গোপীবাবুর কথা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। মায়ের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে তিনি যেন গোপীবাবুর কথাই মানিয়া লইতেছেন। গোপীবাবু আবার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবীর পক্ষে তোমার নিত্য মূর্তির দর্শন পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু পূজারী ওই মূর্তি দেখিল কী করিয়া? আর তুমিই বা খণ্ডিত মালা হাতে দিয়া কোনও দেবদেবীর পূজা করা ঠিক নয় তাহা ওই পূজারীকে জানাইলে কী করিয়া?

মা। পূজারী তো আমাকে দেখিতে পায় নাই। সে যে অন্যায় করিতেছে তাহা তাহাকে ভিতর হইতেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনেক সময় তোমরা দেখ না যে লোকে একটা কাজ করিয়া কাজটা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া অনুশোচনা করে। তাহার বিবেকই বলিয়া দেয় যে কাজটা ঠিক হয়

নাই। পূজারীর বেলায় তাহাই হইয়াছিল। সেইজন্যই তো বলিয়াছিলাম যে তাহার ভাবটা চঞ্চল ছিল।

মা যে চিরন্তনী তাহা গোপীবাবু প্রশ্ন করিয়া মা হইতে বাহির করিয়া নিলেন। তাহা না হইলে মা যেইভাবে দর্শনের কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা হইতে স্পষ্ট কিছুই বোঝা যাইতেছিল না।

আমরা বিন্ধ্যাচলে ২৪ ঘন্টারও কম সময় ছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে মায়ের সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ এইখানে উল্লেখ করিতেছি—

বিন্ধ্যাচলে সূক্ষ্মদেহধারী সাধকদের সূক্ষ্মে দর্শন

একবার বিন্ধ্যাচলে অভয় এবং রঞ্জনবাবু* প্রভৃতি মাকে সঙ্গে করিয়া ষষ্ঠীতলায় মহানিশা ধ্যানে বসেন। ওই সময় তাহাদের কিছু কিছু দর্শন হয়। ওই কথা উঠিলে মা বলিলেন, 'ওই মহানিশার ধ্যানের প্রস্তাব উহারাই করিয়াছিল এবং ধ্যানের সময় উহাদের কিছু দর্শন করিবার খুব একটা আগ্রহ ছিল। প্রথম দিন যখন উহারা ধ্যানে বসিল সেদিন সকলেই খুব উজ্জ্বল একটা আলো দেখিয়াছিল। উহা এত উজ্জ্বল ছিল যে উহাতে সকলের মুখই দেখা যাইতেছিল।

'ইহার পর দুই দিন দেখিতে পাইয়াছিলাম যে সূক্ষ্ম দেহধারী সাধুরা যাঁহারা বিন্ধ্যাচলে সাধনা করিতেছেন তাঁহারা আসিয়া ইহাদের সঙ্গে বসিয়া গিয়াছেন। ইহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও কেহ কেহ তাঁহাদের উপস্থিতি অনুভব করিয়াছিল।

'আর একবার এক সাধুকে দেখিয়াছিলাম যিনি এখানে হাজার বৎসর যাবৎ তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার চোখের উপর চামরাগুলি ঝুলিয়া পড়িয়া তাঁহার চোখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। অবশ্য তাঁহাকে উর্ধ্বলোকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি।'

গোপীবাবু। তখন তো তাঁহার বার্দ্ধক্যের কোনও চিহ্ন ছিল না।

মা। না, তখন তাঁহার জ্যোতির্ময় রূপ ছিল।

---

* বিচারপতি নীরদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

বিন্ধ্যাচলে কাপালিকদের আস্তানা

এককালে বিন্ধ্যাচলে যে কাপালিকরা থাকিত সেই কথা উঠিলে মা বলিলেন, 'এই যে অষ্টভুজার মন্দির আছে, ওই মন্দিরে যাইবার পথে দেখা যায় যে ওই পথ হইতে আর একটা সরু পথ অন্য দিকে গিয়াছে। আমি একবার খেয়াল বশে ওই পথ দিয়া কিছুদূর গিয়া এমন একটি জায়গা দেখিতে পাইলাম যাহার চারিদিকই গাছ দিয়া ঘেরা। ইহার ভিতর কেহ কিছু করিলে তাহা বাহির হইতে দেখিবার উপায় নাই। এই সকল স্থানে কাপালিকদের থাকা অসম্ভব নয়।

'একবার ভোলানাথের এক শিষ্যের ছেলেকে কাহারা যেন লইয়া যায়। ওই ছেলে তাহার বাপ মা-র সহিত কাশীতে থাকিত। ছোট বেলায় তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় যাহার জন্য তাহার ওই চোখ ফেলিয়া দিয়া ওইখানে একটি পাথরের চোখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

'একদিন ছেলেটি একা গঙ্গাস্নান করিতে যায়। স্নান করিয়া সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে না। তাহার বাপ মা তো অস্থির হইয়া কত খোঁজ করিল কিন্তু ছেলের সন্ধান পাইল না। চারি পাঁচ দিন পর একদিন সে হঠাৎ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে এতদিন সে কোথায় ছিল, সে বলিল, 'আমি গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া একটি লোককে দেখিতে পাই। তাহার সহিতই আমি চলিয়া যাই। সে যে আমাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহা নয়, আমি যেন কতকটা অবশভাবেই তাহার সহিত চলিয়া যাই। এ ক'দিন আমি কোথায় ছিলাম তাহা আমার স্মরণে নাই। তবে আমাকে যে একটি ঘরের মধ্যে রাখা হইয়াছিল তাহা আমার মনে পড়ে। একদিন রাত্রিতে আমাকে স্নান করাইতে লইয়া গেল। স্নান করিয়া উঠিয়া আমি যখন আমার পাথরের চোখটি মুছিতেছিলাম তখন উহারা উহা লক্ষ্য করিয়া কী যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল। শেষে আমাকে এক জায়গায় আনিয়া ছাড়িয়া দিল। রাত্রি ভোর হইলে ওই জায়গাটি দেখিয়া মনে হইল যে ইহা যেন আমার পরিচিত স্থান। কিছু দূর চলিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে আমি বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছি। পরে রেলগাড়িতে করিয়া কাশীতে চলিয়া আসিলাম।'

জগন্নাথ মন্দিরে ত্রিমূর্তির স্থলে শ্রীশ্রীমায়ের এক মূর্তি দর্শন

সাধনার খেলার সময় কীর্তনে এবং দেবস্থানে গেলে মায়ের দৈহিক অবস্থা যেইরূপ হইত মা তাহা আমাদিগকে বলিলেন। মা বলিলেন, 'ওই সময় কীর্তন শুনিলেই যে শরীরটা এলাইয়া পড়িত তাহা নয়। এমনকী লোকের একটু তালি দেওয়ার শব্দ কানে আসিলেই শরীরটার ওই ভাব হইত। ঢাকাতেই ইহার একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

'কোনও দেবালয়ে লইয়া গেলেও এই দশা হইত। একবার এক রাম মন্দিরে এই শরীরকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ওই মন্দিরে সকলেরই প্রবেশ নিষেধ ছিল, এমনকী ব্রাহ্মণেরও। কিন্তু এই শরীর কেমন করিয়া সকলের চোখ এড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া পূজার আসনে গিয়া বসিল এবং অনেকক্ষণ ওইখানেই এলাইয়া পড়িয়া রহিল। পরে যখন মন্দির হইতে বাহিরে আসা হইল তখন উহারা জানিতে পারিল যে এ শরীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল।

'দেবালয়ে বিগ্রহের সম্মুখে গেলেই যে শরীরের ওই অবস্থা হইত তাহা নহে। কোনও দেবালয়ের পাশ দিয়া গেলেও শরীরে এলানো ভাবটা আসিয়া পড়িত। প্রত্যেক বিগ্রহেরই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। বিগ্রহ অনুসারে ওই আকর্ষণের পরিধি বড় ছোট হইয়া থাকে। সেইজন্য বিগ্রহের কাছে না গেলেও কতক জায়গার মধ্যে তাঁহাদের আকর্ষণ অনুভব করা যায়।

'ইহারা যখন এ শরীরকে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া যাইত তখন আর বিগ্রহের কাছে এ শরীরের যাওয়া হইয়া উঠিত না। মন্দিরের কাছে গেলেই শরীরটা এলাইয়া পড়িয়া যাইত। উহারা এই শরীরকে ওইভাবে রাখিয়াই জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিত। একবার মাখন (ঘোষ) বাবু এই শরীরের ওই অবস্থা সত্ত্বেও জোর করিয়া এই শরীরকে মন্দিরের ভিতর বিগ্রহের কাছে লইয়া গেল। বিগ্রহের কাছে গিয়া আমি কিন্তু তিন মূর্তি দেখিতে পাইলাম না। তিন মূর্তি মিলিয়া এক মূর্তি হইয়া গিয়াছেন এবং তাহা দেখিতেও দ্বারকানাথের মতো। গলায় অনেকগুলি মালা। ওইগুলি গলা হইতে লহরে লহরে পা পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। আর যে ফুল দিয়া মালা গাঁথা হইয়াছে তাহাও খুব সুন্দর।'

গোপীবাবু। মাখনবাবুও কি তিনটি বিগ্রহের পরিবর্তে মাত্র একটি বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন।

মা। না। উহা কেবল আমিই দেখিয়াছিলাম।

আমি। তবে মাখনবাবুর কী লাভ হইল? (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) তাহারও কিছু লাভ হইয়াছিল। এই যে শরীর এলাইয়া পড়িয়া থাকার কথা বলিলাম, শরীর ওইভাবে পড়িয়া থাকিলেও উহার রক্ষণাবেক্ষণ কিন্তু আপনা হইতেই হইয়া যাইত। (গোপীবাবুকে) মনে কর তুমি যদি দেহরক্ষী লইয়া কোথাও যাইতে থাক, তবে তুমি আপন ভাবে মত্ত থাকিলেও তোমার রক্ষার জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা তোমার রক্ষীগণই করিবে। ওইদিকে তোমার দৃষ্টি দেওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না।

গোপীবাবু। সে তো সত্য কথা। জগতের বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিভিন্ন শক্তি তো আছেই। অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া তাহাদেরই কর্তব্য এবং তাহারা স্বভাবত তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়া যায়।

মা। হাঁ, তাহাই। এই শরীরের বেলায়ও ওইরূপ হইয়াছে। এই শরীর যখন ছোট বৌ ছিল তখন এই শরীরকে এক বিবাহ বাড়িতে লইয়া যাওয়া হয়। তখন কিন্তু এই শরীরের কোনও ভাবই বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। ওই বিবাহ বাড়িতে দুইটি ছেলে এ শরীরকে অন্যায় ভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে একজন বাড়ি গিয়াই কলেরা হইয়া মারা যায়। আর দ্বিতীয়টি অন্যের হাতে খুব মার খায়। উহাদের আচরণের জন্য এই শরীর কিন্তু উহাদিগকে কোনও অভিশাপ দেয় নাই বা উহাদের অমঙ্গল চিন্তা করে নাই।

১৪ই আশ্বিন, বুধবার (ইং ৩০।৯।৫৬)

বিকাল ৩টার সময় গোপীবাবু এবং আমি মায়ের মোটরে কাশী ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন ভোর ৪।। টার সময় মা কাশী রওনা হইবেন তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দিলেন।

১৫ই আশ্বিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় মাকে আশ্রমে দেখিয়া প্রণাম করিয়া আসিলাম। তখনও জানিতে পারি নাই যে ওই দিনই মা দুন এক্সপ্রেসে

কলিকাতা রওনা হইবেন। বেলা ১০।। টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন ওই কথা জানিতে পারিলাম। আজ দিদিমা প্রভৃতি দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলিকাতা যাইতেছেন। মা বলিলেন, 'আমিও ওই সঙ্গে রওনা হইব। পরে রাস্তায় কোথাও নামিয়া পড়িব।'

কাশীর আশ্রমে কালী পূজা

১৫ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার (ইং ৩১।১০।৫৬)

গতকল্য বিকালে মা কাশী আসিয়াছেন। আজ কালী পূজা। মাতৃমণ্ডপেই এই পূজা হইল। পূজা শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ৪টা বাজিয়া গেল। গোপীবাবু এই পূজাতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে রাত্রি ৪টার সময় মায়ের মোটরে বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শুনিতে পাইলাম যে ভাদ্র মাসে যখন মাতৃমণ্ডপে ভাগবত জয়ন্তী হইতেছিল তখন মা একদিন সূক্ষ্মে দেখিতে পাইলেন যে ব্যাসাসনের দিকে মুখ করিয়া এক কালী মূর্তি দাঁড়াইয়া আছেন। ওই কথা মা বুনিকে বলিলে বুনি মাকে জানাইয়াছিল যে কন্যাপীঠের মেয়েদের ইচ্ছা যে এই বৎসর কালী পূজা যেন আশ্রমে হয়। শ্রীযুক্ত নিতাই পাল মহাশয় যখন এই কালীপূজার কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ওই মূর্তি তৈয়ার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মা যখন তাঁহাকে বলিলেন যে কলিকাতায় মূর্তি তৈয়ার করিলে উহা কাশী লইয়া যাওয়া অসুবিধা হইবে তখন তিনি বলিলেন—যেইভাবে তৈয়ার করিলে উহা লইতে অসুবিধা না হয় তিনি তাহাই করিবেন। মা বলিলেন, 'বাস্তবিকই সে এমন সুন্দর ভাবে প্রতিমাকে প্যাক করিয়া দিয়াছিল যাহার জন্য প্রতিমার কোনও ক্ষতি হয় নাই। প্রতিমার গায়ে একটু আঁচড়ও লাগে নাই। এই শরীরের সঙ্গে ওই প্রতিমা air conditioned গাড়িতে এখানে আসিয়াছেন। আবার মজা দেখ, আজ যখন প্রতিমাকে পূজার ঘরে আনিতে বলা হইল তখন ইহারা ইঁহাকে আনিয়া আসনে না বসাইয়া এমন স্থানে এমনভাবে বসাইল যেখানে আমি ওই প্রতিমাকে ওইভাবে দেখিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া ইনি নাকি আবার মহালয়ার দিন ননীকে* স্বপ্নে নিজের

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

হাত বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এই হাতের মাপ রাখ, একটা লোহা সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিও।' ননী তাহা করিলে দিদিও ইঁহাকে কয়েকপদ গহনা তৈয়ার করিয়া দিল।

এই প্রতিমা পূজা শেষ হইলে বিশুদাদা যিনি এই পূজা করিলেন, প্রতিমাকে বিসর্জন না দিয়া নিজ বাড়িতে স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইলে মা তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

২২শে কার্তিক, বৃহস্পতিবার, (ইং ৮।১১।৫৬)

সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে মা হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলেন। ২৬শে কার্তিক হইতে ২রা অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সংযম সপ্তাহ। ইহা হরিদ্বারে সপ্তধারার নিকট সপ্তর্ষি আশ্রমে হইয়াছিল। সংযম সপ্তাহ শেষ হইলে মা দিল্লি, বৃন্দাবন ঘুরিয়া ৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার বেলা ১ টার সময় কাশী আসিয়া পৌঁছাইলেন।

সংযমব্রতের সময় সূক্ষ্মদেহীদের আগমন

সন্ধ্যা কীর্তনে মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিলেন না। দিদির ঘরেই বসিয়া রহিলেন। গোপীবাবু মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। নলিনী ব্রহ্ম মহাশয়ও হরিদ্বার হইতে মায়ের সঙ্গে আসিয়াছেন। সকলেই দিদির ঘরে বসিয়াছিলেন। সংযম ব্রত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব দিন রাত্রিতেও মা সূক্ষ্মে যে একজন মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন সেই কথা বলিতেছিলেন। মা বলিলেন, 'সংযম ব্রত আরম্ভ হওয়ার আগের দিন রাত্রিতে শুইয়া আছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে একজন এই শরীরের কাছে আসিল। সে দেখিতে যেমন লম্বা তেমনি তেজস্বী। তাহার পরিধানে সাদা কাপড়। তাহার সঙ্গে আরও দুইজন ছিল। তাহারা লম্বা নয়। তাহাদের শরীর ও মাথা কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল। চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাহারা পুরুষ কী স্ত্রীলোক। তবে এ শরীরের খেয়াল হইল যে তাহারা পুরুষ। যাহার কথা প্রথমে বলা হইল সে হাঁটু মুড়িয়া এই শরীরকে প্রণাম করিল। এ প্রণাম যেন নিজেকে ঢালিয়া দিয়া প্রণাম করা। তাহাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গী দুইজনও প্রণাম করিল। এই শরীর ওই লম্বা লোকটিকে বলিল, 'কেমন আছ?' এই বলিয়া এই শরীর আবার বলিল, 'ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, গোবিন্দ ভজ মূঢ় মতে।' ওই কথাগুলি

কিন্তু বেশ জোরেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। উদাস এবং বুনি ঘরের মধ্যেই ঘুমাইতেছিল। তাহারা উহা শুনিতে পাইল না। বারান্দায় পরমানন্দ শুইয়াছিল, সে ওই কথা শুনিয়া বলিল, 'মা, তুমি কী বলিতেছ?' এই শরীরের ওই কথা শুনিয়া ওই তিনজন মাটি হইতে একটু উর্ধ্বে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তোমরা বল না যে, গুরু যে স্থিতি লাভ করে শিষ্যেরও সেই স্থিতি হয়? এ বেলায়ও দেখা গেল যে তিনজনেই অদৃশ্য হইয়া গেল।'

মা আবার বলিলেন, 'যে হলটিতে সৎসঙ্গ হইত তাহা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। চারিদিকে দেওয়াল ছিল, কিন্তু ছাদ তখনও হয় নাই। উপর দিকে ত্রিপাল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সকালবেলা সকলে যখন ধ্যানে বসিত তখন দেখা যাইত যে তিনটি চড়াই পাখি ওই হলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উহারা উপরে উড়িতে থাকিত। উহাদিগকে ওইরূপ করিতে দেখিয়া এই শরীর যেই বলিত, 'তোমরা বিশেষ হইলে এখানে আসিয়া পড়,' অমনি একটি পাখি এই শরীরের কাছে আসিত এবং তাহার দেখাদেখি অন্য দুইটিও আসিত। সংযম ব্রতের সাতদিন প্রত্যহ সকালবেলা ওই পাখি তিনটি আসিত, একদিন একটি পায়রাও আসিয়াছিল। তোমরা মনে করিও না যে হলঘরে উহাদের বাসা ছিল বলিয়াই উহারা আসিত, কিন্তু তাহা নয়, কারণ হলঘরে বাসা করিবার স্থান ছিল না।'

পাখিগুলি যে কাহারা ছিলেন এবং সূক্ষ্মে যে মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন, তিনিই বা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে কেহই মাকে প্রশ্ন করিল না।

৯ই অগ্রহায়ণ, রবিবার (ইং ২৫। ১১। ৫৬)

অদ্যকার সৎসঙ্গে সান্যাল মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, কোনও গন্তব্য স্থানে যেমন বিভিন্ন উপায়ে যাওয়া যায়—কেহ যেমন পায়ে হাঁটিয়া যাইতে পারে, কেহ গরুর গাড়িতে, কেহ রেল গাড়িতে, কেহ এরোপ্লেনে যাইতে পারে, সেইরূপ ভগবানেরও তো নানা নাম আছে এবং ওই নামগুলিতেও শক্তি আছে, এখন আমার প্রশ্ন হইল যে ভগবানের কোন নাম লইলে এরোপ্লেনে যাওয়ার মতো ভগবানের কাছে শীঘ্র যাওয়া যায়।' (সকলের হাস্য)

মা। বাবা, তুমিই তো ইহার জবাব দিয়াছ। তুমি বলিয়াছ যে ভগবানের সমস্ত নামেই শক্তি আছে। তাই নয় কি?

নলিনী ব্রহ্ম। ইনি জানিতে চান যে কোন নামে বেশি শক্তি, যাহা লইলে এরোপ্লেনে যাওয়ার মতো শীঘ্র ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়।

মা। তাহা যদি বল তবে বলি যে, প্রত্যেক নামেই সকল রকমের শক্তি এবং গতি আছে। গরুর গাড়িতে চলার গতি, এরোপ্লেনে চলার গতি—সমস্ত গতিই ভগবানের প্রতি নামে আছে। কথা হইতেছে কী যে তোমরা সাংসারিক বিষয়ে মজিয়া আছ। মন তোমাদের ওইখানেই বদ্ধ আছে। মাঝে মাঝে আবার ভগবানের দিকে লক্ষ্য পড়িতেছে। এই অবস্থায় ভগবানের প্রতি তোমাদের কী জাতীয় গতি তাহা তোমরাই বুঝিয়া লও।

সান্যাল মহাশয়। ভগবানের দিকে একবার লক্ষ্য পড়িলেও তো কাজ হইয়া যাইতে পারে।

মা। আমি তো বলিলাম যে তোমাদের মন বিষয়েই আবদ্ধ হইয়া আছে এবং ওই অবস্থায়ই দুই একবার ভগবানের দিকে চাহিয়া দেখিতেছ। ওই দেখার মধ্যে কিন্তু মন নাই। তবে, হাঁ, এমন দেখাও হইতে পারে যে একবার দেখা হইলেই সব দেখা হইয়া যায়। ইহা কেমন? না, ইলেকট্রিক শকের মতো। মনে কর কেহ সুখশয্যায় শুইয়া বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু লইয়া মশগুল হইয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ একবার ইলেকট্রিক শক লাগিল। ওই লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় বা গেল তাহার ভোগ বাসনা, কোথায় বা গেল তাহার সুখের স্বপ্ন! ভগবানের ঝাঁকি দর্শনের কথা বলে না? ইহাও সেইরূপ। কাজেই তেমন ভাবে যদি একবার দর্শন হয় তবে তাহাতেই এরোপ্লেনে যাওয়ার কাজ হয়। আগুনের স্পর্শ লাগিবে আর শরীর পুড়িবে না, তাহা কী হয়? যেস্থানে আগুনের স্পর্শ লাগে ওই স্থানই পুড়িয়া অন্যরকম হইয়া যায়। সেইরূপ ভগবানের স্পর্শ লাগিলে বদলানো স্বাভাবিক।

বিভূতি। যদি কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভগবানের নিকট বিনয় করা যায় তাহা কেমন?

মা। স্বভাবের গুণেই বিনয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিনয় সদগুণ। যাহার

ওই গুণ আছে সে সর্বাবস্থাতেই বিনয়ী। তুমি যে বিনয়ের কথা বলিতেছ উহা খোশামোদি। কিন্তু ভগবানকে তো কেহ খোশামোদ করে না। কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনেকেই ভগবানের স্তব স্তুতি করে। যদি কিছু চাহিতে হয় তবে ভগবানের কাছেই চাওয়া ভাল। আবার এমন এক স্থিতি আছে যখন স্বভাব হইতেই স্তব স্তুতি করিয়া থাকে। উহা না করিয়া সে থাকিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ

রাত্রিবেলা যখন মা-র কাছে গেলাম তখন সেইখানে মাত্র গোপীবাবুকে দেখিতে পাইলাম। গোপীবাবু একখানা খাতা হইতে কিছু পড়িয়া মাকে শুনাইতেছিলেন। পরে জানিতে পারিলাম যে ওই খাতাটিতে সনদ ব্রহ্মচারীর নানারূপ দর্শনের বিবরণ ছিল।

এই সময় ডা. দাশগুপ্ত আসিলেন। তিনি গোপীবাবুকে বলিলেন, 'আমি একটি বাউলকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। শুনিলাম আপনি নাকি তাহাকে একটি টাকা দিয়াছেন। তাহার গান আপনার কেমন লাগিল?

গোপীবাবু। আমার তো ভালই লাগিল। গানগুলি দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে।

মা। গোপালবাবা আমাকে বলিয়াছে যে এসব গান সে কিছুই বোঝে না।

ডা. দাশগুপ্ত। একবার রবি ঠাকুর এখানে আসিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঠুংরি গায়িকা হোসনা বাঈ এখানে ছিল। মদন মোহন মালব্যজী প্রভৃতি অনেকেই রবিবাবুকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন ওই গায়িকার একটা গান শোনেন। মালব্যজী আমাকেই ওই গায়িকাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। আমাকে বলিবার কারণ এই যে আমি তাহার চিকিৎসক ছিলাম। কাজেই আমি ডাকিলে সে উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। আমি গায়িকাকে ডাকিতে চলিয়াছি, এমন সময় রবিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, গায়িকা তো আসিয়া গান আরম্ভ করিবে, কিন্তু সে গান শেষ করিতে জানে কি?' (সকলের হাস্য)

গোপীবাবু। হাঁ, তাঁহার জবাবগুলিও খুব Pointed হইত।

ডা. দাশগুপ্ত। আর একবার রবিবাবু কাশীতে আসিলেন সঙ্গে দিলীপ,

অতুলবাবু প্রভৃতি ছিলেন। একদিন মালব্যজীসহ সকলে বসিয়া আছেন এমন সময় মালব্যজী রবিবাবুকে একটা গান করিতে অনুরোধ করিলেন। রবিবাবু বলিলেন, 'মালব্য, এখানে দিলীপ আছে, অতুল আছে, এরা থাকিতে কি আমার গান করা শোভা পায়? বরং দিলীপই একটা গান করুক।' এই বলিয়া রবিবাবু দিলীপবাবুকে একটা গান করিতে বলিলেন। দিলীপবাবু বলিলেন, 'গুরুদেব, আপনাকে একটা গান করিতেই হইবে।' তখন বাধ্য হইয়া রবিবাবু একটা গান করিলেন। গান শুনিয়া মালব্যজীর তো খুব আনন্দ। তিনি আবার আবদার করিয়া রবিবাবুকে বলিলেন, 'গুরুজী, আপনি হিন্দি শিখুন। ইহা আপনাকে শিখিতেই হইবে।' রবিবাবু তাঁহার অভ্যাস মতো দাড়ির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে মালব্যজীকে বলিলেন, 'হাঁ, হিন্দি জানিলে তুলসীদাসের রামায়ণখানা পড়া যায়। এইজন্য অনেক সময় হিন্দি শিখিতে ইচ্ছা করে।' রবিবাবুর কথা শুনিয়া মালব্যজীর আনন্দের আর সীমা নাই। রবিবাবু পূর্ববৎ শ্মশ্রুতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, 'আচ্ছা, মালব্য, হিন্দি শব্দটি কোন লিঙ্গ?' মালব্যজী বলিলেন, 'স্ত্রীলিঙ্গ।' উহা শুনিয়া রবিবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, 'মালব্য, এই বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীসংসর্গ করা কি ঠিক হইবে?' রবিবাবুর কথা শুনিয়া সকলে তো হাসিয়া অস্থির। মালব্যজীও হাসিতে হাসিতে লুটাপুটি খাইতেছিলেন।

১১ই অগ্রহায়ণ মা খুকুনীদিদিকে লইয়া বিন্ধ্যাচলে গেলেন। সঙ্গে অনেক লোক গেল। কয়েকদিন পর মা আমাকে এবং গোপীবাবুকে ওইখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি বিন্ধ্যাচল পৌঁছাইবা মাত্র মা আমার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন আমি যেন অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাই। আমি তাহাই করিলাম। ২০।২২ দিন কলিকাতা থাকিয়া ২৯শে পৌষ কাশী ফিরিয়া আসিলাম।

আমি কাশী ফিরিয়া আসার পর মা এক ভক্তের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে চারিদিনের জন্য কলিকাতা গেলেন। সেইখান হইতে কাশী আসিয়া শিবরাত্রির পূর্বেই বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবনে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত ছিলেন। তাহার পর জয়পুর, মোদিনগর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া বিন্ধ্যাচলে চলিয়া আসেন। সেইখানে ৭ দিন থাকিয়া ১৮ই চৈত্র, সোমবার (ইং ১।৪।৫৭) তারিখে কাশী আসেন।

২০শে চৈত্র, বুধবার (ইং ৩। ৪। ৫৭)

আজ সকালের দিকে মা বেশ অসুস্থ ছিলেন। শুনিলাম যে মায়ের টনসিল ফুলিয়া গিয়াছে। মা আজ সৎসঙ্গে আসিলেন না। তাঁহার ঘরে গিয়া আমরা প্রণাম করিয়া আসিলাম।

বিকালের দিকে মা আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রায় ২। ২।। ঘন্টা বেড়াইলেন। তখন দেখিয়া মনে হইল না যে এই মাকেই সকালবেলা এত দুর্বল এবং ক্লান্ত দেখিয়াছিলাম।

যজ্ঞ মন্দির এবং বিরজা মন্দির লইয়া আশ্রমের যে প্রশস্ত চত্বর ছিল উহা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উহার নীচের ঘরগুলিও গিয়াছে। আশ্রমের ঘাট মেরামত করিতে গিয়াই এই বিপত্তি দেখা দেয়। ইঞ্জিনিয়ারদের অজ্ঞতা এবং অসাবধানতার জন্য গঙ্গার ধারের ঘরগুলিতে ফাটল ধরিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ওইগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিতে হয়। চত্বরের যেই সামান্য অংশটুকু এখনও আছে সেইখানে মা কিছুক্ষণ বেড়াইলেন এবং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, 'যেখানে এত সৎসঙ্গ, পাঠ, কীর্তন এবং পূজাদি হইয়াছে তাহার ভিত্তি পর্যন্ত তুলিয়া গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। গতকাল যে দুইটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল তাহারা বলিল যে ঘরগুলি ভাঙিয়া যে গঙ্গায় দেওয়া হইয়াছে তাহা ভালই হইয়াছে। কারণ আশ্রম হওয়ার পূর্বে ওই জায়গাগুলিকে 'মুর্দার জায়গা' বলা হইত অর্থাৎ ওই জায়গায় মুমূর্ষুদিগকে আনিয়া রাখা হইত। তাহা ছাড়া ওই জায়গাতেই একটা সুড়ঙ্গ ছিল যাহার যোগ ছিল দূরে একটা পুকুরের সঙ্গে। লোকদিগকে হত্যা করিয়া নাকি ওই সুড়ঙ্গ দিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইত। উহারা বলিল যে জয়ন্তী উৎসবের সময় যেইখানে বেদি করা হইয়াছিল, ওইখানেই নাকি পুকুরটা ছিল। (হাসিয়া) তোমরা পছন্দ করিয়া ভাল জায়গাতেই উৎসবের বেদি করিয়াছিলে।' মা আরও বলিলেন, 'ওই হলঘরের নীচে গঙ্গার দিকে যে একটা সুড়ঙ্গের মতো ছিল তাহা আমিও দেখিয়াছি। কিন্তু ঘাট মেরামত করিতে আসিয়া উহারা আর ওই সুড়ঙ্গ খুঁজিয়া পাইল না।'

এই সকল পূর্ব বৃত্তান্ত বলিয়া মা বলিলেন, 'আমি শোনা কথাই বলিলাম।'

কিন্তু উহা শুনিয়া আমাদের মনে হইল যে আশ্রমের অর্ধাংশ যে এইভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে উহাতে হয়তো অবিমিশ্র ক্ষতি নাও হইতে পারে।

রাত্রিতে যখন মায়ের কাছে গেলাম তখন সেইখানে গোপীবাবু এবং ডা. দাশগুপ্ত ছিলেন। ডাক্তারবাবু প্লেগ এবং বসন্ত রোগের ইতিহাস বলিতেছিলেন। এই সময় কথায় কথায় মা দুইটি রোগের টোটকা ঔষধের কথা বলিলেন। মা বলিলেন, 'একজনের কাছে শুনিয়াছি যে রক্ত আমাশার রোগে এক পোয়া কাঁচা দুধের সহিত একটি লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে নাকি খুব উপকার হয়। যদিও রক্ত আমাশয় সম্বন্ধে ওই ঔষধের কথা বলা হইয়াছিল, আমার খেয়াল হইতেছে যে সকল আমাশয়েই ইহা দেওয়া যাইতে পারে।

'আমি আরও শুনিয়াছি যে একটি বৃদ্ধা নাকি বাতব্যাধিতে শয্যাগত ছিল। তাহাকে যেভাবে আরোগ্য করা হয় তাহা এই —একটি রসুন পরিষ্কার করিয়া উহা ঘিতে ভাজিতে হইবে, পরে ঘি টি ছাঁকিয়া লইয়া ওই ঘি দিয়া তরকারি করিতে হইবে। শুধু এই ঘিয়ের তরকারি খাইয়াই নাকি বৃদ্ধা রোগ মুক্ত হইয়াছিল। (ডাক্তার বাবুকে) বাবা, তুমি এই দুইটি ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।' ডাক্তারবাবু ঔষধ দুইটি পরীক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

বাসন্তী পূজার অষ্টমীর দিনই অর্থাৎ ২৫শে চৈত্র সোমবার (ইং ৮।৪।৫৭) মা দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন। শুনিলাম বরাবাঙ্কিতে এক দিনের জন্য নামিয়া পরের দিনই লক্ষ্ণৌ গিয়া দুন এক্সপ্রেস ধরিবেন।

দেরাদুনে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ অসুস্থতা এবং বিচিত্র ঘটনাবলি

১৩ই ভাদ্র, ১৩৬৪ সন, শুক্রবার (ইং ৩০।৮।৫৭)

মা দেরাদুন হইতে কাশী আসিয়াছেন। প্রায় পাঁচ মাস পর মা কাশীতে আসিলেন। এইবার জন্মোৎসব আমেদাবাদে হইয়াছে এবং গুরুপূর্ণিমা হরিদ্বারে হইয়াছে। গত পৌষমাস হইতেই মায়ের শরীর খারাপ চলিতেছিল—কানে ব্যথা, মাথার ভিতর শব্দ অনুভব করা, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ ছিল ইহা সত্ত্বেও মা আমেদাবাদ, পুণা, বোম্বাই, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়াছেন। শেষে দেরাদুনে আসিলে উপসর্গগুলি আরও বাড়িয়া যায়। শ্বাসের গতি খুবই

অস্বাভাবিক হইয়াছিল। মা বলিয়াছেন যে একবার শ্বাস নিলে খেয়াল না হইলে উহা আর পড়িত না। আবার শ্বাস পড়িলে খেয়াল ভিন্ন উহা আর নেওয়া হইত না। নাড়ীর গতিও খুব খারাপ ছিল। মা এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলেন যেখান হইতে দেহত্যাগ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। ৭, ৮ এবং ৯ই আগস্ট—এই তিন দিন খুবই খারাপ অবস্থা গিয়াছে। এই সময় সূক্ষ্ম দেহধারী দশজন মহাপুরুষ মা-র সহিত কিষণপুর আশ্রমে দেখা করিতে আসেন। ইঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। প্রথমে আসেন সাতজন মহাপুরুষ, তাঁহাদের মধ্যে নাকি পরীক্ষিৎও ছিলেন। ইঁহারা পূর্বদিক হইতে আসিয়া মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইহার পর আসিলেন তৈলঙ্গ স্বামী। ইনি উত্তর দিক হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি আসিয়া মায়ের সম্মুখে আসন গ্রহণ করেন। বিদায় লইবার সময় ইনি যেইখানে বসিয়াছিলেন সেইখানেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আর যে দুইজন মহাপুরুষকে দেখা গিয়াছিল তাঁহারা আসিয়াছিলেন ঊর্ধ্বদিক হইতে। তাঁহাদের মাত্র জ্যোতির্ময় মুখ দুইখানিই দেখা গিয়াছিল। এই সকল মহাপুরুষের সহিত মায়ের কী কথাবার্তা হইয়াছিল, মা তাহা প্রকাশ করেন নাই। মায়ের অসুখের এই সব বৃত্তান্ত আমি গোপীবাবুর নিকট শুনিয়াছি। তিনি মাকে দেখিতে দেরাদুনে গিয়াছিলেন। মাকে একটু দুর্বল দেখাইলেও চেহারার বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখিলাম না। মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য নিয়ম করা হইয়াছে যে সন্ধ্যা ৬।। টা হইতে ৭।। টা পর্যন্ত সকলে মায়ের ঘরে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিতে পারিবে। অন্য সময় কেহ মায়ের কাছে যাইতে পারিবে না। তবে মা যদি ইচ্ছা করিয়া এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন সে আলাদা কথা।

১৫ই ভাদ্র, রবিবার হইতে ভাগবত জয়ন্তী আরম্ভ হইল। বোম্বাইয়ের কানিয়া ভাই এই ভাগবত জয়ন্তী করাইলেন। ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন বৃন্দাবনের শ্রীনাথ শাস্ত্রী। এই সময় দুই বেলাই কিছুক্ষণের জন্য মা মাতৃমণ্ডপে পাঠে আসিয়া বসিতেন। ভাগবত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃদর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিল। দুর্গাপূজার পূর্ব পর্যন্ত মাকে আর সর্বসাধারণের মধ্যে দেখা যায় নাই।

কাশী আশ্রমে ঁদুর্গাপূজা

ঁদুর্গাপূজার সময় অনেক ভক্ত নানা স্থান হইতে আসিলেন। সোলনের রাজাসাহেব, অম্বের রাজারানী, মহিশূরের মহারানী প্রভৃতি পূজায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই, পুণা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। পূজার তিনদিন খুব ধুমধাম হইল। দশমীর পর একদিন মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে পূজার কিছুদিন পূর্বে মা ভগবতীকে খুকুনীদিদির বড় বোনের রূপে কাশীর আশ্রমে আসিতে দেখিয়াছিলেন। বড় দিদির যৌবনকালে যে চেহারা ছিল দেবীর সেই মূর্তি, পরিধানে লাল পাড় শাড়ি, মুখখানা জ্যোতির্ময়। দেবীর সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। এইবারের দুর্গাপূজা খুকুনীদিদির বড় বোনই কাশীর আশ্রমে করিয়াছেন। তাই বোধহয় দেবী যজমানের রূপ ধরিয়া মাকে দেখা দিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, 'তোমরা বল না যে দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিতে হয়, এখানে দেখিতেছি যে দেবী নিজেই যজমানের রূপ ধরিয়াছেন। কাজেই এখানে দেবী পূজা হইল যজমানের নিজেই নিজকে পূজা করা। আর বাস্তবিক পক্ষে তো তাই। একমাত্র তিনি বা তুমিই তো আছ। সকল রূপই যে তোমার রূপ।'

ঁদুর্গাপূজার পর ঁলক্ষ্মীপূজা এবং ঁকালীপূজাও আশ্রমে হইল। ইহার পর অন্নকূট। অন্নকূটের পর ৭ই কার্তিক বৃহস্পতিবার মা বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে অনেক লোক গেলেন। গোপীবাবুকে মা সঙ্গে লইয়া গেলেন। মা আমাকেও যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অগ্রজ এখানে ছিলেন বলিয়া আমার যাওয়া হইল না।

১৪ই কার্তিক মা কয়েক ঘন্টার জন্য কাশী আসিয়া আবার সেইদিনই বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন।

২৪শে কার্তিক, মঙ্গলবার (ইং ১২। ১১। ৫৭)

বিকালবেলা ৩টার সময় খবর পাইলাম যে গোপীবাবু আজ মায়ের আদেশে বিন্ধ্যাচলে যাইতেছেন। আমাকেও সেই সঙ্গে যাইতে বলা হইয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র ঠিক করিয়া লইয়া বড় রাস্তায় গিয়া দেখি যে গোপীবাবু

ও শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় মোটর গাড়িতে বসিয়া আছেন। আমরা প্রায় ৪।। টার সময় রওনা হইয়া ৬ টার সময় বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাইলাম। মা-র কাছে গেলে মা আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার এখানে আসার কথা যে হইয়াছিল তাহা হইয়া গেল।'

এইবার বিন্ধ্যাচলে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা খুব বেশি হয় নাই। গোপীবাবু শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় এবং ইন্দিরার কথা উঠাইয়াছিলেন। ইন্দিরার যে সব দর্শনাদি হয়—উহা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন যে উহা মনোরাজ্যেরই ব্যাপার। শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের কথাও উঠিয়াছিল। ওই সম্বন্ধে মা যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া মনে হইল যে মায়ের শরীরে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং হইতেছে—উহা শারীরিক অসুস্থতা নয়। তবে এইগুলি যে কী এবং কেন হইতেছে—তাহা মাকে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়াও জানিতে পারি নাই।

আমরা তিন রাত্রি বিন্ধ্যাচলে বাস করিয়া ২৯শে কার্তিক মায়ের সঙ্গেই কাশী ফিরিয়া আসিলাম। মা কাশীতে তিন দিন থাকিয়া ৩রা অগ্রহায়ণ দিল্লি চলিয়া গেলেন। এবার দিল্লিতে ৬ই অগ্রহায়ণ (ইং ২২। ১১। ৫৭) হইতে সংযম ব্রত আরম্ভ হইবে। মা গোপীবাবু এবং আমাকে দিল্লি যাইতে বলিয়াছিলেন। গোপীবাবু যাইতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু আমি আমার অসুবিধার কথা মাকে বলিলে মা বলিলেন, 'অসুবিধা হইলে যাইয়া কাজ নাই।' শেষে দিল্লিতে বেশি শীত বলিয়া এবং গোপীবাবুর শরীরটাও ভাল নয় বলিয়া গোপীবাবুকেও যাইতে নিষেধ করিলেন।

দিল্লিতে সংযম ব্রতে সূক্ষ্মদেহে শ্রীরাম এবং মহাবীরজীর আগমন

১লা মাঘ, বুধবার ১৩৬৪ সন (ইং ১৫। ১। ৫৮)

গতকল্য শ্রীশ্রীমা দেরাদুন হইতে কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংযম ব্রতের পর মা হরিদ্বার, এটোয়া হইয়া আনন্দ কাশীতে গমন করেন। সেখান হইতে দেরাদুন হইয়া কাশী আসিলেন।

আজ রাত্রিতে মা-র কাছে আমার ডাক পড়িল। মায়ের ঘরে ডা. গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়, গোপীবাবু এবং নারায়ণ স্বামী ছিলেন। নানা কথার মধ্যে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এবার নাকি সংযম ব্রতের সময় কয়েকজন

সূক্ষ্মদেহী আসিয়াছিলেন?' মা হাসিয়া বলিলেন, 'ও সেই কথা! হাঁ, দুই তিন দিনই কয়েকটিকে দেখিয়াছিলাম, একদিন মহাবীরকে দেখি। হরিবাবা যেদিকে ছিল সেও সেইদিকে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পরিধানে এবং গায়ে সাদা কাপড় ছিল। মুখখানি মহাবীরের, কিন্তু মুখের রং লাল না হইয়া সাদা ছিল। এই দর্শনের কথা আমি কাহাকেও বলি নাই। কিন্তু ওই দিনই কমলা (মোহনলাল) আমাকে বাজার হইতে একটি ছবি কিনিয়া আনিয়া দিল যাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মহাবীরেরও ছবি ছিল এবং ওই ছবিতে দেখিলাম যে মহাবীরের মুখ সাদা।

'হরিবাবা যেদিকে ছিল সেইদিকে যেমন মহাবীরকে দেখিলাম, এ শরীরটা যেখানে ছিল সেইখানে একটি বালকও দেখিয়াছিলাম। আরও একদিন একটি মহাপুরুষকে দেখা গিয়াছিল, তিনি একটি মহিলার মাথার উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।'

মা এইসব দর্শনের কথা এত সংক্ষেপে বলিতেছিলেন যে ওই বিষয়ে আর বিস্তারিত প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। ওই বালকটি যে কে ছিল তাহা জানিতে চাহিলে মা বলিলেন, 'সেবকের প্রকাশের কথা তো বলিয়াছি, যাহার সেবক বালকটি সেই ছিল।'

ইহার পর মা নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন, 'এই যে লোকের নানারূপ দর্শন হয়, বাণী শুনিতে পায় এগুলি কিন্তু নানাভাবে হইতে পারে। লোকে যাহা চিন্তা করে সেই সূত্র ধরিয়া দর্শনাদি হইতে পারে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি আছে না? ওই সকল অবলম্বন করিয়াও দর্শন, শ্রবণ হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যষ্টি দর্শন বা শ্রবণ, এগুলি প্রকৃত পক্ষে যে কী তাহা জানা যায় না অর্থাৎ ওই সকল দর্শন শ্রবণ হইতে কোনও তত্ত্বের প্রকাশ হয় না।

'আর একরূপ দর্শন শ্রবণ আছে যাহা তৎরূপে হইয়া থাকে। অর্থাৎ দর্শন শ্রবণ রূপে যে এক তাহারও প্রকাশ হয়। এগুলিই হইল প্রকৃত দর্শন। এই জাতীয় দর্শন হইলে ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবার তেমন ইচ্ছা হয় না।'

আমি। আমরা কি ইহা ধরিয়া লইতে পারি যে যাহারা নিজ নিজ দর্শনের কথা বলিয়া বেড়ায় তাহাদের দর্শন মনের ব্যাপার। ওইগুলি খাঁটি দর্শন নয়।

মা। প্রকাশ করার ভঙ্গি হইতে উহা কতকটা বুঝা যাইতে পারে। যদি প্রশংসা

এবং প্রতিষ্ঠার জন্য দর্শনাদি প্রকাশ করা হয় তবে বলা যাইতে পারে যে ওইগুলি খাঁটি নয়। আবার এমন স্থিতিও আছে যখন কিছু দর্শন হইলে উহা না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু এখানে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা নয়। যে প্রকাশ করিতেছে সে উহা প্রকাশ হইল বলিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আবার প্রকাশ না করিয়াও থাকিতে পারিতেছে না। অর্থাৎ এ জাতীয় দর্শন প্রকাশ হইবে বলিয়াই গোপন রাখা যাইতেছে না। তবে এগুলি ধরা বড় শক্ত।

নারায়ণ স্বামী। যাহা দর্শন করা হইল বা যাহা শোনা গেল, ওইগুলির প্রকৃত অর্থ কী তাহা জানিবার জন্যও লোকে নিজ নিজ দর্শন. শ্রবণের কথা বলিতে পারে।

মা। হাঁ, তাহাও হইতে পারে।

আমি। মা, তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে যদি আসল জায়গা হইতে কিছু আসে তবে ওই সম্বন্ধে মনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না এবং উহা কেহ কখনও ভুলিয়াও যায় না। কাজেই আমি কী দেখিলাম বা শুনিলাম সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না।

মা। হাঁ, যদি পরমস্থিতি হইতে কিছু আসে তবে ওই সম্বন্ধে কোনও সংশয় হয় না; কিন্তু এমন স্থিতিও আছে যেখান হইতে কিছু আসিলে সকল সময় উহার অর্থ বুঝা যায় না। তখন উহার অর্থ জানিবার জন্য চেষ্টা আসিতে পারে। আবার সৎসঙ্গ করিতে করিতে কোনও শাস্ত্রবাক্য শুনিয়াও ওই সকল দর্শন বা বাণীর অর্থ বুঝা যায়।

আমি। শুনিয়াছি এমন সব ভাব কখনও কখনও মনে উদয় হইতে পারে যাহা তখন তখন লিখিয়া না রাখিলে উহা ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য কেহ কেহ সর্বদাই কাগজ পেন্সিল সঙ্গে রাখিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন যাহাতে ওই সব ভাবগুলি মনে উদয় হইলেই উহা লিখিয়া রাখা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যাহা ভুলিয়াই যাইতে হয় তত্ত্বহিসাবে উহার মূল্য কী? কারণ তোমার নিকট শুনিয়াছি যে আগুন স্পর্শ করিলে কিছু না কিছু চিহ্ন রাখিয়াই যাইবে।

আমার প্রশ্ন শুনিয়া মা গোপীবাবুকে বলিলেন, 'কী বাবা, তুমি কী বল?'

গোপীবাবু আমাকে বলিলেন, 'যেই স্থিতিতে ওই সকল সূক্ষ্মভাবের উদয় হয় সেই স্থিতিতে যদি সর্বদা থাকা যাইত তবে উহা ভুলিবার কোনও প্রশ্ন হইত না; কিন্তু ওই স্থিতিতে সর্বদা থাকা যায় না। উহা হইতে নামিয়া আসিতে হয়। ওই সব ভাব যাহাতে মনে থাকে সেইজন্য লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়। ওই ভাবগুলি এত তড়িৎবেগে আসে ও চলিয়া যায় যে তখন তখন উহা ধরিতে চেষ্টা না করিলে উহা আর থাকে না। কেবল আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, কবিদের inspiration সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তুমি হয়তো শুনিয়াছ যে রবিবাবু বলিয়াছেন যে তাঁহার কোনও কবিতা যদি লেখার পরই হারাইয়া যায় তবে তিনি উহা চিন্তা করিয়া আর লিখিতে পারিবেন না। চিন্তা করিয়া লিখিতে গেলে যাহা হইবে তাহাতে হারানো কবিতার ভাব ও ভাষা কিছুই থাকিবে না।

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া ডাক্তারবাবু মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিলাম।

৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমা মোটরে এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলেন। ১০ই মাঘ সরস্বতী পূজা, ওই উপলক্ষেই মায়ের এলাহাবাদ গমন। তিন দিন ওইখানে থাকিয়া ১৩ই মাঘ কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। কাশীতে মাত্র একদিন থাকিয়া মা রাজগীর চলিয়া গেলেন।

রাজগীর হইতে শিব চতুর্দশীর পূর্বে মা কাশী আসিলেন। ৪ঠা ফাল্গুন, খুব ধুমধামের সহিত শিব চতুর্দশী ব্রত আশ্রমে হইল। আমরা সারারাত আশ্রমে কাটাইলাম। পরদিন আশ্রমেই প্রসাদ পাইলাম। ৯ই ফাল্গুন মা বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে দোলের উৎসব শেষ হইলে হরিবাবা মাকে লইয়া হোসিয়ারপুর যান। সেইখানে ৭ দিন থাকা হয়। সেইখান হইতে ৫ই চৈত্র উড়িয়াবাবার তিরোধান উৎসবে মা আবার বৃন্দাবনে আসেন। বৃন্দাবনে একদিন থাকিয়াই দেরাদুন রওনা হইয়া যান। ১০ই চৈত্র, সোমবার দেরাদুন হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন।

১১ই চৈত্র মঙ্গলবার, (ইং ২৪।৩।৫৮)

বেলা ১১ টার সময় মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

আশীষ নামে একটি গুজরাতি ব্রহ্মচারী গতকল্য এখানে আসিয়াছে। সে আজকাল সাধু ভাবেই জীবন যাপন করে এবং মাঝে মাঝে আসিয়া মা-র সঙ্গ করে। গতকল্য সে কী আহার করিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া মা যখন শুনিলেন যে, সে কিছু না খাইয়াই শুইয়াছিল, তখন মা তাহাকে বলিলেন, 'খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটা নিয়ম করিয়া লও। যেমন সাধন ভজনের নিয়ম থাকা দরকার সেইরূপ খাওয়া দাওয়ারও নিয়ম থাকা দরকার; কারণ খাওয়া দাওয়া করিয়া শরীর পুষ্ট রাখা তো সাধন ভজনের জন্যই। যাহারা আহার সম্বন্ধে অনিয়ম এবং কঠোরতা করে তাহাদিগকে অনেক সময় অসুস্থ হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। অসুস্থ হইয়া পড়িলে তখন আবার চিকিৎসা, পথ্য ইত্যাদি নিয়মমতো করিতে হয়। কেহ ওইভাবে নিয়মমতো চলিয়া ভাল থাকে। কেহ হয়তো আর পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় না। শরীর প্রকৃতি হইতে হইয়াছে কিনা। তা'ই প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া শরীর রক্ষা করিতে হয়। তাহা না হইলে প্রকৃতি ইহার প্রতিশোধ লয়।

'তবে সাধন ভজন করিয়া কেহ যদি অন্তরের যোগ পাইয়া যায় এবং উহাতে যদি তাহার তন্ময়তা আসিয়া পড়ে তবে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম পালন না করিলেও তাহার কোনও ক্ষতি হয় না। মনে কর এক সাধকের আহারের সময় হইয়াছে, কিন্তু সে সাধন ভজন নিয়া এমনই মত্ত হইয়া পড়িয়াছে যে সে উহা ছাড়িয়া আর যাইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় সে দুপ্রহরের আহার রাত্রিতে করিলেও তাহার শারীরিক কোনও ক্ষতি হইবে না। কারণ শরীর ধারণের জন্য আহার হইতে সে যে বল লাভ করিত তাহা সে সাধন ভজন হইতেই লাভ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় একেবারে না খাওয়া বা অত্যধিক খাওয়া কিছুই তাহার ক্ষতি করে না; কারণ সাধন ভজনের ফলে সে বদলাইয়া যাইতেছে কিনা তাই প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তাহার কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যতদিন এই অন্তর্যোগ না হয় ততদিন প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিতেই হইবে। সেইজন্য পরিমিত আহার এবং পরিমিত নিদ্রার ব্যবস্থা।

'আবার দেখ, কেহ যদি অন্তর্যোগে একটা স্থিতি লাভ করিয়া যায়, যেমন কেহ যদি না খাইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহা হইলেই বা হইল কী? এই

শরীরের সাধনার খেলার সময় ইহা দেখা গিয়াছে। দিনের পর দিন আহার না করিয়াই থাকিতাম, সেজন্য শরীরের কোনও দুর্ব্বলতা বা অবসাদ হইত না, কিন্তু তখনও প্রশ্ন উঠিত যে না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেছি তাহাতেই বা হইল কী? ইহা তো আর পরম স্থিতি নয়। তাই দেখিতেছ যে লক্ষ্যটা যদি চরম পরমে নিবদ্ধ থাকে তবেই রক্ষা। তাহা না হইলে সাধনপথে কেহ কেহ বিভূতি লইয়া মত্ত হইয়া থাকে। কেহ হয়তো বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিল—যাহাকে যাহা বলিতেছে তাহাই সত্য হইতেছে এবং ইহাতেই সে আনন্দে মাতিয়া আছে। কিন্তু বাক্‌সিদ্ধি তো মাত্র একটা সিদ্ধি, তাহার যে আরও কত অসিদ্ধি রহিয়াছে সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। এই সব সিদ্ধি সাধন পথের অন্তরায়।'

আশীষ। যাহাকে বিহঙ্গম যোগ বলা হয় তাহাতে বিভূতি লাভ এবং বিভূতি ত্যাগ এইসব কিছু নাই। পাখি যেমন এক লক্ষ্যে চলিয়া যায় সাধকও সেইরূপ বিভূতি লাভের চেষ্টা না করিয়া পরম লক্ষ্যের পথে চলিতে থাকে।

মা। এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা ওই বিহঙ্গম যোগেরই কথা। সাধন পথে চলিলে বিভূতিগুলি আপনা হইতেই আসে। উহা আসিলেও ওই দিকে লক্ষ্য দিতে নাই। শুধু সেই চরম পরম লক্ষ্যের দিকেই চলিতে হয়। সাধন পথে বিভূতি আসিবে না ইহা নয়। এখানে বিভূতি আসাই স্বাভাবিক। কারণ তিনি বিভূতিময় কিনা। কথা হইল বিভূতি আসিলেও ওই দিকে লক্ষ্য দিতে নাই। উহা লইয়া খেলিতে গেলেই ওইখানে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। সেইজন্য এক লক্ষ্যে চলা।

'সাধন ভজনের উদ্দেশ্য হইল তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন। ওই যোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ধ্যান, জপ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি করিতে বলা হয়। যদি কাহারও ভগবানের সহিত ভিতরে যোগ স্থাপন হইয়া যায়, ভগবানের নামজপ বা ধ্যান কাহাকেও যদি তন্ময় করিয়া ফেলে, তাহাকে কখনও বলা হয় না যে সে ওই জপ ধ্যান ছাড়িয়া সৎসঙ্গ করুক বা কীর্তন করুক। কীর্তন, সৎসঙ্গ প্রভৃতির উদ্দেশ্যই হইল ভগবানের সহিত যোগ স্থাপন। বাহিরের বস্তু ছাড়িয়া মন যাহাতে ভগবানে

মগ্ন হয় সেইজন্য তো সৎসঙ্গ প্রভৃতি করিতে বলা হয়। অনেকে সৎসঙ্গ করিতে গিয়া ওইখানে যাহা শোনে তাহা মনে রাখিবার জন্য টুকিয়া রাখে, পরে সে আবার ওইগুলিই অন্যের কাছে বক্তৃতা করিয়া থাকে। এইভাবে সৎসঙ্গ করা কিন্তু ঠিক নয়। ইহা দ্বারা সৎসঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অবশ্য যে কোনও ভাবে ভগবানের নাম শুনিলে বা ভগবানের নাম লইলে উহার কিছুটা ফল পাওয়াই যায়। তবে সাধুর মুখে ভগবানের নাম শুনিলে যে ফল পাওয়া যায়, অসাধুর মুখে উহা শুনিলে ততটা ফল পাওয়া যায় না।

এক গল্প আছে—রাজবাড়ির এক মেথরের রানীকে দেখিবার খুব ইচ্ছা হইল। তাহার পক্ষে সাধারণভাবে রানীর দর্শন লাভ সম্ভব নয় বলিয়া সে সাধুর বেশ ধরিয়া রাজবাড়ির সিংহদরজায় স্থান নিল। সারাদিন সে চুপ করিয়া ওইখানে বসিয়া থাকিত। কেহ কিছু দিলে সে উহা গ্রহণ করিত না বা কাহারও সঙ্গে কথা বলিত না। এইভাবে কিছুদিন গেলে তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল, 'এমন এক মহাত্মা আসিয়াছেন যিনি কাহারও সঙ্গে কোনও কথা বলেন না বা কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন না।' এই কথা রাজার কানে গেল। তিনি একদিন রানীসহ অনেক ভেট লইয়া সাধু দর্শনে আসিলেন। মেথর এইবার রানীকে খুব ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। রাজা চলিয়া গেলে সে ভাবিতে লাগিল, 'আমি সাধু নহি, ভন্ডামি করিয়া সাধু বেশ ধারণ করিয়াছি, কিন্তু আমার এই বেশ দেখিয়াই রাজা রানী আমার সেবার জন্য কত মূল্যবান জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত। আমি যদি প্রকৃত মহাত্মা হইতাম তবে না জানি আরও কী হইত।' এই চিন্তা করিয়া সে আর সাধুবেশ ত্যাগ না করিয়া সাধন ভজনের জন্য জঙ্গলে চলিয়া গেল। তাই দেখ, ভগবানের নামে ভন্ডামি করিয়া তাহার ভিতরে প্রকৃত সাধুত্ব জাগিয়া উঠিল। আবার অনেকে এইরূপ ভন্ডামি করিতে গিয়া ঘাড়ে লাঠির আঘাতও পাইয়া থাকে।

এইভাবে মা কিছুক্ষণ কথা বলিলেন। বেলা ১১টা বাজিল দেখিয়া মা এইবার উঠিলেন।

আগরপাড়ায় নূতন আশ্রম স্থাপনা

২৮শে চৈত্র, শুক্রবার (ইং ১১। ৪। ৫৮)

বিকালে মা কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন।

কলিকাতার বালিগঞ্জের আশ্রম বিক্রয় করিয়া আগরপাড়াতে নূতন আশ্রম করা হইয়াছে। ইহা গঙ্গার ধারে। জমির পরিমাণ ৮ বিঘার উপর। এই জমির উপর তেতলা একটি বড় বাড়ি আছে, পুকুর আছে, Tube Well আছে, ফলের গাছ আছে এবং গঙ্গায় নামিবার জন্য দুইটি বাঁধানো ঘাটও আছে। মা কলিকাতায় গেলে বালিগঞ্জের আশ্রমে লোক দাঁড়াইবার স্থানও পাইত না বলিয়া এই নূতন আশ্রম ক্রয় করা হয়। ইহার মূল্য ৯০ হাজার টাকা। এইবার এই নূতন আশ্রমেই মায়ের জন্মোৎসব হইবে। জন্মোৎসব উপলক্ষে হরিবাবা প্রভৃতি মহাত্মারাও আসিবেন।

৩রা শ্রাবণ, শনিবার ১৩৬৫ সন (ইং ১৯। ৭। ৫৮)

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ১২টার সময় মা সোলন হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। কলিকাতার জন্মোৎসবের পর মা পুরী এবং রাঁচিতে যান। সেইখান হইতে সোলনে যান। সেইখানেই এইবার গুরুপূর্ণিমা হয়। এই সময় মায়ের কাশীতে আসিবার কোনও কথা ছিল না; কিন্তু বোম্বাইয়ের কানিয়া ভাই তাঁহার এক বৃদ্ধ গুরুজনের শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে এইখানে ভাগবত সপ্তাহ, রুদ্রাভিষেক এবং বিষ্ণুযজ্ঞ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। এই শ্রাবণ মাস মলমাস হইলেও নিষ্কাম ভাবে এইসব কাজ করিতে নাকি কোনও বাধা নাই। তাহা ছাড়া এইদিকের লোকেরা মলমাসকে পুরষোত্তম মাস বলিয়া থাকে। ইহা নাকি ধর্মকার্যের পক্ষে খুবই প্রশস্ত। উক্ত ভাগবত সপ্তাহাদি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের কাশীতে আসা।

আজ দুপুরে মা ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। তখন ৺শঙ্কর ভারতীজীর শিষ্যকে ডাকাইয়া তাহার নিকট হইতে ভারতীজীর শেষ অবস্থা শুনিতে চাহিলেন। ওই শিষ্যের নিকট যাহা শোনা গেল তাহাতে মনে হইল যে ভারতীজী অর্ধযোগাসনে থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কোনও অসুখ বিসুখ হইয়াছিল না। অথচ ভারতীজীর মৃত্যু সম্বন্ধে নানা গুজব রটিয়াছিল।

রাঁচির ৺কালীমাতা প্রসঙ্গ

৪ঠা শ্রাবণ, রবিবার বিকালেও মা ৺অন্নপূর্ণার বারান্দায় বসিয়াছিলেন। গোপীবাবু সন্ধ্যার পূর্বেই মা-র সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় মা রাঁচির আশ্রমের মা কালীর কথা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'এবার গরমের সময় রাঁচিতে যখন গিয়াছিলাম একদিন আরতির সময় মা কালীর নিকট দাঁড়াইয়া আছি তখন খেয়ালবশে মা কালীকে বলিলাম, 'অনেকদিন হইতে তো এখানে আছ, কিন্তু কোনও সাড়া তো পাওয়া যাইতেছে না।' ওই দিনই দুইটি লোক, স্বামী স্ত্রী, এই শরীরের নিকট কোনও গোপন কথা বলিতে আসিল। কালী মন্দিরের কাছে বসিয়াই তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। কথা শেষ হইলে তাহাদিগকে মন্দিরের বিগ্রহ দেখাইয়া বলিলাম, 'দেখ, কেমন বিগ্রহ!' তাহারাও বিগ্রহ দেখিয়া প্রশংসা করিল এবং বলিল, 'মা, এই বিগ্রহ সম্বন্ধে আমার বন্ধু আমাকে কিছু বলিয়াছেন। উহা আবার অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু আপনাকে উহা বলিতেছি—আমার এই বন্ধু বরিশালের লোক। তাহাদের বাড়ির নিকট একটি ৺কালী মন্দির ছিল। মন্দির কিছু নয়, একটি ছনের ঘরের মধ্যে একটি ৺কালীমূর্তি ছিল। ছোটবেলা হইতেই ওই মূর্তির প্রতি আমার বন্ধুর বিশেষ টান ছিল। ছোটবেলায়ই সে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, সে বড় হইলে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে ৺কালী মূর্তি স্থাপন করিবে।

'ইহার পর দেশ ভাগ হইয়া বরিশাল পাকিস্তানে চলিয়া গেল। বন্ধুটি এখন রাঁচিতে আসিয়া ব্যবসায় করিতেছে এবং ব্যবসায়ে তাহার বেশ উন্নতিও হইয়াছে। একদিন রাত্রিতে সে স্বপ্নে দেখিতে পাইল যে, সে যেন তাহার পূর্ব সঙ্কলিত ৺কালী মন্দির কোথায় হইবে এবং কোথায় সেই মূর্তি স্থাপন করিবে—এই সব আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় শুনিতে পাইল যে মা কালী বলিতেছেন, 'আমি তো আনন্দময়ী আশ্রমে আছি।' কথাগুলি খুব স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু কোনও মূর্তি দেখিতে পাইল না। ওই কথা শুনিয়া তাহার প্রাণে খুব আঘাত লাগিল এবং সে সজল নয়নে মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল, 'মা, আমি মন্দির

করিলে তুমি কি ওইখানে আসিবে না?' এই কথা বলিতে বলিতেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে আমাকে ওই স্বপ্নের বিবরণ বলিয়া ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে।

ওই লোকটির কথা শুনিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, 'এই শরীরের কাছে কেহ কিছু বলিলে তাহার কোনও অনিষ্ট হয় না। আর এই জাতীয় স্বপ্নের কথা সর্বসাধারণে প্রকাশ করিলেও কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই। তবে তুমি তোমার বন্ধুকে বলিও যে মা কালী এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তিনি অন্যস্থানে নিজকে প্রকট করিতে পারেন।' পরে শুনিতে পাইলাম যে, ওই লোকটি স্বপ্ন দেখিবার পর হইতেই রাঁচির আশ্রমে কালী সেবার জন্য মাসিক ২৫ করিয়া দিতেছে।

'নীলমণিকে* নিয়াও আর একটি ঘটনা হইয়াছিল। একদিন নীলমণি পাঠ করিতে আসিবে, তখন তাহার মনে হইল যে, যে কাপড়টা সে পরিয়া আছে উহা ছাড়িয়া একখানা ধোয়া কাপড় পরিয়া তাহার যাওয়া উচিত। কারণ দেবালয়ে পাঠ করিতে হইবে তো। কিন্তু আলস্যবশত উহা না করিয়াই সে আশ্রমে আসিল। পাঠ করিবার পূর্বে কলের কাছে হাত, পা ধুইতে গিয়া সে এমন আছাড় খাইল যে তাহার ফলে তাহার আর ওইদিন পাঠ করা হইল না। ওইদিন রাত্রিতে সে স্বপ্ন দেখিল যে মা কালী তাহাকে বলিতেছেন, 'তোমার যদি শুচি-অশুচির সংস্কার না থাকিত তবে তুমি যে কাপড় পরিয়া থাক না কেন উহা লইয়া পাঠ করিলে কোনও দোষ হয় না; কিন্তু তোমার যখন ওই সম্বন্ধে সংস্কার আছে তখন অশুদ্ধ কাপড় পরিয়া পাঠ করিতে আসা ঠিক হয় নাই। সেইজন্য আমি চন্দ্র ভৈরবকে বলিলাম যে সে যেন তোমাকে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দেয়। সে তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।'

'এই সকল কথা আমি পরে শুনিতে পাইলাম। খেয়ালবশে মা কালী কেন সাড়া দেয় না বলিয়াছিলাম, উহারই উত্তরে যেন এই দুইটি ঘটনার কথা শোনা গেল।'

মা আরও একটি দর্শনের কথা বলিলেন যাহা এইবার রাঁচিতে হইয়াছিল। মা বলিলেন, 'এবার হরিবাবাকে নিয়া রাঁচিতে যখন ছিলাম তখন একদিন

* অধ্যাপক বীরেশ্বর গাঙ্গুলী—প্রখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক।

দেখিতেছি কী যে, যে স্থানটায় আশ্রম করা হইয়াছে উহা যেন একটা বন জঙ্গলের মতো জায়গা, ওই জঙ্গলের একটা গাছের তলায় হরিবাবা তাহার পরিকর সহ কীর্তনের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় ওই জায়গায় রাজা আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়া হরিবাবাকে বলিলেন, 'এই জায়গা তো দেবীর স্থান। এখানে দেবীর মন্দির এবং বিগ্রহ আছে। কাজেই তোমরা এখান হইতে সরিয়া যাও। আমি দেবীর পূজা করিব।' রাজা লোকজন সহ ওইখানে পূজা করিতেই আসিয়াছিলেন। এই শরীরও ওইখানে ছিল। রাজার কথা শুনিয়া হরিবাবা আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে সরিয়া আসিতে বলিলাম। রাজা দেবীর পূজা করিয়া চলিয়া গেলেন। যখন এই দর্শনের কথা হরিবাবাদের বলিলাম তখন কেহ কেহ বলিল যে, এই দর্শনে অতীত এবং বর্তমান মিশিয়া গিয়াছে। কারণ যে রাজা আসিয়া দেবীর পূজা করিলেন তিনি হইলেন অতীত কালের আর হরিবাবা হইলেন বর্তমান সময়ের, এই দুই জনকে এক সময়ে দেখা গেল কেমন করিয়া? (গোপীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া) বাবা, এ সম্বন্ধে তুমি কী বল?

গোপীবাবু। ইহা হইতে পারে, কারণ এমন এক স্থিতি আছে যেইখানে অতীত ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই। সেইখানে সবই নিত্য বর্তমান। কালাতীত অবস্থা হইতে এই জাতীয় সব কিছুই দেখা যায়।

মা। (হাসিয়া) আমিও উহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে ওইখানে সবই সম্ভব।

গোপীবাবু। এখন দেখা যাইতেছে যে, রাঁচির আশ্রমে যে কালী স্থাপন করা হইয়াছে উহা ঠিকই হইয়াছে। পূর্বেও উহা দেবীর স্থান ছিল।

১৩ই শ্রাবণ ভাগবত শেষ হইল। ১৪ই শ্রাবণ, বুধবার রুদ্রযজ্ঞ এবং বিষ্ণুযজ্ঞ শেষ হইল। বৃহস্পতিবার দিনই বেলা ২।। টার সময় মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে লোকজন বিশেষ নিলেন না। বিন্ধ্যাচল হইতে সোমবার ফিরিয়া আসিয়া আবার মঙ্গলবার (২০শে শ্রাবণ) দেরাদুন রওনা হইলেন। মায়ের কথায় বুঝা গেল যে তিনি আর ঝুলনের সময় এইবার এইখানে আসিবেন না। কারণ ঝুলনের সময় এইখানে কী করিতে হইবে তাহা সব বলিয়া গেলেন। মা বলিলেন, 'গত ঝুলনের সময় তোমাদের গোপাল দেরাদুনে গিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া আমাকে কী যেন বলিয়াছিল। একদিন নয় দুইদিন

গিয়াছিল। তখন মনে করিলাম যে, ঝুলনের সময় এখানে গোপালকে যে আসন হইতে নামানো উঠানো হইয়াছিল তাহাতে বোধহয় গোপাল হাতে ব্যথা পাইয়াছে। সেইজন্য বোধহয় হাত নাড়িয়া কিছু বলিয়া গেল। পরে খেয়াল হইল যে, বৎসরে দুইবার মাত্র গোপালকে আসন হইতে নামাইবার ব্যবস্থা আছে—একবার হইল জন্মাষ্টমীর সময় আর একবার দোলের সময়। ঝুলনের সময় গোপালকে আসন হইতে নামাইবার ব্যবস্থা নাই। ইহারা গতবার ঝুলনের সময় গোপালকে আসন হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়াছিল। তাই হাত নাড়িয়া গোপাল আমাকে বলিয়া গেল যে উহা করা ঠিক হয় নাই। এবার তোমরা ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে গোপাল যে আসনে আছে ওই আসনই চারিজনে হাতে তুলিয়া আস্তে আস্তে তিনবার দোল দিও।' অতুল (ব্রহ্মচারী) দাদাকে বলিলেন, 'তুমি দোল দেওয়ার সময় গোপালকে ধরিয়া রাখিও যেন গোপাল আসন হইতে পড়িয়া না যায়।'

এইসব বলিয়া মা স্টেশনে রওনা হইয়া গেলেন। তখন খুব বৃষ্টি পড়িতেছিল।

রাঁচি এবং কাশীর গোপালের নানা লীলা প্রসঙ্গ

১৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ সন (ইং ৫। ৯। ৫৮)

বেলা ১।।টার সময় মা দিল্লি হইতে কাশী আসিলেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষেই মায়ের কাশী আগমন। বিকাল বেলা অল্প সময়ের জন্য মা ঁঅন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। সেই সময় রাঁচি এবং কাশীর আশ্রমের গোপাল সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। মা বলিলেন, 'রাঁচি আশ্রমের ঁকালী যে সকল লীলা করিয়াছেন তাহা তো তোমাদিগকে বলিয়াছি। ওইখানে আরও একটি দর্শন হইয়াছিল তাহাও তোমাদিগকে বলিতেছি। একদিন আমি ঁকালীমন্দিরের নিকট শুইয়া আছি, তখন দেখিতেছি কী একটি বালক ওইখানে পা গুটাইয়া বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া গান করিতেছে। তাহার গায়ের রং মিশমিশে কালো নয়, মুখখানা গোলগাল, পরনে একটি নেংটি। মুখে ও গায়ে ধুলা লাগিয়া আছে। মাঠে এবং জঙ্গলে ঘুরিলে ছেলেদের যে চেহারা হয় ওই ছেলেটির চেহারাও প্রায় সেইরূপ। সে যে গান করিতেছিল, তাহা এই—

'নাম করে যা, নাম করে যা, নাম করে যা, নাম করে যা।
নামে রুচি, ভাবের পুষ্টি হবেরে মন, নাম করে যা।'

'রাঁচির আশ্রমে মা কালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রিয়রঞ্জন আবার বৃন্দাবন হইতে এক গোপালের মূর্তি আনিয়া ওইখানে রাখিয়াছে। মা কালী তো কাহাকেও কাহাকেও স্বপ্নে দর্শন দিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া গোপাল বোধহয় মনে করিল যে সেই বা বাদ যায় কেন? তাই বোধহয় ওইভাবে দেখা দিয়া নাম করার কথা বলিয়া গেল। তবে কাহার নাম করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সে কিন্তু কিছু বলে নাই।

'ইতিমধ্যে তোমাদের কাশী আশ্রমের গোপালও এক কীর্তি করিয়াছে। তাহার যে লোকের নিকট জিনিসপত্র চাওয়ার অভ্যাস আছে তাহা তো তোমরা জান। তোমাদের কালনদিদি কিছুদিন পূর্বে যখন এই গোপালকে প্রণাম করিতেছিল তখন সে হঠাৎ শুনিতে পাইল যে কে যেন বলিতেছে, 'সকল সময় কি রূপার মুকুট পরিয়া থাকিতে ভাল লাগে?' কালনদিদি মনে করিল যে কেহ বোধহয় গোপালকে সর্বদা রূপার মুকুট পরিয়া থাকিতে দেখিয়া ওইকথা বলিতেছে, কিন্তু প্রণাম করিয়া উঠিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরদিন সে যখন আবার ওইরূপ প্রণাম করিতেছিল তখনও শুনিতে পাইল যে কে যেন বলিতেছে, 'সব সময় কি রূপার মুকুট পরিয়া থাকা যায়?' ইহা শুনিয়াই সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে যে ওইখানে দ্বিতীয় আর কেহ নাই। তখন তাহার ধারণা হইল যে গোপালই বোধহয় ওই কথা বলিতেছিল। তখন সে গোপালকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'আমি গরিব মানুষ, আমি তোমাকে সোনার মুকুট কোথা হইতে দিব? আমার ছেলের যদি চাকুরি হয় তবে তাহার প্রথম মাসের মাহিনা দিয়া তোমাকে সোনার মুকুট করাইয়া দিব।' এই ঘটনার ১৫ দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে তাহার ছেলের ২৫০, বেতনের এক চাকুরি হইয়াছে। তাই কালনদিদি ২৫০, দিয়া গোপালকে এক সোনার মুকুট করিয়া দিয়াছে। এইভাবে গোপালের সম্পত্তি হইতেছে। তাই গোপালকে বলি, 'ঠাকুর, তোমার সম্পত্তি তুমিই রক্ষা করিও।'

'আরও একটা ব্যাপার হইয়াছিল—একদিন কালনদিদি দেখিতে পাইল

যে, তাহার বিছানা বালিশ ও bed cover এর উপর ধুলা মাখানো পায়ের আঙুলের চিহ্নগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সে মনে করিল কন্যাপীঠের ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে কেহ বোধহয় ধুলা পায়ে তাহার বালিশের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই সে রাগারাগি করিতে লাগিল। তখন কন্যাপীঠের সমস্ত ছোট মেয়েকে ওইখানে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে কে ওই কাজ করিয়াছে? তাহারা সকলেই বলিল যে তাহারা বিছানার উপর উঠে নাই। তখন তাহাদের পায়ের মাপ লইয়া দেখা গেল যে বালিশের উপর যে পায়ের চিহ্ন আছে উহার মাপ এই সকল মেয়ের পায়ের মাপ হইতে অনেক ছোট। যেদিকে বালিশ ছিল সেইদিকে দেওয়ালের উপর গোপালের এক ছবিও ছিল। তখন কালনদিদি মনে করিল যে এও গোপালের কীর্তি।'

একদিন মায়ের সম্মুখে হঠযোগের আসনাদির কথা হইতেছিল। ডা. গোপাল দাশগুপ্ত এবং ব্রহ্মচারী দত্তাত্রেয় ওইখানে ছিলেন। তাঁহাদের আসনাদির কথা শুনিয়া মা বলিলেন, 'হঠযোগাদির আসন যাহা অনেকে অভ্যাস করিয়া থাকে উহার সহিত যদি আধ্যাত্মিক ভাবের যোগ না থাকে তবে ওইগুলি অহং ভাবকেই পুষ্ট করে। যাহারা ওই সব আসনাদি করিতে পারে বা করে তাহারা নিজকে সাধারণ হইতে আলাদা মনে করে। ইহা দ্বারা শুধু অহংকারই পুষ্ট হয়। জপ, ধ্যান, শুদ্ধাহার সম্বন্ধেও এই কথা। আমি এত ঘন্টা জপ করিতে পারি, আমি এত ঘন্টা ধ্যান করিতে পারি বা আমি খুব শুদ্ধাহারে আছি—এই জাতীয় কথা বলা বা চিন্তা করা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক নয়। কারণ এগুলির লক্ষ্য ভগবান নয়। আসন ইত্যাদি করিয়া যদি ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা না বাড়ে তবে ওইগুলি শারীরিক ব্যায়াম ভিন্ন আর কী?

'এই শরীরের সাধনের খেলার সময় দেখিয়াছি যে শ্বাসের গতির সহিত আসনের সম্বন্ধ আছে। শ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন গতির সঙ্গে আসনও বদলাইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই। ইহা আপনা আপনিই হইয়া গিয়াছে। যেমন বসিয়া আছি তখন দেখিতে পাইলাম যে শ্বাসের গতি বদলাইয়া গেল আর আপনা আপনি পা দুটি লম্বা হইয়া মেলিয়া গেল। আবার উহা আপনা আপনি গুটাইয়া পদ্মাসন বা অন্য কোনও আসনে বদ্ধ হইয়া গেল। আবার

ওই আসন ভাঙিয়া যাইবার সময়ও শ্বাসের গতি অন্যভাবে চলিতে লাগিল। লোকের ভাব অনুযায়ী নিঃশ্বাসের গতি এবং আসন হইয়া থাকে। এই জন্য বলা হয় যে লোকে যখন যেভাবে থাকে শরীরের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহার প্রত্যেকটিকে আসন বা মুদ্রা বলা যায়। এই অর্থে আসন এবং মুদ্রা অনন্ত। জলকে লাভ করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে জলের অনন্ত তরঙ্গও লাভ হয় সেইরূপ এককে জানিলে অনন্ত আসন মুদ্রারও জ্ঞান হয়। কারণ এগুলি তো তিনিই।'

জন্মাষ্টমীর পর মা বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। সেইখানে কয়েকদিন থাকিয়া আবার ৩১শে ভাদ্র কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। শুনিয়াছিলাম যে মা ভাগবত জয়ন্তীর সময় কাশীতে থাকিবেন কিন্তু দিল্লি হইতে টেলিগ্রাম আসায় মা ভাগবত জয়ন্তীর মধ্যেই দিল্লি চলিয়া গেলেন।

মায়ের খেয়ালের অর্থ

যেই দুই দিন মা এখানে ছিলেন সেই সময় মা যে 'খেয়াল' শব্দটি ব্যবহার করেন উহার অর্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনার সময় গোপীবাবুও উপস্থিত ছিলেন। এইবার বিন্ধ্যাচলে শ্রীযুক্ত অনিল গাঙ্গুলি মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মা, তোমার কাছে আসিয়া আমাদের লাভ কী? তুমি তো সর্বদাই বল যে তোমার খেয়াল হইলে তুমি কিছু কর, আর না হইলে কিছুই কর না।' মা বলিলেন, "ওই প্রশ্ন শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, 'তোমরা এই খেয়ালী মেয়েটার কাছে আসিয়া খেয়ালই লাভ করিবে।' তখন কথা উঠিল যে 'খেয়াল' কথাটার অর্থ কী? ওই সম্বন্ধে অনেক কথা ওইখানে হইয়াছিল। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) "গতকাল যে তুমি 'খেয়াল'কে 'মহা ইচ্ছা' বা 'পরম সত্তার উল্লাস' বলিয়াছিলে খেয়ালের অর্থ কিন্তু ঠিক উহা নয়। কারণ যাহা যাহা বলিবে উহাই একদিক নিয়া কথা বলা হইবে। কিন্তু খেয়াল বলিতে যাহা বলা হয় তাহাতে দিক নিবদ্ধ কোনও ভাব নাই। এমন কিছু নাই যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া 'খেয়াল' কথাটি বুঝানো যায়। তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া 'খেয়াল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইহা কোনও শাস্ত্রীয় শব্দ নয় বা কোনও তত্ত্ব কথাও নয়। তবুও ইহা হইতে তোমরা কিছু ধারণা করিতে পার। এ শরীরের কাছে

খেয়াল বলিয়াও কিছু নাই। যে খেয়াল করে, যাহা খেয়াল করে এবং খেয়াল—এগুলি এই শরীরের কাছে সব এক। কাজেই খেয়ালকে তোমরা যা' তা'ও বলিতে পার।' এইভাবে মা অনেক কথাই বলিলেন। উহা শুনিয়া আমাদের ওই সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট আভাস ভিন্ন কোনও স্পষ্ট ধারণা হইল না। ব্যাপারটি বুদ্ধির অতীত বলিয়াই বোধহয় ইহাকে ভাষার মধ্যে ধরা যায় না।

৪ঠা আশ্বিন মা দিল্লি রওনা হইয়া গেলেন। বি. কে. শাহ্ মহাশয়ও এই সঙ্গে গেলেন।

২৭শে আশ্বিন, সোমবার ১৩৬৫ সন (ইং ১৩। ১০। ৫৮)

গতকল্য রাত্রি ১২ টায় মা দিল্লি হইতে আসিয়াছেন। আজ সকালবেলা ডা. গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় গরিব ছেলে মেয়েদিগকে গায়ের গেঞ্জি এবং একটি করিয়া পিতলের ছোট গোপাল দান করিলেন। এই দান উপলক্ষেই মায়ের কাশীতে আসা। প্রতি বৎসরই ডা. দাশগুপ্ত মহাশয় এই সময় গরিব ছেলেমেয়েদের কিছু না কিছু দান করিয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের হাত দিয়া এই সকল বিলাইলেন।

মাকে খুকুনীদিদির শরীরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে দিদি এখন অনেকটা ভাল আছেন। মা নিজেই দিদির পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিদিকে আরোগ্যের পথে আনিয়াছেন।

বিকাল ৩।। টার সময় মা মোটর গাড়িতে এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলেন।

৬ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৫ সন (ইং ২৩। ১০। ৫৮)

সন্ধ্যা ৬ ।। টার সময় মা এলাহাবাদ হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। শুনিলাম যে এলাহাবাদে এবার দুর্গা পূজা খুব সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ওইখানকার কর্মীদের বিশেষত শ্রীমান সুবোধ এবং শ্রীমতী রেণুর প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন।

অখণ্ড ভগবত স্মৃতি

এইবার মা মাত্র চারিদিন এখানে থাকিয়া বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। এই চারিদিন প্রায় প্রত্যহই রাত্রিতে গোপীবাবুর সহিত মায়ের কাছে দুই এক ঘন্টা

কাটাইয়াছি। প্রত্যহই যে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তাহা নয়। নানা জাতীয় কথাই হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে গোপীবাবু মায়ের কাছে এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কিছু সংখ্যক লোক লইয়া যদি অখণ্ডভাবে ভগবত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে খুব ভাল হয়। প্রত্যেকে ১৫ মিনিট সময় করিয়া ভগবত নাম করিবে এবং এইভাবে ২৪ ঘন্টা নাম চালাইতে হইলে অন্তত ৯৬ জন লোকের দরকার হইবে। আবার প্রত্যেক ১৫ মিনিটের জন্য একাধিক লোক থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা অসুখ বিসুখের জন্য বা কোনও কারণে কেহ যদি তাহার নির্দিষ্ট ১৫ মিনিট সময় নাম রক্ষা করিতে না পারে তবে ওই সময়ে অপরের দ্বারা নাম রক্ষা হইয়া যাইতে পারিবে। সেইজন্য গোপীবাবু প্রস্তাব করেন যে প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য অন্তত ৫ জন ব্রতী থাকিলে ভাল হয়। এই হিসাবে মোট ৪৮০ জন ব্রতীর প্রয়োজন। শ্রীশ্রীমা গোপীবাবুর প্রস্তাব খুব আনন্দের সহিত সমর্থন করেন এবং যাহাতে সকলেই এই নাম রক্ষা কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন সেইজন্য সকলকেই ইহা জানাইয়া দিতে বলেন। প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে জ্যোতিষবাবু (ভাইজী) মায়ের আদেশ মতো মায়ের ভক্তদিগকে জানাইয়াছিলেন যে প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ সুবিধা মতো নির্দিষ্ট সময়ে ১০ মিনিট করিয়া নাম করে। সেই সময় অনেকেই এই দশ মিনিটের নাম করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা এখন পর্যন্ত ওই নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়।

কীভাবে সেই সময় ওই ১০ মি: নাম করিবার কথা উঠিয়াছিল সেই সম্বন্ধে মা একদিন বলিলেন, "দেরাদুনে যখন কমলা নেহেরু এই শরীরকে লইয়া এক যজ্ঞ করিয়াছিল তখন সে একদিন এই শরীরকে বলে, 'মা, কী যে করিব তাহা বুঝিতে পারি না। গান্ধীজী আমাকে হরিজন সেবার কাজ করিতে বলেন, আমার কিন্তু ওইসব ছাড়িয়া দিয়া তোমার কাছেই থাকিতে ইচ্ছা করে। কেহ কেহ আবার একথাও বলেন যে ভগবান বলিয়া কিছু নাই। লোক সেবাই হইল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই জাতীয় অনেক কথাই শুনিতে পাই।' তাহার ওইসব কথা শুনিয়া আমার খেয়াল হইল যে সকলকে প্রত্যহ অন্তত ১৫ মিনিট সময় নাম করিতে বলি। লোকে যেন আমাকে এই ১৫ মিনিট সময় ভিক্ষা দেয়। অবশ্য তখন

একথাও বলিয়াছিলাম যে যদি ১৫ মিনিট সময় নাম করিতে না পারে তবে অন্তত ১০ মিনিট সময় নাম কর। তখন অনেকেই এই দশ মিনিটের নাম নিয়াছিল। কাহারও কাহারও এমন অভ্যাসও হইয়াছিল যে ওই নামের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা ঘড়ি না দেখিয়াও বুঝিতে পারিত যে তাহাদের নামের সময় উপস্থিত হইয়াছে। পশুপতিবাবা একদিন আমাকে বলিয়াছিল, 'মা, এক দিন লোকের মধ্যে বসিয়া দেখিতেছি যে তাহাদের কথা যেন আমার কানে আসিতেছে না; মনটা অন্তর্মুখ হইয়া যাইতেছে, তখন ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখি যে আমার নাম করিবার সময় হইয়াছে।''

ভোলানাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মহামন্ত্র লাভ

একদিন মা কথায় কথায় বাবা ভোলানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা তুলিলেন। অবশ্য সেই ভ্রাতা আজ প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর হয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। মা বলিলেন, 'একদিন দেখিতেছি কী যে এক রাস্তা দিয়া যাইতেছি, সেই রাস্তার ধারে ভোলনাথের বড় ভাই যেন আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই শরীর তাহার কাছে উপস্থিত হইলে খেয়ালবশে এই শরীরের মুখ হইতে বাহির হইল—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

ভোলানাথের দাদা ওই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, 'তোমার কাছ হইতে এই মহাবাক্য লাভ করিবার জন্য আমি এতকাল যাবৎ এখানে অপেক্ষা করিতেছি।' ওই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে মা আরও বলিলেন যে তিনি খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মাকে খুব স্নেহ করিতেন।

১১ই কার্তিক মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। গোপীবাবু যে বিন্ধ্যাচলে যাইবেন তাহা পূর্বেই ঠিক ছিল। মা বিন্ধ্যাচল হইতে খবর পাঠাইলেন যে আমিও যেন গোপীবাবুর সহিত বিন্ধ্যাচলে চলিয়া আসি। তদনুসারে আমরা ১৪ই কার্তিক (ইং ৩০।১০।৫৮) মায়ের মোটর গাড়িতে বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলাম। সেইখানে আমরা চারদিন ছিলাম। প্রত্যহই দুপুর বেলা এবং রাত্রিতে আমরা মায়ের কাছে বসিতে পারিতাম। এই সময় বিশেষ কোনও

আলোচনা না হইলেও খেয়ালবশে মা কখনও কখনও তাঁহার সাধনার খেলার সময়কার নানা অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিতেন।

একদিন বেলা ১০ টার সময় ভাইজী প্রণীত 'মাতৃদর্শন' পুস্তক পাঠ হইতেছিল। উহার একস্থানে লেখা আছে যে একদিন ভাইজী মায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মা নিজ পরিচয়ে সচরাচর যাহা বলিয়া থাকেন তাহাই বলিলেন, অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে যাহা মনে কর আমি তাই।' কিন্তু এই উত্তরে ভাইজী সন্তুষ্ট না হইয়া যখন আরও কিছু জানিতে চাহিলেন তখন মা কেমন এক অলৌকিক ভাব মুখে আনিয়া বলিলেন, 'আর কী জানিতে চাও? বল, বল।' মায়ের ওই কথা শুনিয়া এবং মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাইজী ভীত হইয়া নীরব রহিলেন। এই প্রসঙ্গে মা বলিলেন, 'এই বর্ণনা হইতে তোমরা মনে করিও না যে ওই সময় চোখ লাল বর্ণ হইয়া মুখে ক্রোধের ভাব প্রকাশ হইয়াছিল। ক্রোধের কোনও লক্ষণই মুখে ছিল না। কখনও কখনও এই শরীরের মুখে চোখে এমন একটা প্রকাশ দেখা যায় যাহার জন্য যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ওই প্রকাশটা হয় সে ওই সময়ের জন্য নিজেকে ভুলিয়া যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন লোকের লক্ষ্যটা শুধু বিদ্যুতের দিকে পড়ে। ওই সময় আর কোনওদিকে লক্ষ্য থাকে না, পরে বজ্রপাত হইলে একটা শব্দ শুনিতে পায়। সেইরূপ অবস্থা বিশেষে এ শরীর কিছু বলিবার পূর্বে এ শরীরের দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু প্রকাশ হয় যাহার জন্য লোকে উহা লক্ষ্য করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং ওই সময়ের জন্য সে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সেই সময় তাহাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় তখন সে কিছুই গোপন করিতে পারে না। সাময়িক ভাবে স্বভাবের পরিবর্তন হয় বলিয়া তাহার ভিতরে যাহা যাহা আছে তাহা সরল ভাবে বাহির হইয়া আসে।

'বাজিতপুরের একটা ঘটনার কথা এখন খেয়ালে আসিতেছে। উহা শুনিলে তোমরা হাসিবে। বাজিতপুরে যখন এই শরীরে সাধনার খেলা চলিতেছিল তখন উহার মধ্যে তো সংসারের কাজও হইয়া যাইতেছিল। অবশ্য ওই সাংসারিক কাজগুলি যন্ত্রবৎ হইয়া যাইত। ওই কাজ যে এ শরীর দ্বারা হইতেছে বা কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হইতেছে এরূপ কোনও অভিমান থাকিত না। একবার একটি কুমড়ার চারা লাগানো হইল। ফলের আশায় যে এরূপ করা হইল তাহা নয়। উহাতে ফল হইবে কী হইবে না সে

দিকেও কোনও লক্ষ্য নাই। আবার দুই বেলাই উহাতে যন্ত্রের মতো জল দেওয়া হইতে লাগিল। যাহার ফলে গাছটি খুব সতেজ হইয়া উঠিয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিল। পরে উহাতে অসংখ্য কুমড়া ধরিল। আমাদের তো এত কুমড়ার প্রয়োজন ছিল না। তাই ওই গাছের পাতা, ডগা এবং কুমড়া পাড়া প্রতিবেশীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বিলাইয়া দেওয়া হইত। আমাদের এক প্রতিবেশিনী ছিল যাহাকে সকলের মতো কুমড়া, ডগা ইত্যাদি দেওয়া হইলেও সে মনে মনে সন্তুষ্ট ছিল না। বরং ওই গাছ এবং উহার অফুরন্ত ফলন দেখিয়া তাহার ঈর্ষাই হইয়াছিল। একদিন আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পূজা করিতেছি ওই অবসরে ওই প্রতিবেশিনী আসিয়া গাছ হইতে একটি কুমড়া চুরি করিয়া লইয়া গেল। পূজা শেষ করিয়া যখন বাহিরে আসিলাম তখন খেয়ালবশে ওই প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম এবং মজাও এমন যে ওই কুমড়াটি যেখানে রাখা হইয়াছিল উহার উপরেই এই শরীরের দৃষ্টি পড়িল। এ শরীরের মুখের দিকে তাকাইয়াই সে বুঝিতে পারিল যে আমি তাহার চুরি ধরিয়া ফেলিয়াছি। ওই কুমড়া সম্বন্ধে সে কী যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আমি তাহাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া একটু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। (সকলের হাস্য)

'একবার কুসুম (ব্রহ্মচারী) খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এখানে তাহার ঘরখানা ঝাড় দিয়াছে, কেননা সে মনে করে যে এই শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা পছন্দ করে। কিন্তু ঘর ঝাড় দিয়া ধূলা আবর্জনাগুলি বাহিরে না ফেলিয়া সে ওইগুলি সিঁড়ির নীচে ঢুকাইয়া রাখিয়াছে যেন সহজে চোখে না পড়ে। এই শরীর তাহার ঘরে গিয়া ওইখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করিতে করিতে সেই সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইল যেখানে আবর্জনাগুলি লুকানো ছিল এবং উহা দেখিয়াই বলিল, 'তুই এখানে এগুলি কী জমা করিয়া রাখিয়াছিস্?' কুসুম আমার কথা শুনিয়া খুবই লজ্জা পাইল।'

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বাবা ভোলানাথের দুশ্চিন্তা

"ভোলানাথ এ শরীরকে ভয় করিত। সেইজন্য সাধনার খেলার সময় এ শরীর যাহা কিছু করিত তাহাতে সে বাধা দিত না। অবশ্য মাঝে মাঝে এই শরীরের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া সে আপত্তি জানাইত। সেই সময় আমি তাহাকে

বলিতাম, 'বেশ, তুমি যদি আপত্তি কর তবে আমি যাহা করিতেছি তাহা আর করিব না, তবে ইহার ফলে এ শরীরের কী হইবে তাহা কিন্তু বলিতে পারিতেছি না।' এই কথা শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি বলিত, 'না, না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর আমি বাধা দিয়া অপরাধ করিয়াছি।' সে নিজ চক্ষে এ শরীরে সাধনার নানা অবস্থা দেখিয়াছে। ওই সব দেখিয়াই তাহার মনে একটা ভয় হইয়াছিল যে, পাছে আমি অদৃশ্য হইয়া যাই। কারণ সে আমাকে দুই হাতের মাত্র দুইটি আঙুলের উপর শরীরের সমস্ত ভার রাখিয়া দোল খাইতে দেখিয়াছে। সে মনে করিত এইভাবে যে মাটি নাম মাত্র স্পর্শ করিয়া শূন্যে থাকিতে পারে, তাহার পক্ষে ঊর্ধ্বে চলিয়া যাওয়া আর অসম্ভব কী? তাহা ছাড়া এ শরীর দ্বারা যেভাবে আরতি হইয়াছে তাহাও সে দেখিয়াছে। তোমরা সাধারণত পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক লইয়া আরতি কর; কিন্তু এ শরীর যখন আরতি করিত তখন এক বিচিত্র ব্যাপার হইত। যে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা এ শরীর গঠিত তাহাই তরঙ্গ রূপে এই শরীরে দেখা দিত। যাহার ফলে এই শরীর কখনও দক্ষিণে, কখনও বা বামে দুই বলের মতো একবারে উপরে উঠিয়া যাইত, আবার নামিয়া আসিত। কতভাবে যে এ শরীর মাটিতে পড়িয়া চাকার মতো ঘুরিয়াছে তাহা না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। এইভাবে উলট পালট খাইয়া এ শরীর কিছুক্ষণ শান্তভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকিত। শেষে শঙ্খধ্বনি করিয়া আরতি শেষ করা হইত; অর্থাৎ যে নাদ হইতে সৃষ্টির প্রকাশ সেই নাদেই সব কিছু মিলাইয়া দেওয়া হইত। আরতির সময় এ শরীরকে শূন্যে উঠিয়া যাইতে ভোলানাথ দেখিয়াছে। কাজেই এ শরীরের পক্ষে শূন্যে অদৃশ্য হইয়া যাওয়া যে বিশেষ একটা কিছু নয় তাহা সে বিশ্বাস করিত। সেইজন্য তাহার দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। কর্মস্থলে তাহাকে যাইতেই হইত, কিন্তু সর্বদা সে এই দুর্ভাবনা লইয়া যাইত যে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইবে কিনা।'

বিন্ধ্যাচলে চারদিন থাকিয়া ১৮ই কার্তিক গোপীবাবু এবং আমি কাশী ফিরিয়া আসিলাম। মা আসিলেন ২১শে কার্তিক। ২৪শে কার্তিক আশ্রমে কালী পূজা হইল। ২৬শে কার্তিক অন্নকূট। ওই দিন বেলা দশটার মধ্যে অন্নকূটের ভোগ শেষ করাইয়া দিয়া মা সদলবলে কানপুর রওনা হইয়া গেলেন। এইবার সংযম

সপ্তাহ কানপুরে হইল। কানপুর হইতে মা দিল্লি গেলেন। সেইখানে ২।১ দিন থাকিয়া দেরাদুন হইয়া আনন্দকাশী গেলেন। ওইখানে ১৫।২০ দিন ছিলেন। পরে ১৯শে ডিসেম্বর দেরাদুনে ফিরিয়া আসিয়া মা দিল্লি চলিয়া গেলেন। দিল্লিতে কিছুদিন ছিলেন। সেইখান হইতে মাকে ঝালোয়ারে লইয়া যাওয়া হইল। মায়ের ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমান আনন্দের আগ্রহেই মা ঝালোয়ার যান। ওইখানে কিছুদিন থাকিয়া মা দিল্লি হইয়া এলাহাবাদে আসেন। এলাহাবাদে একরাত্রি থাকিয়া ৬ই মাঘ মঙ্গলবার (ইং ২০।১।৫৯) বেলা ৩।। টার সময় মা মোটর যোগে কাশী আসিয়াছেন।

ঝালাওয়ারে শ্রীশ্রীমা

৭ই মাঘ, বুধবার (ইং ২১। ১। ৫৯)

সকালে মা যখন ঁঅন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন তখন কথায় কথায় বলিলেন, 'এবার আনন্দকাশীতে ২২ দিন ছিলাম। ওইখানে থাকার সময় কথা বলিবার বা চলাফেরা করিবার ভাব একেবারেই কমিয়া যায়। পরমানন্দকে শরীরের ওই অবস্থার কথা বলিয়া বলিলাম যে বম্বে প্রভৃতি যে যে স্থানে এই শরীরের যাওয়ার কথা আছে, উহা বাতিল করিয়া দাও। আনন্দকাশীতে খুব শীত দেখিয়া পরমানন্দ মনে করিল যে ম্যাকে অন্তত হরিদ্বারে লইয়া যাওয়া যাক, পরে যাহা হয় দেখা যাইবে। এই ভাবিয়া সে মোটরে দিনের বেলায়ই আম্যাকে হরিদ্বারে লইয়া আসিল। যোগীভাই যখন হরিদ্বার হইতে দিল্লি গেল সেও আমাকে দিনে দিনেই দিল্লি লইয়া গেল, কারণ রাত্রিবেলা খুব ঠাণ্ডা। দিল্লি আসিয়া বম্বে এবং আমেদাবাদ যাওয়ার প্রস্তাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু আনন্দ এ শরীরকে ঝালাওয়ার লইয়া যাইতে অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিল। তাই দিল্লিতে ১০। ১১ দিন থাকিয়া ঝালাওয়ার যাওয়া হইল। ওইখানেও ১০।১২ দিন ছিলাম। ওইখানে শীত নাই বলিলেই চলে। আবহাওয়া বসন্ত কালের মতো। ঝালাওয়ারে চন্দ্রভাগা নদী আছে। উহার পারে কতগুলি দেবমন্দির। শোনা যায় যে ঝালাওয়ারের রাজার একবার অসুখ করিয়াছিল, সে নাকি চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিয়া আরোগ্য লাভ করে। ওই সব মন্দিরে গণেশ, শিব, ভগবতী প্রভৃতির মূর্তি স্থাপিত ছিল। মূর্তিগুলি

খুবই সুন্দর এবং বড় বড়। মহম্মদ ঘোরী নাকি ওইসব মূর্তি ভাঙিয়া ফেলে। এখনও ওইসব মূর্তি যাহা আছে তাহা দেখিতে খুব সুন্দর। এগুলিও খুব প্রাচীন। বিন্ধ্যাচলের মন্দিরগুলি যে সময়কার ছিল ঝালাওয়ারের মন্দিরগুলিও সেই সময়কার হইবে।'

দুইটি সুইস যুবতী মা-র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহারা মা-র ফটো তুলিয়া নিলেন।

শ্রীশ্রীমা-র নিকট ভক্ত মাধব

সন্ধ্যাবেলা একটি ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমা-র সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহার কথাই গতকল্য গোপীবাবু মাকে বলিতেছিলেন। শুনিলাম ভদ্রলোকটির নাম শ্রীযুক্ত রোহিত চন্দ্র মজুমদার। বর্তমানে ইনি 'ভক্তমাধব' নামে পরিচিত। এই নাম তিনি তাঁহার ধ্যানলব্ধ গোপাল বিগ্রহের নিকট হইতে পাইয়াছেন। ভদ্রলোকটি তাঁহার সাধনার অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাকে যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

একদিন তিনি ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহার নিকট কালীমূর্তির প্রকাশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বালগোপালের মূর্তিও দেখা গেল। ওই গোপালকে দেখাইয়া মা কালী ভদ্রলোককে বলিলেন, 'এই গোপাল হইতেই তুমি সমস্ত শক্তি লাভ করিবে। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে একদিন সাধন করিতে বসিয়া একটি বাণী লাভ করিলেন যাহাতে তাঁহাকে উত্তরপাড়া (কলিকাতা) গিয়া শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলা হইল এবং এইরূপ আশ্বাসও দেওয়া হইল যে ওইখানে গেলে তিনি গোপালের বাণী শুনিতে পাইবেন।

ইহার পর তিনি একদিন বিকালবেলা উত্তরপাড়া গেলেন এবং শ্রীযুক্তা ননীবালার বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। সেই সময় শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবী বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তাঁহার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া বাড়ি ফিরিবার উদ্দেশ্যে রাস্তায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে ননীবালা দেবীর বাড়ি যখন দেখা হইয়া গেল তখন অন্য একদিন আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই চলিবে। এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে

যেন তাঁহাকে বলিতেছে, 'তুমি চলিয়া যাইও না। ননীবালা এখনই আসিবে।' ভদ্রলোক চারিদিকে তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অথচ কথাগুলি আসিল যেন একটি বালকের মধুর কণ্ঠ হইতে। ইহাতে তিনি যেমন আশ্চর্যান্বিত হইলেন তেমন পুলকিত হইলেন। যাহা হউক ভদ্রলোকটি রাস্তার জলের কলের ধারে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় ননীবালা দেবীর বাড়ি আসিলেন। ভদ্রলোকটি তাঁহাকে তাঁহার আগমনের কারণ বলিলে ননীবালা দেবী তাঁহাকে ঘরের মধ্যে একটি আসন দেখাইয়া বলিলেন যে উহাই গোপালের আসন। ভদ্রলোকটি ঘরের ভিতর গিয়া একটি আসন দেখিতে পাইলেন, কিন্তু উহার উপর কোনও বিগ্রহ ছিল না। ননীবালা দেবীও বলিলেন যে তিনি কোনও বিগ্রহ স্থাপন করেন নাই। শুধু গোপালের আসনই রাখিয়াছেন। ভদ্রলোক গোপালের জন্য কিছু ফল এবং মিষ্টি আনিয়াছিলেন। তিনি উহা আসনের কাছে রাখিয়া দিলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে, 'ওইগুলি (অর্থাৎ ফল এবং মিষ্টিগুলি) কৌটাতে রাখ।' এই কণ্ঠস্বরও পূর্বের মতো অতি মধুর। ইহা শুনিয়া তিনি ননীবালা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কিছু শুনিতে পাইয়াছেন কিনা। ননীবালা দেবী বলিলেন, 'হাঁ, গোপাল ভোগের জিনিসগুলি এক কৌটাতে তুলিয়া রাখিতে বলিল, যে কৌটাতে সচরাচর তাহার ভোগের জিনিস রাখা হয়।' ভদ্রলোক দেখিলেন যে তিনি যাহা শুনিয়াছেন উহা তাঁহার মনের কল্পনা নয়, কারণ উহা অপরেও শুনিতে পাইয়াছে এবং পূর্বে যে শুনিয়াছিলেন যে উত্তরপাড়া গেলে তিনি গোপালের বাণী পাইবেন তাহাও সত্য হইয়া গেল।

ইহার পর আরও কয়েকবার তিনি ননীবালা দেবীর বাড়িতে গিয়াছেন এবং গোপালের আদেশও পাইয়াছেন। ননীবালা দেবীর মৃত্যুর পরও তিনি গোপালের নানা আদেশ পাইয়া আসিতেছেন। এই সকল আদেশ গোপালের নির্দেশমতো তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। ওই সকল বাণী যে তাঁহার কল্পিত নয় তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন, কারণ ওইভাবে গুছাইয়া কিছু বলা তাঁহার সাধ্যাতীত। তাহা ছাড়া ওই সকল বাণীর মধ্যে এমন সব শব্দ থাকে যাহার অর্থ তিনি নিজেও জানেন না, পরে অভিধানে শব্দার্থ দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে কথাগুলি ঠিকই বলা হইয়াছে।

বাণী ছাড়াও তিনি গোপালের নিকট হইতে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধের বিবরণও পাইয়াছেন এবং কোন কোন গাছ গাছড়া দিয়া উহা কীভাবে তৈয়ার করিতে হয় তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। গোপাল এখন তাঁহাকে এই সকল প্রচার করিতে বলিয়াছেন। গোপাল নাকি বলিতেছেন যে ভদ্রলোকটি তাহার হাতের যন্ত্রমাত্র। তাঁহার ভিতর দিয়াই গোপাল জগতের মঙ্গল সাধন করিবেন। এই সকল কথা বলিয়া ভদ্রলোকটি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার এই প্রচার কার্যে যাহাতে আপনার সহানুভূতি, সাহায্য এবং উপদেশ পাই সেই জন্য আমার আপনার কাছে আসা। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত সে সম্বন্ধে আপনি দয়া করিয়া আমাকে উপদেশ দিন।' ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, 'বাবা, একটা কথা মনে রাখিও যে যাহা সত্য, যাহা প্রকাশ হইবার তাহা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। প্রকাশ হওয়া কী? যাহা নিত্য আছে তাহারই তো প্রকাশ? তিনিই একমাত্র সত্য এবং নিত্য, যাহা কিছু প্রকাশ তাঁহারই প্রকাশ। সাধনার উদ্দেশ্য হইল ইষ্ট বা ভগবানকে লাভ করা। ইষ্ট বা ভগবানকে লাভ করা আর নিজকে জানা একই কথা। নিজকে বা ভগবানকে জানিতে হইলে এক লক্ষ্যে পড়িয়া থাকাই হইল একমাত্র কর্তব্য। ইষ্ট যে যে রূপে তোমার কাছে উপস্থিত হন তাহা শুধু দেখিয়া যাওয়া, কিন্তু লক্ষ্য এবং চেষ্টা থাকিবে তাঁহাকে লাভ করার দিকে। সর্বরূপে, সর্বভাবে যে একমাত্র তিনিই খেলা করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করা।'

ভদ্রলোক। তিনি যখন কোনও কর্মের আদেশ দেন তখন কী করা?

মা। যদি কোনও কর্মের আদেশ আসে তবে যে কাজটুকু করিতে বলা হয় সেইটুকু যন্ত্রবৎ করিয়া যাওয়া। উহার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করা। তোমা দ্বারা যে ওই কাজ করা হইতেছে এরূপ অভিমান না রাখা। তাঁহার নিকট হইতে যদি কোনও আদেশ আসে তবে উহা সফল হইতে বাধ্য। যদি দেখা যায় যে উহা বিফল হইয়া গেল তখন মনে করিতে হইবে যে উহা ভগবানের আদেশ নয়। উহা মনেরই ব্যাপার। মনের রাজ্যে থাকিয়া অর্থাৎ মানামানির মধ্যে থাকিয়া মনের ভিতর কী আছে এবং কী নাই তাহা জানিবার উপায় নাই।

প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক ভাবই মনের মধ্যে লুকানো থাকে। ওইগুলিই অনেক সময় সাধন পথে নূতন নূতন কর্মজাল সৃষ্টি করিয়া সাধকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। সাধকের লক্ষ্য যদি একমাত্র ইষ্টের প্রতি দৃঢ় থাকে তবে তাহার অহংএর ক্রিয়া অর্থাৎ অহঙ্কার অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। আর ওই লক্ষ্য যদি তেমন দৃঢ় না হয় তবে এই অহংই প্রবল হইয়া লোককে কর্মচক্রে ঘুরাইতে থাকে। সেইজন্য চিন্তা করিতে হয় কি তিনি যাহা করিবার তাহা তো তিনিই করিবেন, আমার কর্তব্য হইল শুধু তাঁহাকে চিন্তা করা, তাঁহাকে লইয়া থাকা।' এইভাবে মা কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। কথাগুলি এমনই সুন্দরভাবে বলিলেন যাহা উপস্থিত সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করিল। ভক্ত মাধব মায়ের উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'মা, আপনার কথাগুলি বড় মধুর লাগিতেছে। আগামীকালও কি আপনার কাছে আসিতে পারিব?' মা হাসিয়া সম্মতি জানাইলেন। ভদ্রলোকটি বিদায় হইয়া গেলেন। আমরাও মৌনের কিছুক্ষণ পর বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৯ই মাঘ, শুক্রবার (ইং ২৩। ১। ৫৯)

দুপুরবেলা মা রাজগীর রওনা হইয়া গেলেন। সেইখানে ৮। ১০ দিন থাকিয়া মা কলিকাতা যান। মায়ের উপস্থিতিতে এবার আগরপাড়া আশ্রমে সরস্বতী পূজা হয়। এক ভক্তের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মা রাসবিহারী এ্যাভিন্যুতে গিয়া ৫।৭ দিন কাটাইয়া আজ ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার (ই২৫। ২। ৫৯) বেলা ১০ টার সময় কাশী আসিয়া পৌঁছাইলেন।

নীতীশ গুহর অপূর্ব দেহরক্ষার কথা

বিকালবেলা মা যখন অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন তখন নীতীশের মৃত্যুর কথা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'এবার নীতীশ যখন রাজগীরে যায় তখন তাহার চেহারা ভালই দেখিয়াছিলাম। সে রিকসা করিয়া ৩।৪ দিন এই শরীরের সহিত দেখা করিতে আশ্রমে আসিয়াছিল। রাজগীরে তখন বৃষ্টি বাদল চলিতেছিল। তাই তাহারা যখন কলিকাতা যাইবে বলিয়া স্থির করিল তখন তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে তাহারা যেন বরাবর কলিকাতা চলিয়া যায়। কিন্তু উহারা বলিল যে উহাদের গয়া হইয়া যাওয়ার সব বন্দোবস্ত

পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। এই শরীর তো অনেক সময় জোর দিয়া কথা বলে না। তাই তাহাদিগকে বলিলাম যে তাহারা যাহা ভাল মনে করে তাহাই যেন করে। যাহা হইবার তাহা তো হইবেই। উহারা গয়ায় গেল। সেখানে ঠাণ্ডা লাগিয়া নীতীশের শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়িল। এত খারাপ যে তাহাকে স্ট্রেচারে করিয়া গাড়িতে তুলিতে হইয়াছিল।

'কলিকাতায় যখন রাসবিহারী এ্যাভিন্যুতে ছিলাম তখন একদিন নীতীশকে দেখিতে যাইবার কথা হইল। উহারা বলিল যে এক রবিবার হইলে উহাদের সুবিধা হয়। কারণ রবিবার ছুটির দিন বলিয়া সকলে মিলিয়া নীতীশকে দোতলা হইতে একতলায় নামানো সুবিধা হইবে। কিন্তু আমি রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহিলাম না। তখন স্থির হইল যে শুক্রবার দিনই যাওয়া হইবে। সেই অনুসারে নীতীশকে উপর হইতে নীচে নামানো হইল। এই শরীর যখন ওইখানে গিয়া উপস্থিত হইল তখন নীতীশ এই শরীরকে দেখিয়া প্রথমে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল, পরে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ' 'শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপ বলিতে লাগিল। আবার বলিতে লাগিল 'শরণাগতোহহং' 'শরণাগতোহহং'। এই শরীরও সচরাচর যাহা করিয়া থাকে সেইভাবে তাহার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। নীতীশের ভাবের যতটুকু প্রকাশ ছিল উহা খাঁটিই ছিল যেদিন নামযজ্ঞ হইল সেদিন সে প্রসাদ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, বলিল যে সে ওই প্রসাদ খাইলেই ভাল হইয়া যাইবে। তাহাকে প্রসাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সে ওই প্রসাদ খাইয়াও ছিল। ওইদিন রাত্রি ১০ টায় তাহার শেষ সময় উপস্থিত হইলে যখন মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া কাঁদিতেছিল তখন সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আমাকে ধরিও না, আমার যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' ইহার পরই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া সে দেহত্যাগ করিল। যেভাবে তাহার দেহত্যাগ হইল সাধুদের মধ্যেও অল্প লোকই ওইভাবে দেহত্যাগ করিয়া থাকে।'

১৫ই ফাল্গুন শুক্রবার (ইং ২৭। ২। ৫৯)।

বেলা ১০ টার সময় মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। কন্যাপীঠের মেয়েরা আজ মাকে ভোগ দিবে। এই উপলক্ষ করিয়া মা গোপীবাবু,

জ্যোতির্ময়বাবু প্রভৃতিকে আজ আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আজ সকালবেলায়ই গোপীবাবু আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় মা স্বামী শঙ্করানন্দজীর কথা উঠাইয়া বলিলেন, 'সাধনার সময় এই শরীরের মুখ হইতে যখন মন্ত্রাদি বাহির হইত সেই সময়কার কথা তুলিয়া বাবা (অর্থাৎ স্বামী শঙ্করানন্দ) এই শরীরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কেমন করিয়া ওই সকল মন্ত্র বাহির হইত। কেমন করিয়া মন্ত্র বাহির হইত তাহা কি প্রকাশ করা যায়? উহা শুনিয়া গোপীবাবু বলিলেন, 'হাঁ, নিজের অনুভূতি না থাকিলে উহা প্রকাশ করিলেও বুঝা যায় না।' মা উহা স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে লোকের বমি হয় কেমন করিয়া? উহার উত্তরে হয়তো বলা যায় যে পেট মোচড়াইয়া বমি হইয়া যায়; কিন্তু ইহাতে বমি হওয়ার সমস্ত লক্ষণ এবং অবস্থাগুলি প্রকাশ হইল না। রোগ হইলে লোকদিগকে 'আঃ' 'উঃ' করিতে দেখা যায়। ওই 'আঃ-উঃ' শব্দমাত্র, উহা হইতে ব্যথা বেদনার স্বরূপ বুঝা যায় না। দেহের মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কমলের কথা বলা হয় না? কমলের দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এগুলি কিন্তু একটা ধারায় নিবদ্ধ আছে। আবার ইহার মধ্যে অক্ষর আছে। অক্ষর কী? না, যাহা ক্ষয় হয় না, যাহা বদলায় না। এই যে কমল এবং অক্ষরগুলির কথা বলা হইল যাহা পর পর সাজানো আছে, ইহাও কিন্তু ক্ষর; কারণ এগুলিও বদলাইয়া যায়। আবার নিত্য অক্ষরও আছে। ধর, যেমন বিগ্রহ—তোমরা মাটি বা পাথর দিয়া বিগ্রহ তৈয়ার করিলে, ওই বিগ্রহকে ক্ষর বলা যায়; কারণ সময়ে ইহা পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আবার নিত্য বিগ্রহও তো আছে। মাটির বা পাথরের বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ওই নিত্য বিগ্রহের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সেইরূপ সাধন অবস্থায় মন্ত্র ইত্যাদি যাহা লাভ হয় অথবা সমাধি ইত্যাদি যাহা লাভ হয় তাহা চিরস্থায়ী হয় না। যাহা চিরস্থায়ী, যাহা নিত্য বা স্বভাব তাহাতে স্থির হইবার জন্যই তো সাধনা। সাধনার সময় একটার পর একটা অবস্থা লাভ হইয়া যায় এবং প্রত্যেক স্থিতি অনুযায়ী ভাব এবং চেহারার পরিবর্তন হইয়া যাইতে থাকে। তাই বলিতেছি যে সাধকের গতি, স্থিতি এবং ভাব যেমন যেমন হইলে যাহা প্রকাশ হইবার তাহাই প্রকাশ হইয়া

পড়ে। এইভাবে মন্ত্রগুলিও প্রকাশ হয়। এইভাবে চলিতে চলিতে যখন নিত্য বা পরমস্থিতি লাভ করা যায় তখন আর লাভালাভ বলিয়া কিছু থাকে না। তখনই লোক স্বভাবে স্থিত হয়। সাধনার খেলার সময় যাহারা এ শরীরের নানা অবস্থা দেখিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ কথাও বলিয়াছে, 'মায়ের কি এখন পতন হইয়াছে? কারণ সেই সময় মায়ের যে সব দিব্যভাব এবং ঢুলু ঢুলু চেহারা দেখিয়াছি সে সকল তো এখন কিছু দেখা যায় না।' (সকলের হাস্য)

এইভাবে মা অনেক কথা বলিলেন।

১৬ই ফাল্গুন, শনিবার (ইং ২৮। ২। ৫৯)

আজ দুন এক্সপ্রেসে মা দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন।

শিবরাত্রির সময় কিষণপুর আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে কয়েকটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শিবরাত্রির পর মা হৃষীকেশে চলিয়া যান। সেইখানে রামনগরের 'আত্মবিজ্ঞান ভবনে' সংযম সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। ইহার পর মা পুনরায় দেরাদুনে আসেন। দেরাদুনেই এইবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং গুরুপূর্ণিমা উৎসব হইয়াছে। ঝুলনের সময় মা বৃন্দাবনে ছিলেন। পরে দিল্লি হইয়া ৮ই ভাদ্র বিন্ধ্যাচলে আসেন। ৯ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন দুপুরবেলা এখানে (কাশীতে) আসিয়া আবার ১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৯। ৫৯) বেলা ১১।। টার সময় মা বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী আসিলেন। পরদিন খুকুনীদিদিও দিল্লি হইতে কাশী আসিলেন।

শ্রদ্ধেয় কালীপদ গুহরায়

১৯শে ভাদ্র, শনিবার (ইং ৫। ৯। ৫৯)

গতকাল সন্ধ্যার পর মায়ের নিকট আমার ডাক পড়িয়াছিল। মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের পিছনে তেতলার ঘরে ছিলেন। গোপীবাবু এবং অনিল গাঙ্গুলি মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় শ্রীযুক্ত কালীপদ গুহরায় মহাশয়ের কথা উঠিল। গোপীবাবু এবং অনিলবাবু ইঁহাকে চেনেন। আমিও একদিন গিয়া ইঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি। শুনিতে পাইয়াছিলাম যে ভদ্রলোকটির সহিত সূক্ষ্মদেহধারী কয়েকজন মহাপুরুষের যোগাযোগ আছে। গোপীবাবু

বলিলেন, 'কালীবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার সাধন ভজন, যোগাভ্যাস প্রভৃতি কিছুই নাই। তবে ছোটবেলা হইতেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার একটা অনুসন্ধিৎসা আছে এবং মানুষকে তিনি মানুষ বলিয়াই ভালবাসিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যাহা কিছু লাভ হইয়াছে তাহা কয়েকজন মহাপুরুষের কৃপাতেই হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে রামঠাকুর এবং শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের গুরু প্রভৃতি আছেন।' কালীবাবুর অলৌকিক শক্তির বিষয় বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। তবে গোপীবাবু বলিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ কবে দেহত্যাগ করিবেন তাহা নাকি কালীবাবু ঠিক ঠিক বলিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি ভক্ত কালীবাবুর অনুরাগী হইয়াছেন। যখন আমাদের মধ্যে কালীবাবুর কথা হইতেছিল সেই সময় তাঁহার একজন বিশিষ্ট ভক্ত মায়ের নিকট আসিয়া বলিলেন যে শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি লইয়া যাইবার জন্য কালীবাবু তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি উহা না লইয়া যাইবেন ততক্ষণ কালীবাবু উহার আশায় বসিয়া থাকিবেন। মা কালীবাবুর ভক্তটিকে একটি মালা দিলেন এবং কালীবাবুর জন্য আর একটি মালা ও দুইটি ফল দিলেন। শুনিলাম কালীবাবু একদিন আসিয়া একান্তে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

বৃন্দাবন আশ্রমে ঝুলন পূর্ণিমা উৎসব প্রসঙ্গ

বোম্বাইয়ের এক ভদ্রলোক আজ হইতে আশ্রমে পুটিত চন্ডীপাঠ আরম্ভ করাইয়া দিয়াছেন। সকালের দিকে মা আর অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিলেন না। মা নিজের ঘরেই ছিলেন এবং ওইখানে আমাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলাম মায়ের ছোট ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ। খুকুনীদিদি, অনিল গাঙ্গুলি মহাশয় প্রভৃতি ওইখানে ছিলেন। নানা কথাই হইতেছিল। মা যে গোপীবাবুকে এইবার বিন্ধ্যাচলে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিন্ধ্যবাসিনী, কালী খো এবং অষ্টভুজা মন্দির দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, সেই সব কথা বলিলেন। বৃন্দাবনে ঝুলন পূর্ণিমার কথাও হইল। ওই উপলক্ষে আশ্রমে যে ২৫০০ সাধুর ভাণ্ডারা এবং মহারাস হইয়াছিল তাহাও বলিলেন। শেঠ গুজরমল মোদি সাধুদের ভাণ্ডারা দেন। মা বলিলেন, 'আড়াই হাজার সাধুর একত্র বসিয়া খাওয়া যেমন একটা বিরাট ব্যাপার, উহা দেখিতেও তেমন

সুন্দর হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পরমানন্দ সারারাত্রি বসিয়া তরকারি কাটিয়াছিল। যখন সাধুদের ভোজনে বসাইয়া দেওয়া হইল তখন ওইখানকার হলঘর ইত্যাদিতে সকল সাধুর বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া গেল না। অনেককে উন্মুক্ত জায়গায় বসিতে হইয়াছিল। ভাণ্ডারার আগের দিন যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দেখিয়া তো সকলের চক্ষু স্থির। সারারাতও অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সকালবেলা হইতে আর বৃষ্টি হয় নাই। আবার মজাও এমন যে সাধুরা যখন উন্মুক্ত স্থানে ভোজন করিতে বসিলেন তখন একখণ্ড মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া রাখিল যাহার জন্য খালি জায়গায় বসিয়া ভোজন করিতে কাহারও কোনও অসুবিধা হইল না। যখন সাধুরা বেলা ১ টার মধ্যে ভোজন শেষ করিয়া রওনা হইলেন তখন আবার আকাশে সূর্য দেখা দিল।

অনিলবাবু। মা, মেঘটি কি গোবর্দ্ধন পর্বত ছিল? (সকলের হাস্য)

মায়ের সহিত শ্রীযুক্ত নেহরুজীর সাক্ষাৎকার

এইবার দিল্লিতে জওহরলাল নেহরুজীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে মা বলিলেন, 'এবার হৃষীকেশে জওহরলালবাবার সহিত সাক্ষাৎ হয়। গণেশ গোস্বামী ওইখানে এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহার দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য জওহরলালবাবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। হরিবাবা এবং এই শরীরকেও ওইখানে লইয়া গিয়াছিল। এই উপলক্ষে উহারা এক প্রকান্ড বেদি তৈয়ার করিয়াছিল। বেদির উপর একদিকে হরিবাবা, একদিকে এই শরীর এবং মাঝখানে জওহরলালবাবার বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এসব ব্যাপারে তোমাদের তো অনেক বক্তৃতাও হয়। ওই সকল বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে জওহরলালবাবার সহিত কিছু কিছু কথাবার্তাও হইয়াছিল। তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাবা, তুমি কি এই শরীরের কাছে আসার বন্দোবস্ত করিতে পার না?' উত্তরে সে জোর দিয়া বলিল, 'কেন পারিব না? আপনি দিল্লিতে গেলে সে বন্দোবস্ত করা যাইবে।' বাবা তাহার বাড়িতে এই শরীরকে লইয়া যাইবার কথা মনে করিয়াছিল। এই শরীর যখন তাহাকে বলিল, 'বাবা, তুমি কি আশ্রমে আসিতে পার না?' তখন আশ্রম কোথায় তাহা সে জানিয়া নিল। তাই এবার দিল্লি হইতে এদিকে রওনা হইয়া আসিবার দিন তাহার সহিত

দেখা হইয়াছে। সে যখন মুসৌরীতে দলাইলামার সহিত দেখা করিতে যায় তখন দেরাদুন আশ্রমে খবর দিয়াছিল যে ফিরিবার পথে সে এই শরীরের সহিত দেখা করিবে। কিন্তু দলাইলামার সহিত কথা বলিতে বলিতে প্রায় তিন ঘন্টা দেরি হইয়া যায় বলিয়া সে আর দেখা করিতে পারে নাই। ইহাদের লোকের সঙ্গে দেখা করাও এক বিরাট ব্যাপার। যেদিন জওহরলাল বাবার দিল্লি আশ্রমে আসিয়া দেখা করার কথা হয় তাহার আগের দিন পুলিশ প্রভৃতি আসিয়া আশ্রমটি ছাইয়া ফেলিল। বাবা আসিলে আমি তাহাকে একটি তুলসীর মালা এবং একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিয়াছিলাম। বাবা তাহা গলায় পরিয়াছিল এবং যাইবার সময় উহা হাতে জড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহাকে কিছু জল-খাবারও দেওয়া হইয়াছিল। কথাবার্তাও কিছু কিছু হইয়াছিল। সময় তো বেশি ছিল না। শেষে আমিই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম যে গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়াছে।'

একটি উৎসাহী ফটোগ্রাফার কেমন করিয়া যেন পুলিশ-ব্যূহ ভেদ করিয়া ওই সময় আশ্রমে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সে মায়ের সহিত জওহরলালজীর কয়েকখানা ফটো তুলিয়াছিল। ফটোগুলি দেখিতে বেশ সুন্দরই হইয়াছে।

২১শে ভাদ্র, সোমবার (ইং ৭।৯।৫৯)

আজ কয়েকদিন যাবৎ সন্ধ্যার পর মায়ের ঘরে আমাদের বসা হইতেছে। গোপীবাবুও ওই সময় উপস্থিত থাকেন। নানা বিষয় সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়। মা অধিকাংশ সময় শ্রোতা হিসাবেই থাকেন। কখনও কখনও নিজে একটি প্রশ্ন করিয়া সদালোচনা আরম্ভ করাইয়া দেন। একদিন মা গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, বাবা, এক গুরুর যদি তিনটি শিষ্য থাকে তবে সাধন পথে তাহাদের অনুভূতি কিন্তু ঠিক একরূপ হয় না। গুরুর নিকট হইতে তাহারা এক শক্তিই পায় কিন্তু তাহাদের অনুভূতিগুলি আলাদা আলাদা হইতে থাকে। এরূপ হয় কেন? তোমাদের শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কী বলে?'

গোপীবাবু। ইহা তো সর্বদাই হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্যের শিষ্যদের মধ্যেও দেখা যায় যে সুরেশ্বরাচার্যের সিদ্ধান্ত, পদ্মনাভের সিদ্ধান্ত হইতে আলাদা। গোরক্ষনাথ এবং গম্ভীরনাথ এক সম্প্রদায়ের হইলেও ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তিগত সংস্কার হইতেই এইরূপ হয়।

মা। হাঁ, এ কথা ঠিক যে একগুরু দ্বারা দীক্ষিত হইলেও শিষ্যদের মধ্যে সংস্কার অনুসারে আলাদা আলাদা ধারা সৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ ধারার মধ্যে গুরুর ধারাও পাওয়া দরকার, তাই নয় কি?

গোপীবাবু। গুরুর নিজেরও তো একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। তবে যদি গুরু বলিলে পরমগুরু বলা হয়, বাস্তবিক পক্ষে গুরু তো একই। তবে অবশ্য শিষ্যদের বিশিষ্ট ধারার মধ্যে সেই একেরও প্রকাশ হইতে পারে।

মা। এ শরীরও তো তাহাই বলিতেছে। বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলি সংস্কার অনুসারে হয় এবং এগুলি অনন্ত। কিন্তু অখণ্ড জ্ঞানের মধ্যে একও যেমন আছে আবার অনন্তও সেইভাবে আছে। খণ্ড, অখণ্ড নিয়াই তো পূর্ণ। কাহারও অনুভূতিতে 'না' রূপে প্রকাশ হইল আবার অন্য একজনের অনুভূতিতে উহা 'হাঁ' রূপে প্রকাশ হইল। যদিও 'হাঁ' এবং 'না' ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে খণ্ড সত্য; কিন্তু এমন স্থিতিও আছে যেখানে কাহারও কাছে এ দুই-ই সত্য অর্থাৎ যে 'হাঁ' ও 'না'র অতীত গিয়াছে তাহার কাছে 'হাঁ'ও যেমন সত্য 'না'ও তেমনি সত্য। আবার 'হাঁ' 'না'র কোনও প্রশ্ন নাই—যা' তা।

অন্য একদিন কমলদা (ভট্টাচার্য) শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখেই গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাপুরুষেরা কাহারও কাহারও নিকট প্রকট হইয়া নানা উপদেশ এবং আদেশ দিয়া থাকেন। Spiritরাও ওইরূপ করিয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

গোপীবাবু। Spirit বলিতে আপনি কী বুঝেন? একভাবে দেখিলে সবই তো Spirit এমনকী ভগবানকেও Spirit বলা যায়। তবে Spirit বলিতে ভূত প্রেতাদি যদি আপনি বুঝাইয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে যে তাহাদের নিকট হইতে শুধু জাগতিক জিনিসই পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক কোনও সম্পদ তো তাহারা দিতে পারে না।

কমলদা। কী করিয়া বুঝিব যে যিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তিনি প্রেত না সত্যি কোনও মহাপুরুষ?

গোপীবাবু। অনেক সময় ইহা ধরা শক্ত। তবে এই বিষয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন?

এই সময় অন্যান্য লোকের উপস্থিতি হেতু মায়ের সঙ্গে অন্য কথা হইতে লাগিল। ওই সকল কথার মধ্যে মা হাসিয়া বলিলেন, 'আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে যদি কিছু আসে তবে যাহার নিকট উহা প্রকাশ হয় সে কিছু লাভ করিল বলিয়া তাহার মনে হয়, অর্থাৎ তাহাকে কিছুটা বদলাইয়া দিয়া যায়। আর তাহা যদি না হয় তবে ওইসকল দর্শন-শ্রবণের বিশেষ ফল নাই।

প্রতিকূল পরিবেশের জন্য এই সম্বন্ধে আর আলোচনা হইল না।

আজ সোমবার বলিয়া গোপীবাবু উপস্থিত ছিলেন না। মায়ের নিকট কমলদাদা, খুকুনীদিদি এবং আমি ছিলাম। আরও ২।১ জন ছিল। সূক্ষ্মে দর্শনাদির কথা উঠিলে মা বলিলেন, 'দেখ, দেখাশুনা যাহা কিছু হয় তাহা মনোরাজ্যেই হয়। এই মন অশুদ্ধ হইতে পারে আবার শুদ্ধও হইতে পারে। স্বপ্নেও তো কতকিছু দেখা যায়। আবার বসিয়া বসিয়াও লোকে স্বপ্ন দেখিতে পারে। জাগ্রত অবস্থায় দেখিলেও উহা স্বপ্নেরই মতো। এই সকল দেখাশুনা সবই মন দিয়া হয়। আবার অ-মন হইয়াও দেখাশুনা হয়। উহাই হইল যথার্থ দেখাশুনা। ইহা হইল তৎরূপে সব দেখা। এই স্থিতি হইতে যাহা লাভ করা যায় তাহা আর হারায় না। উহা লোককে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। কিন্তু মনোরাজ্য হইতে যাহা আসে তাহা স্থায়ী হয় না। উহা কতকটা পানা পুকুরের মধ্যে ঢিল দেওয়ার মতো। ঢিল ফেলিলে পানা সরিয়া গিয়া একটু জল দেখা গেল। অনেকে ওইসব অনুভূতি মনে রাখিবার জন্য লিখিয়া রাখে; কিন্তু ইহাও পুঁটুলি তৈয়ার করা। আসল কথা হইল শুধু তাঁহাকে লইয়া পড়িয়া থাকা। তাঁহাকে লইয়া থাকিতে থাকিতে সাধন রাজ্যে কত কিছু দেখা যায়। উহা শুধু দেখিয়া যাওয়া। নিরপেক্ষভাবে দেখিয়া গেলেই সাধকের স্তরের পর স্তর খুলিয়া যায়। সাধনরাজ্যের অনুভূতি লিখিতে গেলে উহার কি শেষ আছে?

আমি। অনেকে এইরূপ উপদেশও দেন যে ধ্যান জপাদি করিবার সময় যদি কোনও বাণী পাওয়া যায় বা কিছু দেখা যায়, তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়। তাহা না হইলে উহা কিছু মনে থাকে না। কিন্তু তুমি বলিলে এইরূপ করিলে শুধু পুঁটুলির (গ্রন্থির) সৃষ্টি হয়। উহা সাধনের অন্তরায় স্বরূপ।

মা। না, এ জাতীয় পুঁটুলি অনেক সময় পুঁটুলি ভাঙিবার সাহায্য করে। যে স্থিতিতে শুদ্ধ ভাবের স্ফূরণ হয় সেই স্থিতিতে সর্বদা তো থাকা যায় না, আবার জাগতিক বিষয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়। তখন পূর্ব স্মৃতি কিছু থাকে না। ওই স্মৃতি রাখিবার জন্যই লোকে অনুভূতিগুলি লিখিয়া রাখে। জাগতিক চিন্তা না করিয়া এই সকল অনুভূতির স্মরণদ্বারাও লোকের চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে এই জাতীয় পুঁটুলি পুঁটুলি ভাঙিবারও সহায়তা করে। তবে মন্ত্র যেরূপ গোপনে করিতে হয় সাধনের অনুভূতিগুলিও গোপনে রাখিতে হয়।

১৭ই ভাদ্র, রবিবার (ইং ১৩। ৯। ৫৯)

আশ্রমে শতচণ্ডী এবং ভাগবত জয়ন্তী চলিতেছে। আজ শতচণ্ডী শেষ হইল। বোম্বাইয়ের এক ভদ্রলোক এই সম্পুটিত শতচণ্ডী পাঠ করাইলেন। ভাগবত জয়ন্তী করাইতেছে শ্রীবীর সাক্সেনা তাহার স্বর্গীয় পিতার মঙ্গল কামনায়। বেশ ঘটা করিয়া ভাগবত জয়ন্তী চলিতেছে।

স্বামী ক্রিয়ানন্দ

স্বামী যোগানন্দের এক মার্কিন শিষ্য, ক্রিয়ানন্দ, গতকাল মায়ের আশ্রমে আসিয়াছেন। মাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার আসা। ভদ্রলোকের বয়স ২৫। ২৬ বৎসর হইবে। দেখিতে সুদর্শন এবং সদানন্দ। ভদ্রলোকটি মায়ের সহিত ভাঙা ভাঙা বাংলা ভাষায় কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি এক বৎসর যাবৎ বাংলা ভাষা শিখিতেছি। আমার গুরুর ভাষা আমাকে শিখিতেই হইবে।' ভদ্রলোকটি কয়েকটি বাংলা এবং হিন্দি গানও করিলেন। গানগুলি ভালই গাহিলেন। উচ্চারণগুলি স্পষ্ট এবং গাম্ভীর্য পূর্ণ। ইঁহার গুরুভক্তি এবং বিশ্বাস দেখিবার জিনিস।

হৃষীকেশ রামনগরে সংযম সপ্তাহের সময়ের অলৌকিক ঘটনা

৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (ইং ২৪। ৯। ৫৯)

গত ৩১শে ভাদ্র মা এলাহাবাদে চলিয়া যান। গত কয়েক বৎসর যাবৎ মা পূজার পূর্বে গোপালদাদার আশ্রমে তিনদিন কাটাইয়া আসেন। ওই সময় ওইখানে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পূজা হয়। এলাহাবাদে তিনদিন থাকিয়া মা

একদিনের জন্য বিন্ধ্যাচলে যান এবং ৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার বিকালে কাশী আসেন। আজ অখণ্ডানন্দজীর তিরোধান উৎসবের ভাণ্ডারা। আজই বিকালে মা পুনরায় বিন্ধ্যাচলে গেলেন। যেই দুইদিন মা এইখানে ছিলেন প্রত্যহই সন্ধ্যার পর মায়ের কাছে গিয়া বসিতাম। এইবার হৃষীকেশের নিকট রামনগরে সংযম ব্রতের সময় যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল সেই সম্বন্ধে মা একদিন বলিলেন, ঘটনাটি হইয়াছিল শ্রীযুক্ত অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লইয়া। অরুণবাবু এই সংযম সপ্তাহে উপস্থিত ছিলেন। একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার ঘরের চাবিটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কেমন করিয়া এখন নিজের ঘরে ঢুকিবেন এবং কেমন করিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া সৎসঙ্গে যাইবেন—এই চিন্তায় তিনি হতাশ হইয়া গঙ্গার ধারে একটি পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে একটি মহিলা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তিনি এমনভাবে বসিয়া আছেন কেন। মহিলাটির পোশাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত বংশের বলিয়া মনে হইল। অরুণবাবু অতি দুঃখের সহিত তাঁহার বিপদের কথা জানাইলে মহিলাটি বলিলেন যে বোধহয় গঙ্গায় আসিবার পথেই চাবিটি ফেলিয়া দিয়াছেন। কাজেই সমস্ত পথটা খুঁজিয়া দেখিলেই চাবিটি পাওয়া যাইবে। অরুণবাবু তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি সমস্ত পথটাই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন কিন্তু চাবি পান নাই। মহিলাটি তখন বলিলেন, তাহা হইলে চাবিটি বোধহয় গঙ্গায়ই পড়িয়া গিয়াছে।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার সিল্কের জামা কাপড় সহ গঙ্গায় নামিলেন এবং একটু খুঁজিয়াই একটা পাথরের নীচ হইতে চাবিটি বাহির করিয়া অরুণবাবুকে বলিলেন, 'দেখ দেখি এইটি তোমার চাবি কিনা।' অরুণবাবু দেখিলেন যে চাবিটি তাঁহারই। তিনি হাত পাতিয়া চাবিটি লইলেন। ওই সময় তিনি মহিলাটির আঙুলের স্পর্শও হাতের উপর অনুভব করিলেন। চাবিটিতে বালু লাগিয়াছিল। মহিলাটি বলিলেন, 'চাবিটি জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লও।' অরুণবাবু চাবিটি ধুইবার জন্য গঙ্গায় নামিলেন এবং চাবি ধোওয়া হইলে তিনি ফিরিয়া দেখেন যে মহিলাটি আর তথায় নাই। যেখানে এই ঘটনা হইয়াছিল, উহার চারিদিকেই খোলা জায়গা—বাড়িঘর, গাছপালা কিছুই নাই।

এই অল্প সময়ের মধ্যে মহিলাটি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া অরুণবাবু এই ঘটনার কথা বলিলে মা বলিলেন, 'তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়া হয়তো মা গঙ্গাই তোমাকে চাবি দিয়া গেলেন।'

এই অরুণবাবু সম্বন্ধে মা আরও একদিনের ঘটনা বলিলেন। মা বলিলেন, 'একবার আমরা ডুঙ্গা গিয়াছি; অরুণবাবাও সঙ্গে আছে। ডুঙ্গায় আমরা যেখানে ছিলাম সে স্থানটি খুব নির্জন; বাঘেরও ভয় আছে। তাহা ছাড়া থাকিবার ঘরটিও ছোট। বাবা ওইখানে গিয়াই চলিয়া আসার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এই শরীর তাহাকে থাকিয়া যাইতে বলিল। রাত্রিতে আমরা বারান্দায় শুইলাম। একদিকে আমি অন্য দিকে পরমানন্দ, অরুণবাবুকে মাঝখানে শুইতে দেওয়া হইল। বাবার কিন্তু খুব ভয় করিতে লাগিল। বাবা ভাবিল মা যেখানে শুইয়াছেন বাঘ আসিলে তো ওইখান দিয়াই আসিবে—এইসব চিন্তা করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রায় দেড় ঘন্টা ঘুমাইয়া বাবা যখন জাগিল তখন দেখিতে পাইল যে সে এ শরীরের চৌকি স্পর্শ করিয়াই আছে। ঘুমের মধ্যে ভয়ে যে সে কখন ওইখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সে নিজেও জানে না। যাহা হউক সে তখন উঠিয়া বসিল, দেখিতে পাইল যে চারিদিকে চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ওই স্থানের দৃশ্যটি তাহার বড়ই ভাল লাগিল। তখন আর তাহার কোনও ভয় নাই। এমন সময় দেখিতে পাইল যে দূরে যেন দুইটি মনুষ্য মূর্তি দেখা যাইতেছে। ভাল করিয়া মূর্তি দুইটি দেখিয়া তাহার মনে হইল শিব-পার্বতীই বুঝি ওইখানে বসিয়া আছেন। উহা দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল। পরদিন সকলকে বলিতে লাগিল, 'ভাগ্যে কাল চলিয়া যাই নাই, তাহা হইলে শিব-পার্বতী দর্শন হইত না।

ইতিমধ্যে নারায়ণ স্বামী দেরাদুন হইতে কাশীতে আসিয়াছেন। বিকালবেলা মা নারায়ণ স্বামীজীর নিকট একটি ঘটনা শুনিতে পান। স্বামীজীকে উহা আমাদের নিকট বলিতে বলেন। মা-র আদেশে স্বামীজী আমাদিগকে বলিলেন, 'এইবার কিষণপুর আশ্রমে যে নূতন রান্নাঘর তৈয়ার হইয়াছে উহার নীচের কতকটা জায়গা বাঁধাইয়া দিবার কথা হয় এবং ওই উদ্দেশ্যে দুইটি লোক ওইখানে কাজ

করিতেছিল। ওইখানে একটি লিচু গাছ ছিল। গাছটি বড় নয়। উহার একটা ডাল, বোধহয় আড়াই হাত কী ৩ হাত হইবে, লম্বমান হইয়া জলের কলের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল যাহার জন্য মিস্ত্রীদের কাজের অসুবিধা হইতেছিল। উহাদের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া আমি তাহাদের একজনকে বলিলাম, 'ডালটি টানিয়া আনিয়া গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেও।' আমি ভাবিয়াছিলাম যে ডালটি ওইভাবে কিছুদিন বাঁধিয়া রাখিলে হয়তো উহার গতি বদলাইয়া যাইবে এবং উহা সোজাভাবে উপর দিকে উঠিয়া যাইবে। আমার কথা শুনিয়া লোকটি একটি নারিকেল দড়ি আনিয়া গাছের ডালটি বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শক্ত হইতেছে না দেখিয়া আমি উহাকে আরও জোরে বাঁধিতে বলিলাম এবং ওই কাজে আমি নিজেও সাহায্য করিলাম। ওইদিন সন্ধ্যাবেলা হইতে আমার দক্ষিণ বাহুমূলে বেদনা আরম্ভ হইল। রাত দুপুরে ওই বেদনা এত তীব্র হইল যে আমি আর সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলাম না। পরদিন আমি আশ্রমের মধ্যে বেড়াইতেছি তখন হঠাৎ আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে আমার বাহুর এই ব্যথাটা ওই লিচু গাছের ডাল বাঁধিবার জন্য নয় তো? আমি তখন লিচু গাছের নিকট গিয়া বাঁধনটি খুলিতে আরম্ভ করিলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেইমাত্র বাঁধনটি একটু ঢিল হইল তখন দেখিতে পাইলাম আমার হাতের ব্যথাটা যেন কিছুটা কমিয়া গেল। যখন সমস্ত বাঁধন খোলা হইলে ডালটি পূর্বের অবস্থায় আসিল উহার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাতের ব্যথা একেবারে চলিয়া গেল। এই সময় আমি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিলাম যে গাছ এবং আমার মধ্যে এক আত্মাই বিরাজ করিতেছেন।

'পরদিন মিস্ত্রীরা কাজ করিতে আসিয়া দেখে যে তাহারা যে ডালটি বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা কে যেন খুলিয়া দিয়াছে। তখন তাহারা উহা আবার বাঁধিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে আমি ওইখানে গিয়া যখন গাছটির ডাল বাঁধা দেখিলাম তখন আমি তাহাদিগকে আমার হাতের ব্যথার কথা এবং কীভাবে উহার উপশম হয় তাহা বলিলাম। ওই কথা শুনিয়া তাহারা ভয়ে ভয়ে তৎক্ষণাৎ ডালের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল।

'কিছুক্ষণ পরে সদানন্দ ব্রহ্মচারী যখন ওইখানে আসিল তখন মিস্ত্রীরা আমার

অভিজ্ঞতার কথা তাহাকে বলিলে সে তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'ও সব আমি কিছুই মানি না। আজই দা দিয়া আমি ওই ডাল কাটিয়া ফেলিব, দেখি আমার কী হয়।' কিন্তু তাহাকে আর ডাল কাটিতে হইল না। সেইদিন গরুর জন্য দা দিয়া বিচালি কাটিবার সময় হাতের আঙুলে এমন আঘাত করিল যাহার ফলে ওই আঙুলের মাংস কাটিয়া হাড় দেখা দিল।' এই কথা শুনিয়া মা আমাদিগকে বলিলেন, 'এবার যখন নারায়ণকে কিষণপুরে রাখিয়া চলিয়া যাওয়া হয় তখন এই শরীরের খেয়াল হইয়াছিল যে নারায়ণের যেন একটা কিছু অনুভূতি হয়।' পরে মা নারায়ণ স্বামীকে বলিলেন, 'নারায়ণ এখন তুমি আর বলিতে পারিবে না যে এতদিন জপতপ করিয়া তোমার কিছুই হইল না।'

১৫ই পৌষ, ১৩৬৬ সন (১। ১। ৬০)

সংযম সপ্তাহের পর মা আমেদাবাদ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া গত পরশু রাত্রি ৩।। টার সময় কাশী আসিয়াছেন। মায়ের খুব সর্দি হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মা আজ বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে এলাহাবাদে যান এবং সেইখানে কিছুদিন থাকিয়া ২০শে মাঘ কাশী ফিরিয়া আসেন।

আশ্রমের অন্নপূর্ণা মূর্তি এবং শালগ্রামের বিবরণ

২২শে মাঘ, শুক্রবার (ইং ৫। ২। ৬০)

বেলা প্রায় ১১ টার সময় মা ঁঅন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। দেরাদুন হইতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গতকল্য সন্ধ্যায় মায়ের নিকটে আসিয়াছেন। তিনি মায়ের পূর্ব পরিচিত। তিনি আজও সকালে আসিলেন। গতকল্য তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ঁঅন্নপূর্ণা বিগ্রহের সঙ্গে ঁকালী মূর্তি কেন? উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, 'ঢাকায় শা' বাগে থাকার সময় মাটি হইতে প্রায় ১৮ হাত উপরে এক ঁকালীমূর্তি এই শরীর দেখিয়াছিল। সেই ঁকালীর মহাদেব ছিলেন না। ঢাকাতে ঁঅন্নপূর্ণা বিগ্রহ স্থাপিত করিবার সময় ওই বিগ্রহের পার্শ্বে পূর্বদৃষ্ট ঁকালী মূর্তিকেও রাখা হয়। সেইজন্য ঁকালী মূর্তিটি শূন্যে আছেন।'

ইহার পর মা ভদ্রলোককে আশ্রমে স্থাপিত 'স্বয়ম্ভূ বিশ্বনাথ' নামক দুইটি শিবলিঙ্গ স্থাপনের ইতিহাসও বলিলেন। পরে মন্দিরে যে সকল শালগ্রাম শিলা

আছে, তাহাদের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন, 'এই সকল শালগ্রামের মধ্যে একটি এই শরীরের পিতার ছিল। ইহাকে দেশের বাড়িতে পূজা করা হইত। কখনও কখনও সকালে অনুমান প্রায় ৮ টার সময় এ শরীর ওই পূজার ঘরে গিয়া বসিত। এমন জায়গায় গিয়া বসা হইত যে দরজা খোলা থাকিলেও যেন এই শরীরকে কেহ দেখিতে না পায়। সেই সময় দেখিয়াছি যে ঠাকুরের শয়ন দেওয়া থাকিলেও তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া এই শরীরের সম্মুখে আসিয়া বসিতেন। তখন তাহার শরীর হইতে নীল জ্যোতিঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। উহা দেখিয়া এই শরীরও যেন কেমন হইয়া যাইত। দেশের বাড়িতে যতদিন এই শালগ্রাম ছিলেন ততদিন শরিকেরা পালা করিয়া ইঁহার পূজা করিত। পরে অবস্থার পরিবর্তন হইলে ইঁহাকে আগরতলা রাজবাড়ির মন্দিরে রাখিয়া দেওয়া হয়। সেখানে প্রায় এক হাজার শালগ্রাম শিলা ছিল। সেই সকল শালগ্রামের সহিত ইঁহারও পূজা হইত। পরে যখন ঢাকা আসা হয় তখন ওই শালগ্রাম ঢাকাতে আনিবার কথা হইলে তোমাদের দাদামহাশয় ওই এক হাজার শালগ্রাম হইতে তাঁহাদের এই শালগ্রাম চিনিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন। পরে পাকিস্তান হইলে ইঁহাকে ঢাকা হইতে কাশীতে আনা হয়।

কুম্ভস্নানে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত গঙ্গা, যমুনা সরস্বতীর সাক্ষাৎলাভ

আজ সকালবেলায়ও মা ওই ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতে বলিতে বলিলেন, 'বার বৎসর পূর্বে এলাহাবাদে যখন অর্ধকুম্ভ হয় তখন এই শরীরও ওইখানে উপস্থিত ছিল। পান্নালাল প্রভৃতি একটা বড় নৌকা করিয়া এই শরীরকে সঙ্গম স্থানে লইয়া যায়। স্নান শেষ হইলে সকলের আবার তাঁবুতে ফিরিয়া আসা হয়। এমন সময় দেখিতে পাইলাম একজন একটি ছোট নৌকা করিয়া স্নান করিবার জন্য সঙ্গমের দিকে যাইতেছে। এই শরীরও ওই লোকটিকে বলিয়া তাহার নৌকায় গিয়া উঠিয়া বসিল। তখন সকলের স্নান প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লোকের ভিড় মোটেই নাই। সঙ্গমের একটি স্থানে দেখা গেল যে ওইখানে কতকটা জায়গা যেন ঝকঝক করিতেছে এবং সেখানে তিনটি ফুটফুটে মেয়ে জলের মধ্যে খেলা করিতেছে। আমাদের নৌকাটি ওইখানে উপস্থিত হইলে এই শরীরও জলের মধ্যে নামিয়া গেল। উহারা যেন এই

শরীরকে উহাদের সঙ্গে স্নান করিবার জন্যই ওইখানে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিল। একটু পরেই ওই তিনটি মেয়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই শরীরও আবার তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল। পান্নালাল বাবা যখন এই কথা শুনিতে পাইল তখন তাহার কী আপসোস্!'

কাশীর আশ্রমের গোপালের নানা কথাও ওই ভদ্রলোককে মা বলিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

২৭শে মাঘ, বুধবার (ইং ১০। ২। ৬০)

মা মোটরে বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলেন। সেইখানে অমৃত বাজারের মালিক তুষার কান্তি ঘোষ মহাশয়রা তাঁহাদের নূতন বাড়িতে বিষ্ণুযজ্ঞ করিতেছিলেন। ওই উপলক্ষেই তাঁহারা মাকে ওইখানে নিয়া গিয়াছিলেন। শিবরাত্রির পূর্বে মা কাশীতে ফিরিয়া আসেন। শিবরাত্রির উৎসব এইখানে শেষ হইলে মা ১৪ই ফাল্গুন এটোয়া রওনা হইয়া গেলেন। এটোয়া হইতে হরিবাবার নিকট বাঁধে মা-র যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এটোয়াতে মায়ের শরীর খারাপ হওয়ার দরুন মা দিল্লি চলিয়া যান। দিল্লি হইতে পরে আনন্দকাশী যান। সেইখানেই চৈত্র সংক্রান্তির দিন দ্বিদিমার সন্ন্যাস উৎসব সম্পন্ন হয়। ইহার পর মা বোম্বাই চলিয়া যান। সেইখানে মায়ের জন্মোৎসব হয়। উৎসবান্তে মা একমাস কাল পুণাতে থাকেন। পরে দেরাদুনে চলিয়া আসেন। ঝুলনের সময় মা হরিবাবার আহ্বানে বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

২৬শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার (ইং ১১। ৮। ৬০)

গতকল্য প্রায় ছয় মাস পরে রাত্রি ১১।।টার সময় মা বৃন্দাবন হইতে কাশী আসিয়াছেন।

ডা. গোপাল দাশগুপ্তের মৃত্যুর বিবরণ

৩০শে শ্রাবণ, সকালে ১০।। টার সময় কলিকাতা হইতে ফোনে জানা গেল ডা. গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় ওইখানে ওই সময় দেহত্যাগ করিলেন। তিনচার দিন পর তাঁহার অস্থি কাশীর গঙ্গায় দিবার জন্য তাঁহার দুই ছেলে কলিকাতা হইতে আসেন। যখন তাঁহারা আসিয়া আশ্রমে পৌঁছান তখন

আমি উপস্থিত ছিলাম না। শুনিতে পাইলাম যে যখন ওই অস্থি গঙ্গার ধারে রাখিয়া সকলে কীর্তন করিতেছিলেন তখন মা এবং আশ্রমের অনেক লোক ওইখানে ছিলেন। এই সময় কোথা হইতে একটি ছাগী আসিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া যেইখানে ওই অস্থিরাখা হইয়াছিল সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ ওইখানে থাকিয়া সে আবার ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন তাঁহারা সকলেই আশ্চর্যবোধ করিলেন। ডাক্তারবাবু মায়ের আশ্রমে ছাগশালা স্থাপন করিয়া গরিব শিশুদের দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুর শেষ কৃত্যের সময় ওই ছাগীটির কেন আবির্ভাব হইল তাহা কে বলিতে পারে?

গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের বড় ছেলের মুখে শুনিতে পাইলাম যে গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় যেইদিন দেহত্যাগ করেন, সেইদিন সকাল ৪।। টার সময় উঠিয়া জানলার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ছোট ছেলেও ওই সময় তাঁহার কাছে ছিল। প্রত্যহই ওই সময় দাশগুপ্ত মহাশয় ছেলের সহিত লেকের (রবীন্দ্র সরোবর) ধারে বেড়াইতেন। ওই দিন ভোর বেলা বৃষ্টি পড়িতেছিল বলিয়া ছেলে বাবাকে বাহির হইতে নিষেধ করিলে তিনি সম্মত হইয়া ছেলেকে আবার বিছানায় গিয়া শুইতে বলিলেন। ছেলে পার্শ্বের ঘরে শুইতে গেল। একটু পরেই সে একটি ভারী জিনিস পতনের শব্দ পাইয়া পিতার ঘরে ছুটিয়া গিয়া দেখে যে তিনি কীভাবে যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। মাথায় চোট লাগিয়া একটু রক্তও পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান পূর্ণভাবেই ছিল। ছেলেকে দেখিয়া তিনি পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিকটেই পায়খানায় লইয়া যাওয়া হইল। ইতিমধ্যে আত্মীয় স্বজন এবং ডাক্তারেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কী যন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন যে যন্ত্রণা যে কী তাহা তিনি বলিতে পারেন না তবে বুঝিতেছেন যে তাঁহার সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া আসিতেছে। ডাক্তারগণ oxygen দিবার ব্যবস্থা করিলে তিনি বলিলেন, 'চিকিৎসায় আমার কিছুই হইবে না, এইবার বিদায়।' এই সময় তিনি অবিরত 'মা' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন এবং মায়ের ফটোর দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহাকে এইরূপই করিতে দেখা গিয়াছিল।

ডাক্তারবাবুর মৃত্যুর এই বিবরণ শুনিয়া মা বলিলেন, 'আজ সকালে দেখিতে পাইলাম যে এই শরীর এক জায়গায় আছে। উহা কাশী নয় তবে স্থানটি আশ্রমের মতো জায়গা, এমন সময় গোপালবাবা জীবিতাবস্থায় যেমন লুঙ্গি পরিয়া এ শরীরের কাছে আসিত সেইভাবে আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই বলিল, 'মা, আমি এসে পড়েছি।' এই বলিয়া বাবা ওইখানে একটি জায়গা করিয়া নিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। তখন তাহার ভাব ও কথার মধ্যে মায়া মোহের চিহ্নও ছিল না।

'নীরজবাবার* বেলায়ও দেখিয়াছিলাম যে তাহার মৃত্যুর কয়েকমাস পর সে এ শরীরের কাছে আসিয়া বলিয়াছিল, 'মা, আমার এই কাজটি হইয়া গেলে আমি মুক্ত হইতে পারি।' কী কাজ তাহার নিকট জানিয়া নিয়া উহা পূরণ করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।'

১৪ই ভাদ্র হইতে ভাগবত জয়ন্তী আরম্ভ হয় এবং উহা ২০শে ভাদ্র শেষ হয়। বালকিষণ গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক এই ভাগবত সপ্তাহ করাইলেন। উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্বে মা তিনদিনের জন্য বিন্ধ্যাচলে গিয়াছিলেন। ২২শে ভাদ্র আবার মা বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। মা ওইখান হইতে ১লা আশ্বিন একদিনের জন্য পাটনায় শম্ভুবাবুর বাসায় উঠিয়া ২রা কলিকাতায় রওনা হইলেন। এইবার আগরপাড়া আশ্রমেই দুর্গোৎসব হইবে।

১৬ই আশ্বিন, রবিবার (ইং ২। ১০। ৬০)

সকাল ৮।। টার সময় মা কলিকাতা হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছাইলেন। দশমীর পর দিনই মা কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া আসেন। শুনিলাম ওইখানে খুব ধুমধামের সহিত দুর্গা পূজা হইয়াছে এবং প্রত্যহ প্রায় এক হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছে।

একটি মেয়েকে মুক্তার মালা প্রদান

কলিকাতার দুর্গোৎসব সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে মা বলিলেন, 'এ শরীর যখন বিদ্যাকূটে ছিল এবং হরিনাম করিতে করিতে এ শরীর যখন কেমন হইয়া যাইত তখন একটি চামারের মেয়ে এই শরীরের কাছে মাঝে মাঝে

* শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত এলাহাবাদের জজ শ্রীনীরজ নাথ মুখোপাধ্যায়।

আসিত। তাহার গায়ের রং খুব কাল ছিল, কিন্তু মুখখানা দেখিতে সুন্দর। এবার পূজার সময় একটি মেয়ে আগরপাড়া আশ্রমে আসে। সেও দেখিতে ওই চামারের মেয়ের মতো কালো। একদিন যখন সকলকে ফুল মালা ইত্যাদি দিতেছিলাম তখন ওই মেয়েটি আমার হাতে একটি মুক্তার মালা দেখিয়া বলিল, 'আমাকে ওই মালাটি দাও।' ওই মালাটি এই শরীরকে যে দিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উহা মেয়েটিকে তখনই দিতে পারিলাম না; কারণ অনেক সময় কেহ কেহ এই শরীর দ্বারা স্পর্শ করাইবার জন্যও কিছু দিয়া থাকে। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন মেয়েটির খোঁজ করিলাম তখন দেখা গেল যে সে চলিয়া গিয়াছে। তখন খেয়াল হইল যে মেয়েটি বোধহয় দশমীর দিন আসিবে। মালাটি উদাসের কাছে রাখিয়া দিলাম। দশমীর দিন দেখা গেল যে মেয়েটি আসিয়া উপস্থিত। জ্বরের জন্য সে ইহার পূর্বে আসিতে পারে নাই।

পুরাণ মন্দির স্থাপনের ইতিহাস

ওইদিনও তাহার গায়ে বেশ জ্বর ছিল। তাহাকে তখন মালাটি দিয়াদিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাহারা জাতিতে দাস। কে জানে ওই চামারের মেয়েই এবার দাস বংশে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কিনা। পূর্ব জন্মে সে অস্পৃশ্য ছিল, এবার অবশ্য আর অস্পৃশ্য নয়।'

নৈমিষারণ্যে সংযম সপ্তাহ ও ভাগবত সপ্তাহ

১৭ই আশ্বিন; সোমবার (ইং ৩। ১০। ৬০)

মা দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন। দীপান্বিতার সময় মা লক্ষ্ণৌ ছিলেন। সেইখান হইতে নৈমিষারণ্য চলিয়া যান। ৪ঠা কার্তিক (ইং ২১শে অক্টোবর) হইতে ওইখানে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হয় এবং উহার পরই এক সপ্তাহ ব্যাপী ১০৮ ভাগবত পাঠ হয়। এইবার ওইদিকে যেইরূপ জল প্লাবন হইয়াছিল তাহাতে কেহই মনে করিতে পারে নাই যে নির্দিষ্ট দিনে ওইখানে এই দুইটি উৎসব সম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু দেখা গেল যে মায়ের কৃপায় খুব ভালভাবেই ওইখানে উৎসবগুলি হইয়া গেল। নৈমিষারণ্যে মা প্রায় একমাস ছিলেন। পরে সেইখান হইতে লক্ষ্ণৌ হইয়া ১৬ই অগ্রহায়ণ মা কাশী আসেন।

২১শে অগ্রহায়ণ, বুধবার (ইং ৭। ১২। ৬০)

আজ মা রাজগীর রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে খুকুনীদিদি, দিদিমা প্রভৃতি অনেকেই গেলেন। মা যে ৪।৫ দিন এখানে ছিলেন তখন তাঁহার সহিত বিশেষ কথাবার্তা হয় নাই। দুই দিন মাত্র অল্প সময়ের জন্য মাকে নৈমিষারণ্য সম্বন্ধে কথা বলিতে শুনা যায়।

এইবার সংযম সপ্তাহের কিছু পূর্বে নৈমিষারণ্যে বিষম জল প্লাবন হয়। যাহার ফলে কেবল নৈমিষারণ্য নয় উহার পার্শ্ববর্তী স্থান, এমনকী লক্ষ্ণৌ শহরের কতকাংশও জলে ডুবিয়া যায়। গোমতী নদীতে এত বড় প্লাবন নাকি কেহ দেখে নাই। স্বামী পরমানন্দ যখন সংযম সপ্তাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য নৈমিষারণ্যে যান তখন তিনি ওইখান হইতে এক পত্রে আমাদিগকে জানান যে চারিদিকে কেবল জল আর জল, তিনি যেন একটি খুব ছোট দ্বীপের মধ্যে বাস করিতেছেন। যেই স্থানে সংযম সপ্তাহ এবং ভাগবত সপ্তাহ হইবার কথা ছিল তাহা সমস্তই জলের নীচে। এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন যে এইবার ওইখানে উৎসবাদি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু স্বামীজী ওইসব দেখিয়াও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে মা যখন ওইসব হইবে বলিয়া একবার বলিয়াছেন তখন উহা অন্যথা হইবে না। কাজেও দেখা গেল যে অচিন্তনীয় রূপে ওইখানেই উৎসব সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইল।

উৎসবের পর যে দুইটি দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহাও এইখানে উল্লেখযোগ্য। ভাগবত সপ্তাহে ভাগবত পাঠের জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কাশী হইতে নৈমিষারণ্যে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ফিরিবার পথে বালামউ স্টেশনে প্রস্রাব করিবার জন্য গাড়ি হইতে নামিয়া পড়েন। প্রস্রাব করিয়া হাত, পা ধুইয়া ফিরিবার সময় একটি চলন্ত গাড়ির ধাক্কা লাগিয়া তিনি লাইনের উপর পড়িয়া যান যাহার ফলে তাঁহার দক্ষিণ বাহু কাটা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে—এইরূপ একটি দুর্ঘটনার ফলেও তিনি সংজ্ঞা শূন্য না হইয়া তাঁহার কাটা হাতখানা বাম হাতে তুলিয়া লইয়া স্টেশন মাস্টারের কাছে উপস্থিত হন। ওই দৃশ্য দেখিয়া স্টেশনমাস্টার অবাক হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সাণ্ডিলা

রেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সেই হাসপাতাল এইরূপ রোগীর চিকিৎসার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া তাঁহাকে বারাণসী বিশ্ব বিদ্যালয়ের হাসপাতালে আনা হয়। ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটির নাম পণ্ডিত বশিষ্ঠ দত্ত মিশ্র। তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। বর্তমানে পণ্ডিতজীর অবস্থা ভালই। পরে তিনি আশ্রমের কন্যাপীঠেও শিক্ষকতা করেন।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনা ঘটে দিল্লির আশ্রমে। নৈমিষারণ্যের উৎসবের পর সাধন ব্রহ্মচারী দিল্লির আশ্রমে চলিয়া যান। ওই আশ্রমটিও খুব বড়, কিন্তু তখন আশ্রমবাসী লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন। একদিন রাত্রিতে সাধন ব্রহ্মচারী যখন প্রস্রাব করিতে ঘর হইতে বাহির হন তখন তাঁহাকে চারিজন গুণ্ডা আক্রমণ করে। লাঠির আঘাত করিয়া তাহার মাথার দুই তিন স্থান ফাটাইয়া দেয় এবং হাতের পাতাও ফাটাইয়া দেয়। তিনি আহত হইয়া পড়িয়া গেলে গুণ্ডারা ঘরে ঢুকিয়া বাসনের বাক্স এবং কম্বল ইত্যাদি বাহির করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু বাসনপত্র না লইয়া তাহারা মাত্র দুইটি কম্বল এবং একটি লেপ লইয়া চলিয়া যায়। পরদিন সাধন ব্রহ্মচারীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালে ৫।৭ দিন থাকিয়া আজ দুইদিন হয় তিনি কাশীতে আসিয়াছেন। হাত এখনও ব্যাণ্ডেজ করা আছে। মাথার ঘা শুকাইয়াছে।

গতকাল পূর্বাহ্নে নৈমিষারণ্যের কথা উঠিলে নারায়ণ স্বামীজী মাকে বলিলেন, 'কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে যে ভাগবত সপ্তাহের ফলে একজনের একখানা হাত গিয়াছে এবং আর একজনের মাথা ফাটিয়াছে। কিন্তু যাহাদের ওইরূপ হইয়াছে তাহারা কিন্তু এই দুই ঘটনাকে ভগবানের কৃপা বলিয়াই মনে করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণটির হাত কাটা গিয়াছে তিনি নাকি বলিয়াছেন যে তাঁহার বোধহয় প্রাণ যাইবারই কথা ছিল, ভগবান তাঁহার একখানা হাত লইয়া তাঁহাকে জীবন দান করিয়াছেন। আমাদের সাধন ব্রহ্মচারীও ওইরূপ বলিতেছেন। যে গুণ্ডারা তাঁহার ওইরূপ অবস্থা করিয়াছে তাহাদের উপর সাধনদাদার কোনও বিদ্বেষ ভাব নাই। ইহাতে মনে হয় যে এতকাল তিনি যে সাধুজীবন যাপন করিতেছেন তাহার ফলেই তাঁহার ওইরূপ মনোভাব হইয়াছে। এইভাবে যে তাঁহাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে তাহা আমরা ভগবানের

কৃপা বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি। এইরূপ আরও কোনও ঘটনা কী নৈমিষারণ্যে হইয়াছে যাহা হইতে ওই স্থানের মাহাত্ম্য বা ভাগবতের মাহাত্ম্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে?'

মা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি যে দুইটি ঘটনার কথা বলিলে উহা ভগবানের কৃপা বই আর কী? কারণ যে অবস্থায় পড়িয়া জীবন রক্ষা পাইয়াছে ওই ভাবে রক্ষা পাওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আরও দেখ, যাহাদের ওইরূপ হইয়াছে, তাহারাও উহাকে ভগবানের কৃপা বলিয়াই মনে করিতেছে। তাহারা তো মনে করিতে পারিত যে তাহারা নৈমিষারণ্যে আসিয়া ভাগবত পাঠ করিল বা সাধুসেবা করিল তাহার ফলে তাহাদের এই অবস্থা হইল। কিন্তু তাহাদের মতি যে অবিশ্বাসের দিকে না গিয়া ভগবানের কৃপার দিকে গিয়াছে এবং তাহাদের ভোগ যে তাহারা বড় করিয়া দেখিতেছে না ইহা ভগবানের কৃপা বই আর কী?

তাহা ছাড়া, যে অবস্থায় এবং যে ভাবে এবার সংযম সপ্তাহ ও ভাগবত সপ্তাহ হইল উহাতেও তোমরা ভগবানের কৃপা দেখিতে পার। পরমানন্দ যখন নৈমিষারণ্যে গেল তখন এই শরীর দেরাদুনে। তখন কেবল নৈমিষারণ্যে নয়, দেরাদুনেও কী বিষম বৃষ্টি! সকলেই বলিতে লাগিল যে সংযম সপ্তাহের দিন পিছাইয়া না দিলে কিছুতেই ওইখানে ওই উৎসব হইতে পারে না। নৈমিষারণ্যের নিকটে যে সকল সরকারি কর্মচারী ছিল, তাহারাও পরমানন্দকে বলিল যে এখানে এখন কোনও উৎসবই হইতে পারে না। বাস্তবিক অবস্থাও সেইরূপ ছিল। যেখানে উৎসব করা হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেখানে কোথাও হাঁটু জল, কোথাও বুক জল এবং কোথাও ডুব জল। কিন্তু ইহাতেও পরমানন্দ নিরাশ হইল না। উৎসবের আয়োজন করিতে হইবে বলিয়া সে ওইখানে বসিয়া রহিল। সরকারি কর্মচারীরা হয়তো মনে করিল যে লোকটির মাথা খারাপ। দেরাদুনে যখন এই শরীরকে জলের কথা বলা হইল তখন এই শরীর বলিয়াছিল, 'দেখ, তোমরা তো অনেক সময় এক মিনিটে এক গ্লাস জল চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেল, ভগবানের ইচ্ছা হইলে তিনি কি দুই এক দিনের মধ্যে ওই জল শেষ করিয়া দিতে পারেন না?' আর তখন ওইভাবে বৃষ্টি হইতে দেখিয়া এই

শরীর উহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা ভগবানের কাছে বৃষ্টি থামাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা কর।' উহারাও তাহাই করিয়াছিল। মনে হয় ভগবান উহাদের প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন, কারণ প্রার্থনা আরম্ভ করিবার পরদিনই বৃষ্টি থামিয়া যায়। আজ পর্যন্ত কিন্তু আর কোনও বৃষ্টি হয় নাই। নৈমিষারণ্যের বণ্যার জল ২।১ দিনের মধ্যেই নামিয়া গেল। এত শীঘ্র যে নামিয়া যাইবে তাহা কেহ আশা করে নাই।

'জল তো নামিয়া গেল, এখন তাঁবু ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এক বিরাট ব্যাপার। নৈমিষারণ্য তো একটি ছোট্ট গ্রাম, এখানে লোকের বসতি খুব কম। অধিকাংশ জায়গাই গাছ এবং জঙ্গলে ঢাকা। বলিতে গেলে এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। খাবার জলের পুরুয়া (মাটির ভাড়), পাতা ইত্যাদিও লক্ষ্ণৌ হইতে জোগাড় করিতে হইয়াছিল। হাজার হাজার পুরুয়া এবং পাতা দিনের পর দিন ওইখান হইতে আসিয়াছে। তাঁবু ইত্যাদির জোগাড়ও নানা স্থান হইতে করা হইয়াছে। ওই সব জিনিস নানা স্থানে পাওয়া গেলেও সেখান হইতে ওইগুলিকে নৈমিষারণ্যে আনা এক বিষম ব্যাপার; কারণ চারিদিকেই জল, রাস্তা ঘাটও নাই যে ট্রাকে করিয়া ওইগুলি আনা যাইতে পারে। তাই পরমানন্দ প্রথমেই রাস্তা তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেল। শত শত কুলি ওইখানে পাওয়া গিয়াছিল। তাহাদের সাহায্যেই পরমানন্দ রাস্তা তৈয়ার আরম্ভ করিল। এই ব্যাপারে পরমানন্দ যাহার কাছে যাহা চাহিয়াছে সে তাহাই দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। রেল কর্মচারীরা, সরকারি কর্মচারীরা সকলেই আনন্দের সহিত পরমানন্দকে সাহায্য করিয়াছে। যেখানে উৎসব হইয়াছে সেখান হইতে গোমতী নদী একটু দূরে, কাজেই ওইখানে খাবার জলের বন্দোবস্ত করা, রাত্রিতে আলোর বন্দোবস্ত করা—কিছুই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পরমানন্দ সরকারি সহায়তায় লাইন বসাইয়া বহু দূর হইতে ইলেকট্রিক লাইট আনয়ন করে। কয়েকটি tube well বসাইয়া রান্না এবং খাবার জলের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই সমস্ত কাজ যে করিতে পারা গিয়াছিল ইহাও তোমরা ভগবানের কৃপা বলিয়া ধরিয়া লইতে পার। চারিদিকে এই নিরাশার মধ্যে পরমানন্দের এত সাহস এবং অধ্যবসায় আসিল কোথা হইতে? কেহ কেহ পরমানন্দকে

মহাবীরের সহিত তুলনা করিয়াছে; কারণ দিবারাত্র সে বীরের মতো অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছে।

'তাহার পর জল প্লাবন, উহাকে তোমরা এই ভাবেও দেখিতে পার'— নৈমিষারণ্যে যে শত সহস্র বৎসরের আবর্জনা জমিয়াছিল উহা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্যই যেন গোমতী মা ওই প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাই তোমরা শুদ্ধ এবং পবিত্র স্থানে বসিয়া সংযম ব্রত এবং ভাগবত পারায়ণ করিতে পারিলে।

'আরও একটা ব্যাপার—নৈমিষারণ্যে যাইবার পূর্বে এ শরীর বাটুকে (শ্রী অগ্নিষাত্ত্ব শাস্ত্রী) বলিয়াছিল যে এবার সংযম সপ্তাহের সময় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠের কথা হইয়াছে। সে কাশী হইতে নৈমিষারণ্য যাইবার সময় যেন ওই পুস্তক সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু বাটু ওই কথা ভুলিয়া যায়। অবশ্য ইহাও আমার খেয়াল হইয়াছিল যে নৈমিষারণ্য পুরাণের স্থান, নিশ্চয়ই ওই পুরাণ ওইখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ওইখানে গিয়া দেখা গেল যে পুরাণের সংগ্রহ ওইখানে কিছুই নাই। গত বৎসর দেরাদুনে বেদ, পুরাণ ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক কেনা হয়। ব্রহ্মচারী যোগেশকে টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইল যে, সে যদি ওইখানে পুস্তকগুলির মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পায় তবে যেন সে উহা সঙ্গে করিয়া নৈমিষারণ্যে আসে। যোগেশ পুরাণগুলি খুঁজিতে গিয়া ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মনে করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিল। এই অবস্থায় সকলেই মনে করিল যে সংযম সপ্তাহের সময় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ আর পাঠ হইবে না। কিন্তু দেখা গেল যে নৈমিষারণ্যেই একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ছিল। উহা সংগ্রহ করিয়া পাঠ আরম্ভ হইল।

'যখন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের খোঁজাখুজি হইতেছিল তখন এই শরীর অবধূতকে বলিয়াছিল, 'দেখ, কী আশ্চর্য, নৈমিষারণ্য পুরাণের জায়গা, অথচ এখানে একখানা পুরাণও পাওয়া যাইতেছে না। এখানে কিছু পুরাণ সুরক্ষিত রাখিলে হয় না?' ইহা শুনিয়া অবধূত বলিয়াছিল, 'মা, যদি বল তবে আমি এখনই মোটর লইয়া যতগুলি পুরাণ পাই তাহা সংগ্রহ করিয়া আনি।' এই শরীর

তাহাকে বলিল, 'আগে পুরাণগুলি কোথায় রাখা হইবে তাহা ঠিক হউক, তাহা না হইলে ওইগুলি এখানে আনিলে নষ্ট হইয়া যাইবে।'

'ভাগবত সপ্তাহের পর যোগেশ যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আনিয়াছিল উহা দীণবন্ধুকে দিয়া পাঠ আরম্ভ হইল। যাহাতে স্থায়ীভাবে পুরাণ পাঠ নৈমিষারণ্যে চলিতে পারে সেজন্য প্রয়াগ নারায়ণ একজন পণ্ডিত ঠিক করিয়াছে। সে মাসিক ১০্ মাহিনা লইয়া প্রত্যহই কিছু কিছু পুরাণ পাঠ করিবে বলিয়া সম্মত হইয়াছে। পরে শোনা গেল যে পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই নাকি সর্ব প্রথম। কাজেই যোগেশ যে ভুলক্রমে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের পরিবর্তে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ লইয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়াছিল উহাও অর্থ শূন্য বলিয়া মনে হয় না।

'এদিকে পুরাণের সংরক্ষণের জন্য একটি মন্দির করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সেজন্য জায়গাও দেখা হইয়াছে। এই শরীর উহাদিগকে বলিয়াছে যে কোথায় ওই মন্দির হইতে পারে। তাহা গোমতীই তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। যে সকল স্থান প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছিল উহা বাদ দিয়া যদি কোনও উঁচু জায়গা পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ওই মন্দির করা যাইতে পারে। ওইরূপ একটি স্থানও পাওয়া গিয়াছে যেখানে প্লাবনের জল পৌঁছে নাই। ওইখানে মহাবীরের এক প্রকান্ড মূর্তি আছে যাঁহার কাঁধের উপর রাম লক্ষ্মণ। প্রবাদ এই যে ওইখানে মহাবীর নাকি পাতালে প্রবেশ করিয়া মহীরাবণকে বধ করিয়া রামলক্ষণকে উদ্ধার করিয়া আনেন।'

'তাই দেখিলে নৈমিষারণ্যে সংযম সপ্তাহ এবং ভাগবত সপ্তাহ করিতে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে উহার সবগুলিই যেন সাধারণ হইতে আলাদা। তাহা ছাড়া ওই স্থানের প্রভাব সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করিয়াছে। ওইখানে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই তো বালুর চড়ায় তাঁবুতে থাকিবার অভ্যাস নাই। পায়খানা বলিয়া ওইখানে কিছুই করা হইয়াছিল না, কারণ দুই হাত গর্ত করিলেই জল বাহির হইয়া পড়িত। এই জন্য সকলকেই কাশবনের মধ্যে গিয়া পায়খানা করিতে হইত। তবুও টিহরির রাজমাতা প্রভৃতি বলিয়াছে, 'মা, এই স্থান ছাড়িয়া আমাদের যাইতে ইচ্ছা
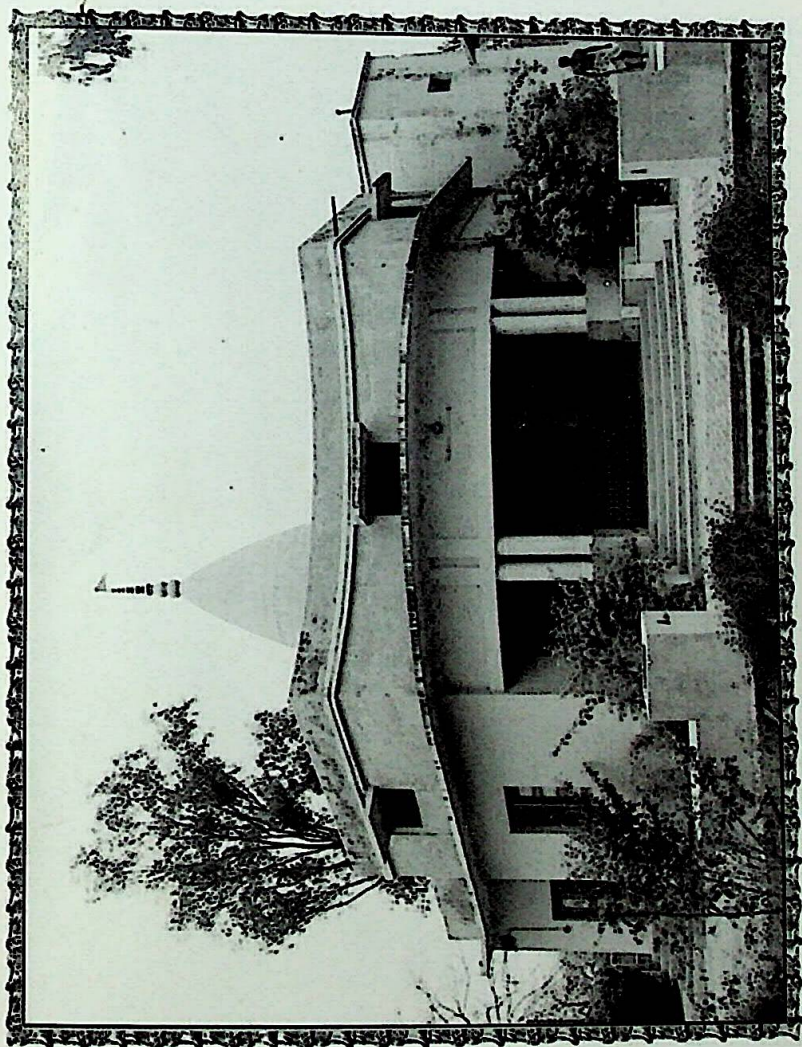
নৈমিষারণ্য স্থিত পুরাণ মন্দিরের দৃশ্য

নৈমিষারণ্য আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী পুরাণ পুরুষের দিব্য বিগ্রহ

করে না। এই জায়গাটা আমাদের বড়ই ভাল লাগিতেছে।' প্লাবনের জন্য জমিটা ভিজা থাকিলেও কাহারও ঠাণ্ডা লাগিয়া তেমন অসুখ হয় নাই। আর রাত বিরাতে জঙ্গলে পায়খানা করিতে গিয়াও কেহ কোনও বিপদে পড়ে নাই। ইহাকে স্থান মাহাত্ম্য বলিতেই হইবে, কারণ ওইখানে যেরূপ জঙ্গল ছিল তাহাতে যাহা কিছু হইতে পারিত।'

এই নৈমিষারণ্য সম্বন্ধে মা আর একদিন বলিয়াছিলেন, 'অনেকদিন আগে বিরাজমোহিনীকে সঙ্গে করিয়া একবার এই শরীর নৈমিষারণ্যে গিয়াছিল। ওই সময় চক্রতীর্থেও যাওয়া হইয়াছিল। এখন চক্রতীর্থের যে চেহারা তখন তাহার কিছুই ছিল না। চক্রতীর্থ বলিতে তখন একটা ডোবা বুঝাইত, যাহার চারিদিক নোংরা ছিল। ওই ডোবার মধ্যে এই শরীর নামিয়াছিল। তখন এই শরীরের খেয়াল হইয়াছিল, 'আহা! এইভাবে তুমি এখানে আছ।' এবার গিয়া দেখি চক্রতীর্থের আর পূর্বের অবস্থা নাই। এখন ওইখানে পুকুর হইয়াছে। উহার চারিদিক সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট করা হইয়াছে।'

২৮শে পৌষ, বৃহস্পতিবার (ইং ১২।১।৬১)

গতকল্য রাত্রি ১।।টার সময় মা কলিকাতা হইতে কাশী আসিয়াছেন। রাজগীরে মা প্রায় ১৬।১৭ দিন ছিলেন। সেইখান হইতে ৯ই পৌষ কলিকাতা রওনা হইয়া যান। কলিকাতায়ও ১৭।১৮ দিন থাকিয়া গতকাল এইখানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। মা রাজগীর হইতে চলিয়া গেলে ওই আশ্রমের উপেন মহারাজের দেহত্যাগ হয়। তিনি কীভাবে দেহত্যাগ করেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম মা কাশীতে আসিলে সকল সংবাদ পাইব। কিন্তু মা আজ সকালে নিজ হইতে বলিলেন যে উপেনবাবা কী রোগে এবং কীভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই।

উপেন মহারাজের দেহরক্ষা

বিকালে যখন মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন তখন রাজগীর হইতে প্রকাশানন্দ স্বামী আশ্রমে আসিয়া পৌঁছাইলেন। মা তাঁহাকে

উপেন মহারাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'বাবার মৃত্যু এক অদ্ভুত ব্যাপার! আপনি রাজগীর হইতে চলিয়া গেলে উপেনবাবা শুধু আপনার কথাই বলিতেন। তিনি বলিতেন, 'মায়ের মতো এমন সমদর্শী এবং কৃপালু আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।' আপনার নিকট হইতে তিনি যে কতভাবে কৃপা পাইয়াছেন তাহাই সর্বদা বলিতেন। যেইদিন তিনি দেহত্যাগ করেন সেইদিনও দ্বিপ্রহরে আহারের পর আশ্রমের বারান্দায় রৌদ্রের মধ্যে শুইয়া আপনার কথাই বলিতেছিলেন। তাঁহাকে সিমেন্টের উপর শুইতে দেখিয়া আমি একটা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলাম; কিন্তু তিনি উহার উপর শুইলেন না, বলিলেন গরম সিমেন্টের উপর শুইয়া থাকিতেই তাঁহার ভাল লাগিতেছে। তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া আমি আশ্রমের ছাদের উপর চলিয়া গেলাম।

'বেলা প্রায় ২ টার সময় কমল (ব্রহ্মচারী) দাদা উপেনবাবাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা, tea time হইয়াছে, এখন উঠিবেন না?' অবশ্য কমলদাদা ওই কথা ঠাট্টা করিয়াই বলিয়াছিলেন, কারণ আজকাল কমলদাদা এবং উপেনবাবা কেহই চা খান না। কিন্তু উপেনবাবাকে কোনও উত্তর দিতে না দেখিয়া তিনি ভরত ভাই* এবং আমাকে ডাকিলেন। আমি নামিয়া আসিয়া দেখি যে, আমি যে মাদুর পাতিয়া দিয়াছিলাম তাঁহার উপর উত্তর দিকে মাথা করিয়া বাবা চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার একখানা হাত বুকের উপর, মুখ গহ্বর কিছুটা খোলা, চক্ষু শিব নেত্র। তাঁহার হাতখানা লইয়া নাড়ী দেখিলাম, কিন্তু নাড়ী পাওয়া গেল না। মনে হইল বাবা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তবুও নিশ্চয় হইবার জন্য একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা তো মহাবিপদে পড়িলাম। কমলদা বলিলেন, 'এখন তো চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; উপেন বাবা আমাদের সকলকেই প্রাণ দিয়া সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সলিল সমাধি যাহাতে ভালভাবে দিতে পারি সেই চেষ্টা করা যাক।'

'বাবার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র আমাদের পাশের আশ্রমে যেইখানে

* বর্তমানে স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজ।

কীর্তন হইতেছিল সেইখান হইতে কীর্তনীয়া দল আমাদের আশ্রমে চলিয়া আসিল এবং বাবার কাছে বসিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিল। ভরত ভাই বাবার মাথার কাছে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া গীতা পাঠ করিতে লাগিল। কমলদা এবং আমি মোটর কিম্বা লরির সন্ধানে বাহির হইলাম, কারণ বক্তিয়ারপুর না গেলে গঙ্গা পাওয়া যাইবে না। যদিও দুই একটা মোটর গাড়ি পাওয়া গেল কিন্তু তাহাদের দাবি শুনিয়া আমাদের চক্ষু স্থির। এমন সময় হঠাৎ একটি লরি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চালক বলিল যে সে ৩৫্ টাকাতেই মৃতদেহ লইয়া বক্তিয়ারপুর যাইতে সম্মত আছে, তবে বক্তিয়ারপুরে মৃতদেহ জল সমাধি দেওয়া যাইবে না, কারণ ওইখানে জল খুব কম। ওইখান হইতে আরও ৫।৬ মাইল দূরে যাইতে হইবে। জল সমাধি দিতে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা আশ্রমেই পাওয়া গেল। এমনকী একখানা নূতন গেরুয়া কাপড়ও মিলিয়া গেল। কোনও কিছুরই যেন অভাব নাই। আমরা মৃতদেহ লইয়া রাত্রি ৯।১০ টার সময় রওনা হইলাম। রাস্তাঘাট একেবারে নির্জন। আমরা যখন শ্মশানে গিয়া পৌঁছাইলাম তখন দেখি যে কেহই জাগিয়া নাই। এই দারুণ শীতের রাত্রিতে কেই বা জাগিয়া বাহিরে বসিয়া থাকিবে? ওই অবস্থায় কী করা যায় সেই সম্বন্ধে আমরা যখন আলোচনা করিতেছিলাম তখন আমাদের শব্দ পাইয়া ওইখানের একটি লোক বিছানা হইতে উঠিয়া আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনারা আসিয়াছেন, আমি জল সমাধির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া সে এক নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া আনিল। মাঝি নৌকা আনিলে আমরা শব উহার উপরে রাখিলাম, আমাদিগকে কয়েকটি মাটির কলসও আনিয়া দেওয়া হইল। আমরা নৌকা লইয়া ওপারে চলিয়া গেলাম। সেইখানে শেষ কৃত্য সমাপন করিয়া মধ্য গঙ্গায় আসিয়া জল সমাধি দিলাম। লরিওয়ালা তখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে নিজ হইতেই আমাদিগকে বক্তিয়ারপুর পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। উপেনবাবার দেহত্যাগে আমরা যেমন সমস্যায় পড়িয়াছিলাম, তেমনি আবার দেখিতে পাইলাম যে সকল কাজই যেন আপনা আপনি হইয়া গেল। আমরা শুধু উপলক্ষমাত্র ছিলাম।'

উপেন মহারাজের দেহত্যাগের এই বিবরণ শুনিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'রাজগীর হইতে কলিকাতা যাওয়ার সময় এ শরীর উপেনবাবাকে একটা বড় এবং সুন্দর ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া তাহার মাথায় এবং গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে বাবার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। তাহার চোখ মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে বাবা যেন আনন্দ আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। সেই সময় খেয়াল বশেই কমল, ভরত এবং প্রকাশকে কিছুদিন রাজগীরে থাকিতে বলিয়াছিলাম। ইহাদের কাহারও ওইখানে থাকার কথা ছিল না। এই শরীরের কথায় উহারাও সম্মত হইয়া ওইখানে থাকিয়া গেল। ইহারা না থাকিলে কী কাণ্ডই যে হইত! কত দিন যে মৃতদেহ ওইখানে পড়িয়া থাকিত তাহা কে জানে।

'আর একবার কাশীর আশ্রমে আছি, একদিন রাত্রিতে হঠাৎ 'হা-রে-রে' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। দিদি উপস্থিত ছিল, সে বলিল, 'মা, কী হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'সাপ সাপ।' দিদি বলিল, 'কোথায় সাপ?' তখন তাহাকে বলিলাম, 'দেখিতেছি উপেনবাবা বিন্ধ্যাচলে যজ্ঞশালার বারান্দায় শুইয়া আছে, তাহার পায়ের কাছে বড় একটা বিষাক্ত সাপ। উপেনবাবা যদি না দেখিয়া পা লম্বা করে তবে অমনি সাপটা তাহার পায়ে কামড়াইবে।' স্বামী প্রকাশানন্দ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'উপেনবাবাও আমাদের ওই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'একদিন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে শুইয়া আছি, হঠাৎ আমার পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখি যে একটা প্রকাণ্ড সাপ আমার পায়ের কাছ দিয়া চলিয়াছে। উহা দেখিয়াই আমি পা সরাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। সাপটি ফণা ধরিয়া লেজের উপর ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যদিও কিছুক্ষণ ওইভাবে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল, কিন্তু আমার দিকে আর অগ্রসর হইল না। অন্যদিকে চলিয়া গেল। ওইদিন মা আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় আমার যে মৃত্যুযোগ ছিল এইকথা অন্য একজন আমাকে বলিয়াছিল।'

২৯শে পৌষ, শুক্রবার (ইং ১৩। ১। ৬১)

বেলা প্রায় ১।।টার সময় মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

দুইটি মেম সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের একজন ফরাসি দেশ হইতে এবং অন্যটি মার্কিন দেশ হইতে আসিয়াছেন। মার্কিন দেশ হইতে যিনি আসিয়াছেন, তিনি কিছুদিন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। ইঁহারা হোটেলে থাকিয়া দুই বেলায়ই মায়ের সঙ্গ করিতেছেন। আজ শ্রীযুক্ত উপেন দত্ত মহাশয় এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মা নানা কথার মধ্যে কলিকাতার একটি মেয়ের কথা বলিলেন—যাহার উপর বিভিন্ন শক্তির ভর হয়। মাকে তাহার বাড়িতেও নাকি লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহার বাড়িতে একটি ঘরে শ্রীশ্রীমনসা দেবীর মূর্তি ছিল এবং উহা অন্যান্য দেবদেবীর ছবির দ্বারা সাজানো ছিল। সপ্তাহে কী কী বারে সে যখন শ্রীশ্রীমনসা দেবীর সম্মুখে আসন করিয়া বসিত তখন তাহার উপর নাকি দেবদেবীর আবেশ হইত। ওই অবস্থায় সে যাহাকে যাহা বলিত তাহা নাকি সত্য হইত। এইজন্য তাহার নিকট বহু লোকের সমাগমও হইত। মেয়েটি নিজেই বলিয়াছে যে তাহার উপর যখন ওইরূপ ভর হয় তখন তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না, লোকে তাহাকে কী জিজ্ঞাসা করে এবং সে কী উত্তর দেয় তাহাও সে জানিতে পারে না। মা বলিলেন, 'উহাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, সে যেন লোকের সম্মুখে ওইরূপ আসন করিয়া না বসে। যাহা কিছু করিতে হয় তাহা যেন ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া একা বসিয়াই করে। এই কথা যে তাহার মনোমতো হয় নাই তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম। সে আমাকে বলিল, 'মা, আমি তো ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, যাহা কিছু হয় তাহা আমার অজ্ঞাতসারে হয়।' এ শরীর তখন বলিল, 'তুমি যখন আসনে বস তখন তো ইচ্ছা করিয়াই বস। তাই বলিতেছি আসনে বসিবার সময় ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বসিও যেন কেহ তোমার কাছে না আসিতে পারে। তারপর তুমিই বলিলে যে তুমি যাহা বল তাহা তুমি নিজেই জান না। তাহা হইলে বুঝিতেছ কেহ তোমাকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। সাধক জীবনে ইহা ভাল নয়। যদি কোনও খারাপ আত্মা তোমাকে পাইয়া বসে তবে তোমার খুবই ক্ষতি হইবে।' মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি তাহারা কি এক শক্তিরই বিভিন্ন রূপ নয়?' এই শরীর বলিল, 'সে তো সত্য কথাই। জগতে যত শক্তি আছে উহা

এক শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু উহা তো তোমার জানা নাই। যদি জানা থাকিত তবে তুমিই তাহা বুঝিতে পারিতে। এই যখন অবস্থা তখন ভাল মন্দ দুই-ই আছে। সেইজন্য সাবধান হওয়া দরকার।'

'আরও একটি ছেলেকে জানি সেও দুরারোগ্য রোগ স্পর্শ মাত্রই ভাল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ওই ভাবে লোকের রোগ সারাইয়া তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সেজন্য সে এই শরীরের কাছে আসিয়া জানিতে চাহিয়াছিল তাহার কী করা কর্তব্য। তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে ওইরূপে শক্তির প্রয়োগ করা তাহার সাধনের পক্ষে অনুকূল নয়।'

মায়ের এই কথা শুনিয়া মুক্তিবাবা প্রভৃতি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জনসেবা করা কি সাধনের পক্ষে অনুকূল নয়?' ইহার উত্তরে মা আজ অনেক কথা বলিলেন—যাহার সারাংশ এই—এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি, এই স্থিতি লাভ করিয়া কেহ যদি জনসেবা ইত্যাদি কাজ করে তবে উহা আলাদা কথা। কিন্তু মনোরাজ্যে থাকিয়া কেহ যদি লোকের উপকার করিতে যায় তবে প্রশংসা, প্রতিষ্ঠার ভাব আসিয়া পড়া স্বাভাবিক। উহা সাধন পথের অনুকূল নয়। শক্তি অর্জন মাত্রই যদি উহা বিলাইয়া দেওয়া হয় তবে নিজে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে কেহ যদি ওইভাবে লোকের উপকার করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে তবে তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু যদি উহাতে তৃপ্ত বোধ না করে তবে তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ওইরূপ করা ঠিক নয়। সেইজন্য ওই মেয়েটি এবং ছেলেটিকে বলিয়াছিলাম যে তাহারা যাহা করিতেছে উহা তাহাদের সাধনের অনুকূল নয়। যদি বলা যায় যে এই সকল শক্তি যখন এক শক্তিরই প্রকাশ তখন ইহা হইতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা কোথায়? কোনও কোনও লোকের মধ্যে এইরূপ শক্তির প্রকাশ দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত শক্তিই এক শক্তি বলিয়া জানা না হয় ততক্ষণ এগুলিকে ভাল, মন্দ এবং ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। লোকের বিভিন্ন সংস্কার থাকে বলিয়া এবং কোনও কোনও শক্তির সহিত তাহাদের যোগাযোগ থাকে বলিয়া কাহারও কাহারও মধ্যে এই সব শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। এই সকল শক্তি

প্রয়োগের ফলে লোকের যে সকল পরিণাম হয় তাহাও তোমাদের জানা আছে। সেইজন্য যাহারা ভগবান লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সমস্ত শক্তি গোপন করিয়া শুধু এক লক্ষ্যে পড়িয়া থাকা উচিত। তাহা হইলেই তাহারা একদিন বুঝিতে পারিবে যে একমাত্র তিনিই আছেন বা একমাত্র আমিই আছি।'

৩রা মাঘ মঙ্গলবার, (ইং ১৭। ১। ৬১)

মা আজ মোটরে এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। ওইখানে তিন দিন থাকিয়া দিল্লি চলিয়া যাইবেন।